

# আমার ফাঁসি চাই



জন্মের মূল্য বর্ণিত করে এই ছবি প্রকাশিত। এ ছবি প্রকাশের মূল্য এই প্রকারে লক্ষ্য করুন।  
এই ছবি প্রকাশের মূল্য প্রকাশের মূল্য। এই ছবি প্রকাশের মূল্য প্রকাশের মূল্য।  
এই ছবি প্রকাশের মূল্য প্রকাশের মূল্য।

মুক্তিযোদ্ধা মতিঘুর রহমান রেন্ডু

মদানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সন্মানস্বরূপে প্রদত্ত অস্বাধীনতা স্মৃতি

দেশপ্রেম বিবর্জিত নেতা-নেত্রীর ঋগ্নের পাড়ে যে সমস্ত প্রতিভাবান তরুণ  
ছাত্র-ছাত্রী তাঁদের ভবিষ্যৎ এবং জীবন বিনষ্ট করিয়াছে,  
“আমার ফাঁসি চাই” গ্রন্থটি তাঁদের জন্য—

আমার ফাঁসি চাই

মুক্তিসোচ্চা যতিয়ুর বহমান রেনু

প্রকাশক :

ইর্প নতুন ও বন নতুন

প্রকাশ কাল :

স্বাধীনতা দিবস ১৯৯৯

মূল্য : ১২৫ (একশত পঁচিশ টাকা) মাত্র ।



कृष्णजीय उद्योग (प्रा. लि.)  
कैपिटल नं. ४४२ रजिस्ट. ४३०. पृष्ठ



## নামকরণ

যদি পুনর্নির্দেশ উদ্দেশ্যে বীকারোক্তিযুক্ত জবানবন্দী দেওয়া হতো, তাহলে গ্রন্থটির নাম হতো "১৬১ দ্বারা জবানবন্দী"। যদি ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্দেশ্যে বীকারোক্তিযুক্ত জবানবন্দী দেওয়া হতো, তাহলে গ্রন্থটির নাম হতো "১৬৪ দ্বারা জবানবন্দী"। কিন্তু জনতার উদ্দেশ্যে দেওয়া বীকারোক্তিযুক্ত জবানবন্দীর কোন দ্বারা নেই। মোহেত্ব এই গ্রন্থটি জনতার উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ধরনের বীকারোক্তিযুক্ত জবানবন্দী, তাই গ্রন্থটির নাম দিয়েছি "আমার ফাঁসি চাই"। যদি বলা যায় মিষ্টান X অপরাধ করেছে। মিষ্টান X এক ফাঁসি চাই। তাহলে নিজে অপরাধ করলে কি বলা উচিত না আমার ফাঁসি চাই? তাই গ্রন্থটির নাম বেছেছি "আমার ফাঁসি চাই"।

## ভূমিকা

আমার বিশ্বাস অজ্ঞানের রাজ্য নষ্ট হা ইতিহাস জ্ঞান থাকলে অবিচারের নিক নিৰ্বেশনা হয়তো আসতে পারে।

এদু আমি জড়িত আছি বা জ্ঞানি এমন সময় ঘটনাবলীই কেবল প্রকাশে লিখিত হ'লো। তবে আমার তেমা বা জ্ঞানর বাইরে অন্য কিছু নেই, এটা একেবারেই ঠিক নয়। অবশ্যই আছে।

আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমাদের একটি বিদ্যা নিশ্চিত হতে হবে যে, যারা রাজনীতি করেন বা দেশ চালান তারা আমাদের চাইতে খুব বেশি কিছু বুঝেন তা মেসটিও নয়। আমাদের ব্যক্তিগত আশপাশ দিয়েই তাদের ব্যবস্থা। আমাদের চাইতে খুব বেশি জ্ঞান, মেধা, যোগাযোগ ক্ষমতাবিশিষ্টদের কাছে, এমন জীবদেহও কোনই কারণ নেই। বরং কোন কোন ব্যক্তির বিদ্যায় তাদের দানপ্রকাশ ও জ্ঞানের চাইতে অমেরু যারা, সাধারণ মানুষ, আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি সেই ভুলনয়া জ্ঞানের বেশি। অতীত সাংবাদিকের রাজনীতিক ও প্রশাসকদের প্রেক্ষাপট এটা মেনে আনা সত্য।

কত নীচ প্রকৃতির এবং কত গোষ্ঠী ও ক্ষত্র নগোষ্ঠির মানুষেরা কত উপায় অসীম, সাধারণ জনতার কাছে তা তুলে ধরার জন্যই এই বই লেখার প্রয়াস আমার। বাংলাদেশের নগরিকদের প্রতি বিশেষ করে আগামী প্রজন্মের মানুষদের জন্য এই বইয়ের বই বা পুস্তক লেখা ইচ্ছা কি-না এ নিয়ে বিস্তার চিন্তা-ভাবনা, আলোচনা-আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কের পথ।

অবশেষে লিখতে চাইছি—রাজনীতির অন্তরালের কোন সত্য ও তথ্যকে বাধ্যতায় না করে, হঠাৎকৈ কোনকৈ তাই-ই জনসমুখে তুলে ধরার এই ভেবে যে, তা যদি বর্তমান এবং আগামী দিনের মানুষের কোন কাজে লাগে।

এই গ্রন্থ বা পুস্তক পড়ে কোন কোন পাঠক আমাদের কতটা ভাষায় গাণি-গাণিধা করবেন, শাকুন তার চাইতেও প্রধানত চেষ্টা করব। আমার কোন কোন পাঠক হয়তো সতর্ক সাধারণ হয়ে নিজের চিন্তা জড়না করে আগামী দিনের রাজনৈতিক পথ চলবেন।

পাঠক তি করতেন; এটা প্রমাণই পাঠকের নিজস্ব ব্যাপার। তবে আমরা এটাকে প্রকাশ করে আমাদের একাই প্রতিশ্রুতি দান করেছি।

আমাদের সমূহ বিপদের কথা চিন্তা করে সকলেরই একবারেরা বইটি এখন প্রকাশ না করে, শেষ হালিমা যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না, তখন প্রকাশ করার পক্ষে তার নিশ্চয়ত। কিন্তু আমরা বামী-রী নথিলিত সকলের ব্যয়ের সাথে একমত হইনি এই ভেবে যে, মানুষের (শেষ হালিমা) দুর্বল মূহুর্তে তাঁর পিছনের কথা কীস করে দেওয়ার মধ্যে কোন ক্ষ সাহস বা কৃতিত্ব থাকতে পারে না।

তাই ভবিষ্যৎ বিভ্রমের সজ্জনা জেনেও সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর তরুল রেখে প্রধানমন্ত্রী শেষ হালিমা শাসন আমলেই এই গ্রন্থ বা পুস্তক প্রকাশ করার

নিরাকৃত নিয়েছি। জীবন মানে পরাজিত হওয়া নয়, অবিরাম যুদ্ধ করা। রাশে  
আজও যুদ্ধ কে?

পাঠক মনে করতে পারেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারীভাবে আমাদের  
(স্বামী-স্ত্রী) কে অব্যাহতি ঘোষণা করতে জানাই আমরা এই জাতীয় লেখা তৈরি  
করেছি। হ্যাঁ, এটা খুবই সত্যি কথা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রিকভাবে  
আমাদের (স্বামী-স্ত্রী) কে অব্যাহতি ঘোষণা করে মনে অব্যাহতির পরিচয় না  
দিখে হঠাৎ আমাদের মাথায় এই ঝড় ঘোঁরা বিঘট্ট আসতো না।

পুলিশ, সিআইডি, ডিবি, আইবি, এনএসআই, ডিএফআইনসহ রাষ্ট্রের সকল  
সহায় আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে অব্যাহতি ঘোষণা করে দেওয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ  
হাসিনার ঐ আদেশই আমাদের মাথায় এই বই বা ঝড় লিখার বিষয় এসে নেয়।

এখানে যা লেখা হয়েছে, তার সবটুকুই সত্যের ছবি। আমরা শুধু সত্য  
বিষয়ের উপর কথা বলি। পৌঁছেছি।

আমাদের লিখায় এই বিষয়গুলো জাগিয়ে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ  
হাসিনাকে জানাই অত্যন্ত ধন্যবাদ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐ বেনাইনী  
আদেশের প্রতি আমরা আরও নতুন করে নতুন করে নতুন করে নতুন করে নতুন করে  
বিত্তর।

রাষ্ট্রের ন্যায়িকতাকে অব্যাহতি ঘোষণা শুধু সরকারি বিরোধী এক কেআইনী  
না, এটা হচ্ছে শপথ কারের স্পষ্ট স্বাক্ষর।

১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন সত্যি নাটকীয় স্বাক্ষরনের দরপায় বসে  
প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের সময় শেখ হাসিনা শপথ নিয়ে কর্মসম্পাদন, আমি শেখ  
হাসিনা সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের  
প্রধানমন্ত্রী পদের কর্তব্য বিপুলভাবে সঙ্গে পালন করিব।

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও অনুগততা পোষণ করিব। আমি  
সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব এবং আমি ভাষা বা অনুগত,  
অনুগত বা বিবাসিত ন্যায়িক না হতে সর্বদা প্রতি আইন অনুযায়ী কথা বিবিত্ত  
ব্যবহৃত করিব।

রাষ্ট্রনীতি হচ্ছে মানুষকে সেওয়ার জন্য, পাওয়ার জন্য নয়। এই বিষয়টি  
নিজে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা দেশে ফেরার পর দিন থেকে ১৯৯৭  
সালের ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় বেসরকারি বিবাসনীন চাকুরি অবসান  
দিয়ে অবশেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের সাক্ষিতে নিম্নেন। আমরা  
পরাজিত ছলাম। শুধুও শুধুতে পারলাম না, রাষ্ট্রনীতি মানুষকে সেওয়ার জন্য,  
পাওয়ার জন্য না। সত্যি কথা বলতে পারি নতুন করে আমাদেরকে প্রধানমন্ত্রী শেখ  
হাসিনা ও তার পরিবারের কাছে বিপদজনক করে তুলেছিলো।

রাষ্ট্রপাতক্যের যিনি অন্য, যেসবান, নিরক্ষরতার এবং দুঃখের। তিনি যিনি  
রাষ্ট্রীয় বা সমাজ জীবনে নতুন সমস্যার হতে পারেন।

ଆକାଶକେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର।

[illegible][illegible][illegible]

1934-35 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ଶୁଭାଶିଷ୍ଟ ଲେଖା  
କଲେ। ଲେଖକ ଓ ଲେଖିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ଶୁଭାଶିଷ୍ଟ ଲେଖା ଲେଖକ ଓ ଲେଖିକାଙ୍କ  
ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ଶୁଭାଶିଷ୍ଟ ଲେଖା ଲେଖକ ଓ ଲେଖିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ଶୁଭାଶିଷ୍ଟ ଲେଖା

[illegible]

২৭/২৫ বছরের বায়লেক্সিগ মেগনোয় কাউন্সিল উপরই তিহি করে "অম্মার জলি লাই" এটি  
হিহিঃ

ਇਸ ਸਮੇਤ 15 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ଏତଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ସ୍ୱା. ସହ. ଓ 'ଆହୁର ମନି ପ୍ରତି' ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳି ବିଶେଷକ ଉପକ୍ରମ, ଯୁଦ୍ଧ-ହତ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି କେବଳ ସେହି ଶାସନ।



The photograph shows the entrance to the Government Hospital, which is a large, arched structure. The person standing in front of the arch is a man in a light-colored shirt and dark trousers. The background shows some trees and foliage.

৩৯-এর ৭ম অধ্যায়ন, ৭০-এর নির্বাচন, স্বাধীনতা ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ, সিরাজ সিকান্দার হত্যা, একদলীয় শাসন, শেষ মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা যুদ্ধ, রাষ্ট্রপতি, জেনারেল হত্যা, ওয়াশিংটন সঙ্কট, ৭ই নবেম্বর সিপাহী বিদ্রোহ।

৭ই মার্চের ভাষণ	১৭
ভাষণে পদাঙ্ক	৪৫
বাংলা নিম্নবিত্তের অসহ্য দায়িত্ব	৫১
প্রতিবাদ যুদ্ধ	৫৭
মুক্তি পদাঙ্ক	৭৩
মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি শেষ মুক্তিযুদ্ধে অসহ্য দায়িত্ব কিভাবে জানা	৭৮
ফকরুল্লাহের শেষ হাসিনা	৮০
এই জিন্দা সেই জিন্দা না	৮২
রাষ্ট্রপতি জিন্দা হত্যা	৮২
নেওয়াজ ট্রেনিং	৮৭
এরশাদকে কমান্ডার প্রমোশনের আদেশ	৮৯
৮৩-র মধ্য ফেব্রুয়ারিতে হত্যা হত্যা	৯০
নেওয়াজ ও নেওয়াজের হত্যা	৯৬
মোহাম্মদী অসহ্য হাসিনা	৯৮
মসজিদ সরিয়ে ফেলুন	১০৩
৮৬-র নির্বাচন	১০৩
এক বছর বাই	১০৫
অধ্যায়ন অধ্যায়ন ফেলা	১০৬
হিয়ারাশির পার্লামেন্টে তেহে মেওরা	১০৭
এরশাদ পতন ও স্বাধীনতার সত্বে	১০৮
এরশাদ পতনে নেওয়াজহীনীর কুশিকা	১০৯
পদাঙ্ক নটক	১১১
টাকার বিনিময়ে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী	১১২
আহালাদ ইমাম ও শেষ হাসিনা	১১৩
গোলাম আবদুল ও শেষ হাসিনা বৈঠক	১১৪
১১৯২ এর হিন্দু মুসলিম যাত্রা	১১৫
কেন্দ্রী আটকিয়ে ফেলে রাখে	১২০
শেষ হাসিনার, গোলাম আবদুলের ২য় বৈঠক	১২০
নির্বাচন বাড়িয়ে দেওয়া	১২৪
শেষ হাসিনা এবং নেওয়াজ হাসিনা	১২৭



ଜନାରଣ କ୍ରିୟାଶିଳ	୧୨୭
ଆଜ୍ଞା ଆମି ଦେଖି ଧର	୧୨୮
ଜାକାର ବାସ ନିତେ ହୁଅ	୧୨୯
ବାହାମାର ହିମାଳୟ ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଗୋଟି	୧୩୦
ଶେଷ ହାସିନୀ ଫିଲ୍ମେ ଗାଳି	୧୩୧
ପଦ୍ମାବତୀ ହାତୀର ଗିରଫ ଏକଜଣକ	୧୩୨
ହୁଅ ବିଫଳ	୧୩୩
ହୁଅ ବାସ	୧୩୪
ହାତୀ-ଗାଁ ଗାଁ କାଳିକାଳି	୧୩୫
ଶେଷ ହାସିନୀର ଗୋଟି ଆମର	୧୩୬
ଅନ୍ତରାଳ ଗାଳି କର ଓ ଆମ	୧୩୭
ନାୟକାବତର ହେଲେ ଆମେ ଦିଅ ଦିଅ	୧୩୮
ନବ ଗାଳି, କେଉଁ ହୁଅ	୧୩୯
ଏକ ଗୋଟି ଅନ୍ତରାଳ ନାୟକ ଗାଳି	୧୪୦
କେଉଁ ଏକ ନାୟକ ପାଞ୍ଚହୁଅ	୧୪୧
ଆମର ନାୟକ ଦେଖିବାଳି କେଉଁ	୧୪୨
ଆମି ଗାଳି	୧୪୩
ଦଶବହୁତ ବଡ଼ତର ଗାଳି ଗାଳି	୧୪୪
ହା ହା, ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୪୫
ଶେଷ ହାସିନୀର ଗାଳି	୧୪୬
କେଉଁ ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୪୭
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୪୮
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୪୯
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୫୦
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୫୧
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୫୨
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୫୩
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୫୪
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୫୫
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୫୬
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୫୭
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୫୮
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୫୯
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୬୦
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୬୧
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୬୨
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୬୩
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୬୪
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୬୫
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୬୬
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୬୭
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୬୮
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୬୯
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୭୦
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୭୧
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୭୨
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୭୩
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୭୪
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୭୫
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୭୬
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୭୭
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୭୮
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୭୯
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୮୦
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୮୧
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୮୨
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୮୩
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୮୪
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୮୫
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୮୬
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୮୭
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୮୮
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୮୯
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୯୦
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୯୧
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୯୨
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୯୩
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୯୪
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୯୫
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୯୬
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୯୭
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୯୮
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୧୯୯
ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି	୨୦୦

বোম্বাওগোলাবিলের নিউ	১৮৪
স্থানিক একজিআলডি মন্ত্রী	১৮৫
সবায় মুখ কালো	১৮৬
আমার সাথে বেসমানী	১৮৮
বেসমান	১৮৮
কুই বোম্বও গুলোজাণি	১৯০
শেখার রাজার কেলকাঠী	১৯২
প্রা ৬জন মুক্তিযোদ্ধা	১৯৪
হটকোট ডিগি পাওনা	১৯৫
অর্থন আমেরিকা সত্তর	১৯৬
মুখ বিমান প্রাণ	১৯৭
কাদের সিদ্দিকী বনাম শেখ হাসিনা	২০১
নিচাপপতি নাহাফুদিন আহমেদের তত্ত্বপতি ইত্তা	২০৫
বেগম আমেনা রিখারে বিকল্প সামলা	২০৭
পদা ও পার্বত্য উত্তরায় মুক্তি	২০৯
মহা ভাষা অসমছে এগং রং নাইউদিন মন্ত্রী	২১১
অনাক্ষিত কোমণা	২১৪
দশ টাকার মোটে শেখ মুজিবের ছবি	২১৭
পুলিশের গুলিতে কেউ মারা যায়নি	২১৮
নেতা ও উপদেষ্টাদের স্নানে সম্পর্ক	২২২
কুজার জরত	২২৫
ক্রিমিক বহমান সোভেটরাষ্ট্র	২২৬
টাকার আর গাশ	২২৮
হাফিজ হাফে না দাবা	২২৯
হিন্দুতা কোর অগোচরী গীণ সর্ধর্ধন ফরে	২৩৪
পাচাত	২৩৫
ছাটি এলাহাবাদ	২৩৭
খেলা	২৩৮
ব্রিড-কবিতা বহুদেশ-অপভ্রংশ	২৪০
প্রথম নির্দেশ	২৪৩
কোন নেতা ছিল না	২৪৭
চিন্তাকারনা ছাড়াই বলা	২৪৮
সাক্ষা-মানবা, তত্ত্বপতি-প্রধানমন্ত্রী	২৪৯
গুলাণা	২৪৪
চাটি ও তিজির কাস্ত	২৪৫
ইকোল মেড্যান - কারেই মেড্যান	২৪৭





৬৯-এর গণ আন্দোলন, ৭০-এর নির্বাচন, স্বাধীনতা ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ, সিরাজ সিকদার হত্যা, একদলীয় শাসন, শেখ মুজিব হত্যা, মুক্তাক বাট্রিপতি, জেল হত্যা, ওরা নম্বরের অভ্যুত্থান, এই নম্বরেরের সিংহাসী বিপ্লব।

১৯৬৯ সাল, যখনই বীরচিত্র এক সম্মানের মাধ্যমে কাম্বাধার থেকে কে করে আমলো স্বাধীনতার ঐতিহাসিকচিত্র নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে। তখনকথিত আগতুলস। স্বকৃষ্ণ মামলার অভিযোগে পাকিস্তান সরকার এক গ্রহননমূলক বিচার করছিল শেখ মুজিবর রহমানসহ সামরিক বেসারিক-বাঙালি কিছু লোকের। কিন্তু বাংলার মানুষ এই মামলা এবং বিচার গ্রহণ করেনি। তপু তই নয়, এই মামলা এবং বিচারের বিরুদ্ধে তাঁরা গণ আন্দোলন করে বাঙালিরা পাকিস্তান সরকারকে বাধ্য করলো এই মামলা প্রত্যাহার করতে এবং শেখ মুজিবসহ সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিশেষ মুক্তি দিতে। তখন বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের উপনিবেশ। আমাদের এই দেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান।

স্বাধীনতার পরে এই আগতুলস। স্বকৃষ্ণ মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে মিলেমিশে ফতুল্লি জাতি যায়। তাহলো, পাকিস্তান ও আমাদের উপনিবেশ বানিয়ে রেখেছিল এবং স্বর্ষের নামে বাঙালিদের শোষণ করছে এটা তারা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল। ঐতিহাসিক শোষণ, ও বাঙালিদের বিশেষ করে বাঙালি নৈনিকদের দ্বিষ্ট করাও বিনয়তলো পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বাঙালিদের মাথা কানদুয়া চলছিল। পাকিস্তান সেনা বাহিনীর বাঙালি নৈনিকরা তাদের প্রাপ্য প্রাপ্তা নিয়ে জাহাজে আরও করেছিল। ঠিক এমনি দুইপক্ষ পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিব সহ সামরিক বেসারিক বাঙালিদের মেয়াদে করে ও আগতুলস। স্বকৃষ্ণ মামলা সাঙ্গা।

এই মানসার অভিযুক্তরা পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন করে এই স্বকম কোন কাঠিন সিদ্ধান্ত সেই সময় নেয়নি। তবে তখন নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়ছিল। এই মামলার এমন অভিযুক্তও ছিলেন গিনি কিছুই জানতেন না। তপু বাঙালি ওজার কার্যসেই মূলত অভিযুক্ত হয়েছিলেন। পাকিস্তান আমাদের অধিকার সচেতনতাকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করে নেওয়ার জন্যই এই আগতুলস। স্বকৃষ্ণ মামলার সূত্রপাত করেছিল। এমন অনেক অভিযুক্ত ছিলেন যারা দালাল করাটিনায়েই আমাদের কারাগার দাঁড়ানো ছাড়া শেখ মুজিবকে আর কখনও দেখেনি।

এক প্রকৃতিতে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দেবার এমন কোন  
 পাট পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত অভিমুখনের কানোই, কখনো ছিল না বাচ্য অংশের  
 কথা। মাদানার প্রায় অভিমুখনের কাছ থেকে জানা যায়। "অভিমুখনের কাছ  
 নতুনশেই হলেন, বাস্তবিকের অধিকার থেকে দৃষ্টিত স্বাধীন এবং নির্বাচনের জন্যই  
 মুক্ত পাকিস্তান সরকারের ক্রিয়াকর্ম এই স্বাধীনতা মন্ত্রণা দাঁড়ের  
 করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা পাকিস্তানের নির্বাচনের বিরুদ্ধে ইচ্ছাচিত্র গণ  
 আন্দোলনের মাধ্যমে শেষ মুক্তিযুদ্ধে প্রতিশ্রুতি সরকারে মুক্ত করে আসে।

১৯৬৯ সালেই তার নেতা প্রোফেসর আহমেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত  
 এক জাত-জনসভার বিশাশ সভার শেষ মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয়।  
 ১৯৭০ সালে পাকিস্তান সরকার আত্মীয় পরিষদ (এম্প্রনর)-এর এবং প্রাদেশীক  
 পরিষদের (এম পিএ) নির্বাচন বোম্বা করে।

মহাসুল জননেতা মাওলানা আবুল হামিদ খান ভাতানীর নেতৃত্বে কিছু  
 সংস্কার কর্মসূচি জাতীয়তাবাদী নেতা নির্বাচন কর্মসূচির জোড়ালে জারিমান জানান।  
 মহাসুল জননেতা মাওলানা ভাতানীর হল, পাকিস্তানী সরকারের নির্বাচনী  
 ফাঁদে পা না দিয়ে পূর্ণস্বাধীনতা স্বাধীন করার সংগ্রাম শুরু করা উচিত। তাদের  
 প্রোগ্রাম ছিল নির্বাচনে ব্যর্থি মাও পূর্ণস্বাধীনতা স্বাধীন করা। অপর দিকে বঙ্গবন্ধু  
 শেষ মুক্তিযুদ্ধে মহাসুল নির্বাচনের সংগ্রামের পক্ষে ছিলেন এবং তিনি জনসম্মুখে  
 নির্বাচনের জং নেওয়ার আহ্বান জানান। জনসম্মুখে বঙ্গবন্ধু আহ্বান জানান অতীতপূর্ব  
 সাক্ষ্য বিষয়ে। সোম পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু এবং তার লক্ষ্য অগ্রসারী লীগের পক্ষে  
 নির্বাচনী জোড়াল বন্ধ গেল। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেষ মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন ও তার লক্ষ্য  
 অগ্রসারী লীগকে জাতীয় পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ২টি  
 আসন ছাড়া বাকি ১৬৭টি আসনে নির্বাচী করলো। যেতে যেতেই শতকরা ৯০টি  
 জেট বঙ্গবন্ধু এবং তার লক্ষ্য গেলেন।

বঙ্গবন্ধু শেষ মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন সাক্ষ্য পাকিস্তানের সংস্কারপন্থী নেতা হলেন।  
 পাকিস্তানের সংস্কারপন্থী জাতীয়তাবাদী ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেষ মুক্তিযুদ্ধে  
 পাকিস্তানের জাতি স্বাধীনমন্ত্রী হিসেবে অভিহিতও করলেন। কিন্তু পাকিস্তান  
 পাকিস্তানের সংস্কার পন্থী নেতা জুনজিরের আর্গি জুট্টা, এবং পাকিস্তানের  
 প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে প্রধানমন্ত্রী-এর জাত দগ  
 জাতীয় লীগকে পাকিস্তানের ক্ষমতা না দেওয়ার মাননীয় জাতীয়তাবাদী  
 পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতাবাদী পন্থী ছিল। আহুয়গিলির মতো, বাস্তবিকের চরম  
 উৎকর্ষিত, উৎকর্ষিত। রাজপথ বিচ্ছিন্নে নিটিং এ প্রকাশিত। মাত্র বয়ে মানসে  
 মানসে উৎকর্ষিত, উৎকর্ষিত। সমগ্র বাস্তবিকের তেবল তাকিরে জাহে জাতির

অধিনায়কগণিত নেতা পের মুক্তিযেব চহনহনর বিক। তিনি আ বলাহেন মেগেব  
কলাক বাহানি আই করেহ। ইতিহাসের আভার অনেক ইতিহাস প্রক পড়িয়ে  
করেহ। যে কোন বহনর কর্মসূচিক তপু পের মুক্তিরেব সেক্ষণা করেহে হতকীক  
নেই-তিনি যে কোন কর্মসূচী মেগেবর সঙ্গে করে বিদ্যুৎ পড়িয়ে বাহানি  
আ বাহনায়িত করেহ। উদ্যোগ আভির মুখে তপু একটি প্রোগাম থর্জন করে  
কিহয়ে, বাহনায়িত থর্জন করে, বাহনায়িত থর্জন করে।

৭ই মার্চের ভাষণ

এইই হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব খই মার্চ ফোর্সেস ময়দান (মোহা কলী  
উদ্যান) জনগণের সন্তর্পণ স্থান। মোহা না হলেই মত মত ব্যক্তি ফোর্সেস  
ময়দানে সমবেত হলে স্বাধীনতা প্রার্থে নেতৃত্ব দাবি শোনাও প্রায়। মত মত  
জনগণের মাঝে একে মীড়ানো, জনগণের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের চরিত্র।  
কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের চরিত্র স্বাধীনতা প্রার্থনা করেও স্বাধীনতা  
প্রার্থনা করেছেন না। প্রাকৃতিক সন্তোষের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের চরিত্র  
হলো এটি কঠিনতা বা স্বাধীনতা দাবি করে চরিত্র শেখ করেছেন।

বসবস্তু বসবস্তু, আমার মাথি মানসে হবে প্রথম; তারপর তিনি বিবেচনা করে দেখবেন, প্রাসঙ্গিকভাবে কাদের, কি কাদের না। যদিও বসবস্তু শেষ মুহূর্তের রহমান বসবস্তু, এমনিভাবে সত্যের আশ্রয়ও মুক্তিও সত্যের, এমনিভাবে সত্যের সত্যের সত্য।

১৯৭১-৭২ সাল যাত্রা না বহরতল শেষ মুক্তিযুদ্ধ বহরতল ৭১-৭২ ৭ই মার্চ  
 স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ৭ই মার্চ '৭১ তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেও  
 স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। অতীত কারণে তিনি ৭১-৭২ ৭ই মার্চ  
 পরিকল্পনাতে স্বাধীনতা ঘোষণা না করে, স্বাধীনতা ঘোষণা করেও একটু বামি  
 ব্যক্তি কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্দেশ্যে ৪টি দাবি করলেন। অন্যতম  
 দাবি এই পাবি যেমন নেতৃত্বের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারে দুইটিই কোন সমস্যা  
 নিষেধ বোধে ছিলেন না। তবে তাঁর নির্দেশে যে, অসহযোগ আন্দোলন তখন  
 চলছিল তা বজায় রাখার নির্দেশ তিনি দেন, এবং সেই সাথে কিছু করে যোগ  
 করলেন স্বাধীনতা দৈনিক সব বক করে নেতৃত্বের নির্দেশ। ইত্যাদি প্রত্যাশার  
 করলেন। কুম, কলকাতা, অফিস, আন্দোলন, কলকাতার জন্য সব বক ঘোষণা  
 করলেন। আস শেষে কর্মসূচীদের বেতন নিয়ে আশঙ্কিত হলেন। শিল্পের  
 মালিককে শ্রমিকের বেতন পৌঁছে দিতে বললেন। রেডিও, টেলিভিশন তাঁর  
 সংবাদ পরিবেশন না করলে বাঙালিদের রেডিও টেলিভিশনে যেতে নিষেধ  
 করলেন।

আন্দোলন করুন নোড় গিল। শায়াগ বুঝতে পারলো স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন পথায়ত নেই। কিন্তু ঠিক করে থেকে স্বাধীনতার দৃষ্ট না দৃষ্টিমুখ তর হুবে এবং তিফারবে হুবে তা নিজে গিল জাম্বীতা ও সংসার। অতঃপরই সঠিক কোন পরিচয় প্রকাশ্য ছিল না।

কোন এক অজ্ঞাত কারণে ১৩-এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একতর জামে সুন্দর করে স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন না কেন, তা কখনো কোন দিন পরিচয় জানা যায়নি।

বিহীনমণ এবং স্বাধীনতা পরিদেখানো জন্য মার, ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যদি পারিষদ্যমের সাথে সম্পর্ক তিফুকবে দালাদ্যমেরকে স্বাধীন পার্বীকীয় বেশ বিহীনমণে দেখা করতেন এবং মুনু ১২ মুনাক মাইল দূর থেকে জামা পারিষদ্যমী সৈন্যদের বন্দী করত বঙ্গতেন, তাহলে পারিষদ্যমী সৈন্যদের সাথে কতটি সৈন্য, ইন্দিয়, পুলিশ ও জনতর যে মতাই বা দৃষ্ট হুবে, সেই দৃষ্ট তর করতক সিনের মধ্যেই সামান্য প্রকাশ্যতর তিফুকবেই আত্মরমের বেশ দৃষ্ট বা স্বাধীন হুবে।

১৯৭১ মাসের ৭ই মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) পারিষদ্যমী সৈন্য সামর্য একই কাল ছিল যে, পারিষদ্যমী পাকসী, সিবি, বেঙ্গুর সৈন্য বাঙালী সৈন্যদের করে, অসম্যক এবং দুর্ভাগ্যকি ছিল। আবার এই পারিষদ্যমী পাকসী, সিবি, বেঙ্গুর সৈন্যদের বন্দিভাষণই ছিল অসিফর। যার দৃষ্ট পরিচয়ক করে কিন্তু নিজেরা সত্যসরি দৃষ্ট করে না। এই কাল সংঘাত পারিষদ্যমী সৈন্যের প্রকাশ্য বা পাকসী করতক দালাতি সৈন্য, ই, কি, আর (আত্মরমের বি, সি, আর) পুলিশ এবং সতক সতর তেরটি জনতর বেবন ক্রমেই সতরমের বেশি সত্য প্রকাশ্যে না।

কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান সঠিকভাবে সতরটি স্বাধীনতা ঘোষণা না করত এবং অসিফরি সত্য সিনে পারিষদ্যমের করে ৩টি মাই বা পূর্ত বেগারের সুযোগে পারিষদ্যমণ নিফ-বারি অতঃপর সৈন্য এবং অর বাংলাদেশ প্রমুখ। ১৯৭১ মাসের ৭ই মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে পারিষদ্যমের বর সামর্যকসি সৈন্য ছিল, ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মরমের পর (৭ই মার্চ থেকে ১৫-এ মার্চ পর্যন্ত) পারিষদ্যমণ বাংলাদেশে তার সৈন্য ও অতঃপর গোলাদকর প্রু ওল বেশি বৃদ্ধি করে এবং পারিষদ্যমী সামর্যকসি সৈন্যের সংখ্যা প্রুখন বাঙালি সৈন্য সংখ্যার চাইতে বহুতর বেশি বৃদ্ধি হত কেবল প্রুথমই পারিষদ্যমীরা বাংলাদেশের অতঃপর প্রুত করে। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের কারণে পারিষদ্যমীরা অতঃপর ততঃপর প্রুতমতটি বহু করে বেগারের কথা বলেছেন। যার না আছে তাই নিফ



মোকাবেলা করাও করা হয়েছিল। স্বাধীন-চৈত্র নত করে দেওয়ার কথা বলেছেন। বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানের চাক-পাশা কাঁটালা করা করেছেন।

কমবলু শেষ মুজিবের রহমান বলেছেন বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে আর এক পাশাও পাঠান হতে পারবে না। কিন্তু বাংলাদেশে আর একজনও পাকিস্তানী সৈন্য আসবে যাবে না একথা কমবলু শেষ মুজিবের রহমান কখনও বলেননি।

তলে পাকিস্তান এই মার্চ থেকে তৎকালীন ঢাকা রেজর্সীও বিমান বন্দর মিলে রাত ২৪ ঘণ্টা কলু সৈন্য আশ্রয় করতে ব্যবহার করেছে।

পাকিস্তান আর্মাদের দেশ থেকে ১২ হাজার বাহিনী মৃতদণ্ডী একটি বেশ। কলু মৃতদণ্ডীই নৃশংস নয়। আমাদের বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের ঠিক পুরোপুরি মাঝখানে চলেছে পাকিস্তানের টিও পত্নমেশ ভারত। এই মাঝখানেই শত্রু আশ্রয়স্থল বিশাল ভারত উপদ্বীপে পাকিস্তানীদের বাংলাদেশে আসা কিছুতেই সত্য ছিল না। গুপ্তই শুভ না। চৌপাশের কলকণই অতি সহজে সত্ৰসমূহে সত্ত্ব প্রাপ্যমানিতে আমাদের দেশ বাহিনী হওয়া খুবই সক্ষম ছিল। উচিত ছিল। এমন হওয়াও বৈচিত্র্য ছিল না যে, দিন দুই, দিন ততক্ষণেই আমাদের দেশ বাহিনী হওয়া। কিন্তু আমাদের বাহিনীভার করা কার্যকারী ব্যবস্থা না নিয়ে, কমবলু শেষ মুজিবের রহমান কর্তৃক পাকিস্তানীদের দীর্ঘ সময় দেওয়ার কারণেই আমাদের বাহিনীভার করা টিও লক্ষ মানুষকে প্রাণ নিতে হলে (টিও লক্ষ পট্টম এর এই সংখ্যা মিথ্যেও ভুল আছে)। খুঁ লক্ষ না পোনালের ইচ্ছা ও নিতে হলে (এই খুঁ লক্ষ ইচ্ছাকৃতদের সংখ্যা মিথ্যেও ভুল আছে)। আরলে শেষ মুজিবের রহমান মানসিকভাবে বাহিনীভার অন্য প্রকৃত হিসেব না। পাকরা পাকিস্তান থেকে বিদ্রিষ্ট হয়ে আসলো বাহিনী রাই তিনি জাননি। পাকিস্তানীরা আমাদের উপর বাহিনীভার দৃষ্টি বা মুক্তি নৃশংস চাপিয়ে দিয়েছিল এবং তাদের আক্রমণ ও ইচ্ছাকৃতের কলমেই আমরা মুক্তিযুদ্ধ করতে বাধ্য হই। অর্থাৎ পাকিস্তানীরাই আমাদের বাহিনী হতে বাধ্য করেছে।

‘৭১ সালের এই মার্চের জামলে শেষ মুজিবের রহমান পাকিস্তানীদের কাছে যে চিঠি দাখিল করেছিলেন- (১) সামরিক আইন জারীল ‘না’ ঘোষণা নিতে হলে। (২) সত্ত্ব সেনাবাহিনীও সের্বসের কাছাকাছি তিরিয়ে নিতে হবে। (৩) সেনাবাহিনী হওয়া করা হয়েছে তার উপর প্রত্যয় হবে। (৪) আর জন প্রতিনিধিদের কাছে কলক হওয়াও করতে হবে। অর্থাৎ কমবলু শেষ মুজিবের রহমানকে পাকিস্তানের প্রকটনরী করতে হবে।

এই বাহিনীভার কনি পাকিস্তানীরা কোন নিত জামলে কি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ করতে হতো? পাকিস্তান থেকে বিদ্রিষ্ট হয়ে আমাদের আসলো বাহিনী রাই বাংলাদেশ হতো? কনি নির্বাসিত তাদের মতে শেষ মুজিবের রহমানের এই মার্চের দাখিল পাকিস্তান দাখিল মেলা নিত জামলে আর যাই হোক, এই বাহিনী বাংলাদেশ বাহিনী হতো না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পাকিস্তানের নির্বাচিত জন প্রতিনিধিত্বের নেতা। পাকিস্তানীরা যদি শেখ মুজিবকে নির্বাচিত নেতা হিসেবে কামড়া নিজে। যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতেন, তাহলে তো আমরা শিখই পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আশালা স্বাধীন রাষ্ট্র হতাম না। বঙ্গবন্ধুও তা জাইতেন না। তখনও কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তিগণ জন প্রতিনিধিত্বের কাছে পাকিস্তান সামাজিক শাসনকে কামড়া হস্তান্তর করতে এবং ব্যক্তিগণ জন প্রতিনিধিত্ব পাকিস্তান সরকার পরিচালনা করতেন এই তো ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রকৃত কথা। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বাঙালি। এই সংখ্যা গরিষ্ঠ বাঙালিরা পাকিস্তান শাসন করবে এটাই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মূল মন্ত্র। ঘটনা প্রবাহেও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পাকিস্তানের শেখ ব্যক্তি, যিনি পাকিস্তানের অবতারণা সূত্রকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন।

ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল পূর্ণ আশুপত্তা। পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক, পাকিস্তান টুকুড়ে হয়ে যাক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কখনই তা জাননি। আর জাননি কখনই পরোক্ষভাবে সুযোগ খাতা সত্ত্বেও তিনি পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আশালা স্বাধীন রাষ্ট্র উত্তরীর জন্য কোন বাস্তব কার্যকর ভূমিকা নেননি।

শেখ মুজিবুর রহমানের এই মার্চের ভ্রমণ হলো দ্বিবেশভ্রমণ ককিশনদ্যাল প্লিন। যে ভ্রমণে পাকিস্তান ঢাকা শেখ ঢাকা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে কামড়া হস্তান্তরের শর্ত দেওয়া হয়ে ছিল। আবার কামড়া না দেওয়া হলে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে আশালা স্বতর্ক ইনিমিত্তি দেওয়া হয়েছে।

এই মার্চের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভ্রমণ ছিল, যিনি ঐতিহাসিক অর্থীকর এক জননা ঐতিহাসিক ভ্রমণ। যে ভ্রমণে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেও স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি।

যে কারণেই আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণার অর্থীকর বা কিন এবং স্বাধীনতার ঘোষণা নিবন্ধ ছিল বিতর্ক।

আমরা ২৩শে মার্চকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করি তার মূল কারণ হলো, ২৫ মার্চ নিম্নলিখিত কত ব্যক্তিগণ পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঘুমন্ত বাঙালিগণ উপর পৌরাসিক অস্ত্রাঘাত ও দণ্ডহত্যায়ণ শুরু করে। ২৫ মার্চ বিয়োগে রাষ্ট্রীয় স্তর অর্পণ ব্যক্তিগণ সময় অনুযায়ী তা ২৩শে মার্চের প্রথম প্রহর দ্বারা হয় কারণই ২৩শে মার্চকে কামড়া স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করি। একুশশতক পাকিস্তানি সৈনিকদের অস্ত্রাঘাত আর ব্যক্তিগণ সময় হিসেবেই যিহেই ২৩শে মার্চকে স্বাধীনতা দিবস শুরু হয়। এই হিসেবে যদি পাকিস্তানীরা আমাদের ২৩শে মার্চকে

আগে অবধা গড়ে যে কোন দিন আক্রমণ করতো তাহলে সেই দিনটাই আমাদের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে চিহ্নিত হতো।

সত্যি কথা বলতে কি, কেউই সঠিক সময়ে পূর্ণাঙ্গরূপে আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। যদিও বলা হয়ে থাকে ২৫শে মার্চ রাত ১২টার পর টেলিগ্রামের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু টেলিগ্রামের ঐ ঘোষণার যথার্থতা বুঝে পাওয়া যায়নি। টেলিগ্রামের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণাটি ভাঙনভরা সময়ের সাতের সাত কোটি বাঙালির কেউ পেয়েছে বা ভয়েছে আজ পর্যন্ত এমন দাবী কেউ করেননি।

২৩শে মার্চ হলো পাকিস্তান দিবস। এই ২৩শে মার্চে পাকিস্তান দিবসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) সহ সার্বভৌম পাকিস্তানের সবকিছু সরকারী-বেসরকারী ভবন এবং শহরের বাড়িগুলোতে সবুজ-লালা চানডায়া পাকিস্তানী পতাকা তোলা হতো। শহরের রাস্তাগুলো পাকিস্তানী পতাকা দ্বারা সজান হতো এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবস পালন করা হতো। কিন্তু '৭১-এর ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) বেবাঙ, কোন সরকারি বেসরকারি ভবনে পাকিস্তানী পতাকা তো উড়ানো হয়নি এবং জনমান সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে এদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) প্রতিটি সরকারি বেসরকারি ভবনে, প্রতিটি বাড়ি ঘরে, রাস্তাঘাটে, গ্রাম বাংলার ঘাড়ে ঘাড়ে এমনকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভবনে সবুজের সাতো লাল বুকের উপর হলুদ রঙের মানচিত্র চিহ্নিত স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দিয়ে পাকিস্তানের দাবিদারপাত ঘটালো। পাকিস্তান দিবসে পাকিস্তানী পতাকা উড়লো না। পাকিস্তানী সৈন্যরা কুঁচকাওয়ার করলো না। পাকিস্তানের কোন অস্তিত্বই বুঝে পাওয়া গেল না। তারপরেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বীকৃত পছন্দ সোভাসুজি স্পষ্ট করে বাংলাই স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। কি এক অজ্ঞাত কারনে শেখ মুজিবুর রহমান দুঃখ খোঁসেননি। নীতব ছিলেন। স্বাধীনতা ঘোষণার বৈধ রাজনৈতিক ন্যায়িক ভেদভ্রমাত্র শেখ মুজিবকেই বাঙালি জাতি নিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান জাতি তর্কক এমন রাজনৈতিক ন্যায়িক পালন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি।

ঐ পরিস্থিতিতে অন্য কারো গকে স্বাধীনতা ঘোষণা করা সম্ভব ছিল না। কেননা শেখ মুজিব ছিলেন বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। তবে পাকিস্তানীরা ভয়, লোভ কোন কিছুর বিনিময়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা চান না এই বকম কোন স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেনি। যদি শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার বিপক্ষে কোন কথা বলতেন, তাহলে আমাদের স্বাধীনতা পাওয়া ডিফিকাল্ট হতে ফের।



অপর দিকে ২৭শে মার্চ প্রচুরাশে চট্টগ্রাম কালুরমাটি বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান দুই বকম স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। মেজর জিয়াউর রহমান প্রথম ঘোষণা দেন, "আই এম মেজর জিয়া প্রেসিডেন্ট গণপুত্র বিপ্লবাত্মক অফ বাংলাদেশ আই ডিক্লারেশন ইনডিপেন্ডেন্ট অফ বাংলাদেশ।

মেজর জিয়াউর রহমান দ্বিতীয়বার ঘোষণা দেন, "আই এম মেজর জিয়া, আই ডিক্লারেশন ইনডিপেন্ডেন্ট অফ বাংলাদেশ, অন বিহন ওয়ারে ছেট লিডার শেখ মুজিবুর রহমান।

মেজর জিয়াউর রহমান বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর (ইউ পাকিস্তান রাইফেল) পুলিশ এবং জনগণকে পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়ে পরাজয় জ্ঞানান। এবং মাদ্রা মুন্সিফের কাছে মুক্তিযুদ্ধের শর্তে সশস্ত্র আবেদন জনান। যদিও জিয়াউর রহমানের ২৭শে মার্চ সকালে এই ঘোষণা দেওয়ার আগেই ২৫শে মার্চ বিকালত শরীর বাতের অধীনে মৃত্যুর সময় অনুযায়ী ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরতই ঢাকাত ই পি আর (ইউ পাকিস্তান রাইফেল) এবং পুলিশ পাকিস্তানীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা ঢাকার রাজস্বাধ পুন্সি হেড কোয়ার্টার এবং ঢাকার পিলখানায় ই.পি.আর হেড কোয়ার্টারে আক্রমণ করেন ইউ পাকিস্তান রাইফেল (আজকের বি.ডি.আর) এবং পুলিশ পাকিস্তানীসের কাছে আত্মসমর্পণের সাথে পাকি আক্রমণ করে। এবং আমতা স্বাভাবিকতা ঐ রাততই ঢাকার বিভিন্ন থানা থেকে পুলিশের রাইফেল এনে পাকিস্তানীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেই। কিন্তু আমতের রাইফেল জাপানের (ট্রেনিং) প্রশিক্ষণ না পাকার আমতা পাকিস্তানীসের বিরুদ্ধে ঐ রাতত যুদ্ধ শুরু করতে পারিনি। ই. পি. আর. ও পুলিশের ঐ রাততের যুদ্ধটা ছিল মূলত আত্মরক্ষার। আরো কোন প্রকার নির্দেশ বা ঘোষণা ছাড়াই ই. পি. আর. ও পুলিশ পাকিস্তানীসের বিরুদ্ধে ২৫শে মার্চ বিকালত শরীর রাততই যুদ্ধ শুরু করে নিয়েছিল। অতঃপরও বলা চলে মেজর জিয়াউর রহমানের ২৭শে মার্চের সকালের স্বাধীনতা ঘোষণার মুক্তি পাশল গোটা বাংলাদেশ জাতি জীবনজালে আশাবিত্ত হয়েছিল। অনুপ্রাণিত হয়েছিল। বিশেষ করে বঙ্গ দেশের জন্য যুদ্ধ করার জন্য মানসিকভাবে চূড়ান্ত প্রস্তুত হয়েছিল তাদের মধ্যে জিয়াউর রহমানের এই স্বাধীনতা ঘোষণা অতঃপর ঢাকার শহর ছেড়ে পায়ে হেঁটে প্রাচ্যের নিকে চলে যায়। শহর ছেড়ে চলে যাওয়া মানুষের এই কাহেলারক একমাত্র

বক্তব্য শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়ার কোনরূপ চেষ্টা না করেই পাকিস্তানীসের হাতে মৃত্যুর হন। অজান্তে কারণে তিনি কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবেই পাকিস্তানীসের হাতে বন্দী হন বলে অনুমান করা হয়।

২৭শে মার্চ থেকে ঢাকার বাসিন্দারা বিশেষভাবে হয়ে লক্ষ লক্ষ নর-নারী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পিঙ্গড়ার শত্রুর হাত ঢাকা শহর ছেড়ে পায়ে হেঁটে প্রাচ্যের নিকে চলে যায়। শহর ছেড়ে চলে যাওয়া মানুষের এই কাহেলারক একমাত্র

যোজ্য ভেদাভেদের কাগজপত্রের সংগ্রহই তুলসী করা হইল। সবুজ গ্রাম আর গ্রামের  
মোটের শেষ করে উঠে শহর ফেলে। শহরকে আওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের মানুষ।

শহর থেকে আসা লক্ষ লক্ষ মানুষকে গ্রামের কৃষক-কৃষকী নিজের সম্রাটের  
মত গ্রামের বুকে চাই দেয়। গ্রামের মানুষ হাওয়া, পানি, মাটি, খাটো চিহ্ন, গর,  
মুক্তি, জীব, যা কিছু সংগ্রহ সকল ছিল তার সবটুকুই উদ্ধার করে বাকিয়ে দিয়েছে  
শহর থেকে আসা মানুষের সম্রাট। শহর থেকে শহরকে আসা মানুষের একটুকু  
কই বেন না হয়, তার সব সাক্ষিই গ্রামবাসী। গ্রামের প্রতিটি সাক্ষির দিন-রাত্রি  
জান রাগা হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ পাচ্ছে। কে বাছে? তার বাকিয়ে পাচ্ছে? তার  
জান পাচ্ছে? কেউ তা জানে না। যারা পাচ্ছে তারা জানে না কে বাওয়াচ্ছে। আর  
যারা বাওয়াচ্ছে, তারাও জানে না কানের বাওয়াচ্ছে। মানুষের মানুষে এ এক মহা  
মিথস, এক মহা সাক্ষি। কখনো পৃথিবীতে এমন হয়েছে কিনা, কিনা তার হবে  
কিনা জানি না। মানুষ মানুষের এক আপন। নিজের চাইতে মূল্যবান অপকল্পন। এ  
মূল্য যাক সেখানে যাতে কোনদিন বুঝবে না। তারপর কোনদিন বুঝবে না।  
পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নেই, শব্দ নেই, এমন কোন জিনিস নেই যে সেখান  
এ সময়ের মানুষের মানুষের ঐক্য, অভ্যুদয়, সমন্বয়, আর নিজের চাইতে অপকল্পন  
বৈশিষ্ট্যবস্তুর চিত্র ফুটে উঠতে পারবে। জাকা থেকে শহর বেঁটে কর্তব্যবস্তুর  
শোষণমূলক মুক্তনুশুর গ্রামের বাকিয়ে দিয়েছি। কত নই শব্দ হয়েছে। শহর  
হয়েছি শব্দ মলী। শহর দিন-রাত্রি রাত্রি শব্দ হয়েছে, রাত্রির গ্রামের বাকিয়ে  
এনেছি। একটি শব্দশব্দ করে হইল। কোনরকম একটি শব্দশব্দ পাছলি। গ্রামের  
মানুষ খাইয়েছে। শৌভ্যের সাক্ষি মলী শব্দ করে নিয়েছে। দিন পরশুর পাওয়াগে,  
জাকাত মেওয়া, মলী শব্দ করে মেওয়া, এমন গ্রামের মানুষের মহা বাকিয়ে  
সৈনিক সাক্ষিই ছিল।

ইতিহাসে ইতিহাসে পশ্চিমের কত কর্তব্যবলী মা-বোন সন্তান প্রসব করেছে। আর  
গ্রামের মা-বোনরা তার সেবার তার খুশি নিজের আপন করে।

এজিলের প্রথম সাক্ষ্য, এজিল মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ায় পালা। চিত্রকে মুক্তিযুদ্ধের  
হওয়া যায়, মুক্তিযুদ্ধ করা যায়। ১৭ই এপ্রিল আওয়াল সালী কলকাতা থেকে তার  
দায় মেওয়া জাকাত, জাকাত আটটার পর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা  
হবে। জাকাত আটটার আওয়াল সালী কলকাতা মেওয়াগে বাংলা করবে বলা বাংলা  
সংস্করণে শব্দ একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে।

শেখরবোধ্যক দায় নিজে শুরু হইল অনুষ্ঠান। আমাকে মুক্তিযুদ্ধের এবং  
কর্তব্যের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ দিন এবং শ্রেষ্ঠ ঘটনাবলী কথা। আর ১৭ই এপ্রিল,  
মুক্তিযুদ্ধ মেওয়াগে বাংলাকাতার অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠান বাকিয়েছিল আমাকে-  
এর মেওয়াগে বাংলা বাংলাকাতার প্রথম সাক্ষ্যের পঠনের কথা জানানো হলো।

মেহেরপুরের খোদাবাক্তলার স্যাক ইতিহাসের স্বর্ণীকর দিয়ে নতুন করে রাখা হলো মুজিব নগর এবং এই মুজিবনগরেই ভাঙ্গুনির আহমেদের নেতৃত্বে শপথ দিল বাংলাদেশের প্রথম এবং বিপ্লবী সরকার। স্বপ্নবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে করা হলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং আর অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে করা হলো অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি; এবং ভাঙ্গুনির আহমেদকে করা হলো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। ভাঙ্গুনির আহমেদের নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভাও গঠিত হলো। জেনারেল ওসমানীকে করা হলো প্রধান সেনাপতি। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি সকলের শপথ অনুষ্ঠানও হলো এই মুজিব নগরে। এখানেই প্রবাসী সরকারকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হলো। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধের নতুন খাতা। ভাঙ্গুনির ইতিহাসে সংযোজিত হলো নতুন অধ্যায়ের। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সুসংগঠিত হলো। আমাদের দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় দিল। আমরা যাঁরা মুক্তি পাওয়া কিশোর, তরুণ, বৃদ্ধ আদরা ভারতে দিচ্ছি সামরিক প্রশিক্ষণ (আর্মি ট্রেনিং) নিলাম এবং মুক্তিযোদ্ধা হলাম। মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার আগে তুমি ভারতীয় হবে মুক্তিযোদ্ধা হব? কিস্তাবে মুক্তিযোদ্ধা হবো। ভারতে ভারতে গ্রামের বাড়ি থেকে আবার ঢাকায় চলে এলাম। এই ঢাকায়ই আমি জন্মেছি। শিত থেকে কিশোর হয়েছি। এখানেই আমার সব বন্ধু-বান্ধব। গ্রামের বাড়ীতে আমার কোন বন্ধু-বান্ধব নেই। মুক্তিযুদ্ধে গাওয়ায় জন্য অন্তত একজন বন্ধু তো হবেই সরকার। কাজেই আমার শরীর প্রদানঘাটি ঢাকায় চলে এলাম। প্রতিদিন তারি মুক্তিযুদ্ধে খাম। কিন্তু কাজে তুমি মা'ও কথা বলে হত। বলে হয় আমি যুদ্ধে চলে গেলে মা তুমি কানবেন। আমার জন্য না অনেক কষ্ট পাবেন, অনেক কানবেন। আমার আর কোন পিছু টান নেই, তুমি মা। আমার কথা আমি ছোট্টেও তারি না। মা'ও অন্যই মনটা আমার কোন হতে চায়। কেনন আমি সব কিছু এসেছলো হয়ে যায়। এইভাবে অবশেষে ভারতে কয়েক দিন চলে যায়। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য মনটা আমার অস্থির হয়ে আছে। কিন্তু মাকেও ছাড়তে পারি না, মুক্তিযুদ্ধেও যাওয়া হয় না।

একদিন আমার মনে হলো, সব ছেলেটাই তো মা আছে। জেলে যুদ্ধে গেলে মা তো কানবেনই। মা'ও কল্লার কথা ভেবে ছেলে যদি মুক্তিযুদ্ধে না যায়, তাহলে তো মুক্তিযুদ্ধ হবে না। দেশও বাধীন হবে না। না, না কানে কান্দুক, আমাকে মুক্তিযুদ্ধে যেতে হবে। দেশ বাধীন করতে হবে। পরের দিনই পাশের বাড়ীর আমার একবন্ধু বাবলে আমার চেয়ে সামান্য বড়, তার আর বাবুল আজাদ-তাকে মুক্তিযুদ্ধ যাওয়ার কথা বলে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গেই বাবুল আজাদ খুশিতে লাগি দ্রুত গেল। বললো আমি তো এই রকমই ভাবছিলাম এবং এই রকম একজন বন্ধুই খুঁজছিলাম।

ভরিপরি গ্রান প্রদান করে একদিন হুগ জেতের দু'জনে ভাঙতের উদ্দেশ্যে  
চতুয়ানা হলান।

আমরা দু'বন্ধু এনেচ পথ নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নদীর পাড়ে একটি বাড়িতে  
এসে পৌছলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা। শ'খানেক পুরুষ-মহিলা-শিশু আগে থেকেই  
নদী-পার হওয়ার জন্য এই বাড়িতে ঘাপটি মেঝে অপেক্ষা করছে। বাড়ির নদী  
ঘাটে ছোট একটি ছিপি নৌকা সাধা আছে। এই ছোট নৌকাটিতে আট মশকনের  
বেশি লোক একসঙ্গে যায় হওয়া থাকে না। এই বাড়ির কোন মানুষ এখানে নেই।  
তবু কয়েটি লোক পড়ে গলে পড়ে আছে। আর এই যে শ'খানেক মানুষ, এরা  
সবাই স্বরশাশী হয়ে ভাবতে চলে যাওয়ার জন্য এখানে জড়ো হয়ে আছে। মহান  
পথ নৌকার মতই এসে নদী পার করে দিবে সেই অপেক্ষায় আছে। নদীতে পাক  
লেন্দুরা গান্ধবট নিয়ে ঘাঁটি করেছে। দিনের বেলায় নদী পার হতে যেসে লেন্দা  
থাবে এবং অর্থিতা গুলি করে মেঝে ফেলবে। তাই রাতের অপেক্ষায় আছে  
সবাই। রাতের অন্ধকারে নদী পার হতে হবে। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। বেশ গাঢ়  
অন্ধকার। হঠাৎ নদীতে পলিক্রান্তী অর্থিত গান বোটের সার্চ লাইটের আলো  
লেন্দা গেল। এই নিমিত্তই আসছে গান বোটটা। চাপা কল্লা হুগ হুগ গেল। কেউ  
কেউ বলছে কাইছেন না কাই, কাইকেখন না, আগ্রাহরে তাকেন।

গান বোটটা ক্রান্ত এই দিকে ছুটে আসছে। সবাই মূর্ত্তা ভয়ে চুপসে গেল।  
কল্লা কোন লাড়ারশক নেই। তবু গানবোটের আন্তর্যাক্স জার সার্চ লাইটের  
আলো। আমরা সবাই মাটিতে হয়ে পড়লাম ব্যত গানবোটের সার্চ লাইটের  
আলোতে ঘেন লেন্দা না যায়। বুকের খেতর জয়। আর উপর মানুষের পচা  
লাশের গন্ধে সম বন্ধ হয়ে আসছে।

দিন চারেক আগে পরিকল্পনায় হানাদকারী এই বাড়িতে হানা নিয়ে এই  
মানুষগুলোকে হত্যা করেছে। অকল-কৃচ্-বলিয়া কল্লা মুখেই কোন শব্দ নেই।  
অতরে তবু আয়াই কলুল (শঃ), আর ভগবানের নাম। খানখোটি মতই এগিয়ে  
আসছে মনে হচ্ছে মূর্ত্তা ততই এগিয়ে আসছে। মূর্ত্তা এখন তবু কয়েক মিনিটের  
ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি একটা ঘাছের অঞ্চলে দাঁড়িয়ে সবাইকে বললাম,  
কেউ শোয়া থেকে উঠবেন না, নড়াচড়াও করবেন না, কোন কথা বলবেন না।  
সবাই মাটিতে খেঁজাবে জয় আহল ঠিক এইভাবেই থাকবেন। কোন একটা  
চিৎকার বা ছোটখাটুট গানই নিশ্চিত মূর্ত্তা। আয়াই পাক যদি সহায় হোন তাহলে  
আমরা ওজাবেই বেঁচে যাব। এ সূজা অম্বাসের আর বাঁচার কোনই পথ নেই।  
সবাই সূরি কর্ত্তাকে স্বপ্ন করেন।

গানবোট একবারে বাড়ির পাশে এসে পড়লো। সার্চ লাইটের উজ্জ্বল আলোয়  
আলোকিত হলো সাদা বাড়ি। বাড়ির আঙ্গিনায় কাপড় তকানোর যে মাড়ি সাধা



ছিল অর্থাৎ সেই নৌকা গেল। বানবোটাটি যত দ্রুত এসেছিল তত দ্রুতই চলে গেল। বাহুলো না। একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল। সবাই ঘেঁষে মন্থন ক্রীড়ন নিয়ে বেঁচে উঠলো। কিছুক্ষণ পর নৌকার হাফি এল। কার আগে কে ধাবে, এক সঙ্গে লাফিয়ে নৌকার উঠে পড়লো। যা হবার তাই হলো। ধীরেই নৌকা ভুবে গেল। নৌকা ভুলে পানি ফেলে মাঝে ভাসলো হালো, সঙ্গে সঙ্গে আবারও সবাই নৌকায় লাফিয়ে উঠলো। পানি সেচে নৌকা আবার ভাঙলো হলো। আবারও সবাই এক সঙ্গে উঠতে গিয়ে ভুবিয়া গেল নৌকা। শিত আর মহিলাজা কঁদতে শুরু করলো। আমি আর আমার বন্ধু বাবুল আত্মক উদ্ধার করে দ্রুতের সুরে বললাম, আমরা দু'জন সবার শেষে যাব। একজনও হাফি প্রকৃত আশঙ্ক যাব না। সবাই নদী পার হওয়ার পর আমরা পার হবো, কে কে আমাদের সঙ্গে নদী পার হবেন?

কেউই কোন কথা বলল না। সকলেই চুপ।

আমরা কখন নিশ্চয় সবাই আগে যাবেন—আমাদের আগে যাবেন। আমরা যত্নে বললো সেই নৌকায় উঠবেন। নইলে নৌকা আর ভুলবো না, সবাই একসঙ্গে মাঝে পড়লো। অন্যদেরও বলে উঠলো ঠিক আছে, আগুনগাই ঠিক করে দিবেন কে কখন উঠবে। কেউ কেউ বলে উঠলো আমার নিজেরাই আমাদের সঙ্গে চলে যাবেন না।

কল্যাণ, বেরতেই তো পারবেন বাই কিনা। কাটকেই ফেলে আমরা ছাঁব না। আমাদের কথা তখন, সবাই নদী পার হতে পারবেন এবং আমাদের আগে পার হবেন।

আগের নৌকা ভুলে পানি ফেলে নৌকা বাহুলো। কান দিতে যেতে এক এক করে মন্থন করে নৌকায় ফুৎলান। নৌকা ছেড়ে গেল। লাফিয়ে গিয়ে আবার নৌকা ফিরে এলো। শেষ টিপ-এ আমরা দু'জনসহ পৌঁছান নৌকার উঠে নদী পার হলাম।

গাঁবড়ের কাছাকাছি বাতেন ভাই নামে একজন লোকের বাড়িতে গাতি কাটানোর পর কল্যাণ বেলায় আমার বন্ধু বাবুল আত্মক কল্যাণ ছেড়ে গেল। সে চাকর ফিরে আসবে। আগের আমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবে। বাবুল আত্মক কল্যাণ কঁদতে কঁদতে বলতে থাকলো, কত মন্থন শুধু মেধেছি, যা বলছে ফিরে আসা। গিঁঝিতে হুগু মেধেছি। বিড়ি হলো বাবুল আত্মক আর আমার বাসায় ঠিক ইন্টা দিকের বাসার মন্থন বড় এক ধনী লোকের মেয়ে। বাবুল আত্মক মেধিকা, দুইই ভাল মেয়ে। সব দিক দিয়েই ভাল। আমার বানহার কমাটিক, বেরতে সুন্দরী, ভাল ছাটী, সবার দিত। (বোঝায় গিঁঝি অতল দৃষ্টি হলেই)। আমারও কত দোয়া করি গিঁঝি কেন মেধেতে দান। বাবুল আত্মক বললো, বাবুলের গিঁঝি আমাকে বলছে, বাবুল তুমি দুকে যেক না। তুমি যাবে গেলে আমি কাকে

ভালবাসবো? তুমি ছাড়া আমি কাউকে ভালবাসতে পারব না। তুমি ফিরে এসে  
নইলে আমাকে নিয়ে যাক। ইত্যাদি ইত্যাদি বলতে বলতে সে কি কান্না বাবুল  
আজ্ঞাসেও। আমরা কাছে বাবুলের দাবী, চল আমরা ঘরে ফিরে যাই।

কান্না যখন কিছুতেই থামতে পারেননি না, তখন বললাম, তুমি ফিরে যা।  
আমি ফিরে যাব না। আমি ঘুমে যাব।

বাবুলের উত্তর আমি তাকে ফেরে একা ফিরে যাব না। চল দু'জনেই ফিরে  
যাই।

না, আমি ফিরে যাব না, তুমি ফিরে যা।

না, আমি তাকে ছাড়া ফিরে যাব না।

বাবুল আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরে আসবে, আমি ফিরে আসব না।  
বাবুলের কান্না থামে না। এক পর্যায়ে বললাম, সীমাত্তের কাছেই তো চলে  
এসেছি, চল আর একটু সামনে নিয়ে দেখি কি হচ্ছে। তারপর ফিরে আসল।

এবার বাবুল আজান বাকি হলো। কান্না থামান। আমরা এবার সীমাত্ত লক্ষ  
করে চলতে শুরু করলাম। যতই সীমাত্তের কাছে যাই ততই বেশি করে  
গোলাগুলির আগুনের শোনা যাচ্ছে।

অনেক চড়াই—উৎচড়াই পার হয়ে পূর্বস্থ মিলে জায়গার ত্রিপুরা রাজ্যের  
রাজধানী অখরতলার গিয়ে পৌঁছলাম। পথের অনেক কাহিনী, সব লিখলে  
ফুলবে না। ভরতের সে আরম্ভ আরম্ভ গিয়ে উঠলাম। জায়গাটা বেশ উঁচু  
পাহাড়ের মত, তবে পাহাড় না। এই আরম্ভ উঠেই দেখি ব্যক্তি পোষাক গুলি  
চার পাঁচ জন আমি একটি বাংকরে দাঁড়িয়ে আছে এবং আরো সাত আট জন  
আমি দাঁড়িয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলছে। সেখান থেকে আমার আশ্রয়স্থল খোঁজ  
হতে গেল। এ আমি কোথায় এসে, যে আর্মির করে সারা পথ কত কষ্ট করে  
এসে আর এখানে এসে সেই আর্মির প্রত্যেককে মুখে সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম।  
করে আমি হিস হয়ে গেলাম। কিছুনাথ জ্ঞান ভ্যে থাকলাম। তারপর কীর কীর  
তাকিরে দেখলাম জনসংখ্যার মাঝে কোন প্রতিষ্ঠান নেই; সরাই আর ঘর আছে  
হল। আমি তাঁর অস্বস্তি হোলে—কি দেখছি না কো? পরে বললাম, ও এইটা  
তো ভয়ংকর! এরা আরও আর্মি। পৃথিবীর জন লোকের আর্মির পোষাকই যে এক  
এটা আমার জ্ঞান ছিল না।

আমরা সবাই কান্না বা গিলিরে না নিয়ে, সোজা কলেজ টিলায় চলে  
গেলাম। কলেজ টিলা যখন অখরতলার এম. বি. সি. কলেজ ক্যাম্পাস। এই  
কলেজ টিলাতেই বাংলাদেশের স্বাধীন ও বর্তমান রাজ্য নেতারা থাকেন। এখানেই  
হল সঙ্ঘাম পরিষদের অফিস। শেখ কবুলুল হক মনির দেবু (পূর্ব পাকিস্তান

ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, আজহারী খুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, দৈনিক বাংলার বাণী ও দৈনিক টাইমস পত্রিকার সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাগনে। '৭৫-এর ১৫ই আগস্টে শেষ মনিকেও হত্যা করা হয়) আ, স, ম, রব (জাকনুর জিনি, জামদ-এর সাধারণ সম্পাদক, হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ-এর ৮৮ সালের পার্লামেন্টের গৃহপালিত বিজেদী দলীয় নেতা। সফিলিক ওয়াচ ভগ, শেখ হাসিনার ঐক্যমতের সরকারের মন্ত্রী।)

আব্দুল কুদুস মামুন ('৭০-'৭১-এর জাকনুর ছাত্র সংসদের জি, এস, ৯০ দশকে তারা যখন এবং গীতপুত্র মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা কবর স্থানে দাকন হর) এম, এ, হশিম (পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক, স্বাধীনতার ইতিহাস পাঠকরা, স্বাধীনতা পর বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, বর্তমানে বাবসারী)। শেখ ফজলুল করিম সেলিম (প্রাক্তন ছাত্র নেতা, শেখ মনির সহকারী, বর্তমানে দৈনিক বাংলার স্বাধীন সম্পাদক, খুবলীগের চেয়ারম্যান জাভিদা সলেন দলদ)। বিজানুর রহমান মিজান (প্রাক্তন ছাত্রনেতা, আব্দুল কুদুস মামুন-এর তত্ত্বাপতি, বর্তমানে ঢাকা জেলাব এ, জি, সি লায়ন্স) প্রমুখ এর কক্সবন্দানে কলেজাটিনা থেকে বাংলাদেশের ছাত্রসেত তালিকাভুক্ত (বিক্রয়) করে সাময়িক প্রসিকরণ নেওয়ার জন্য জগতের বিভিন্ন ট্রেনিং কার্শে পরিত্যক্ত হতো।

এই কলেজ টিমাতে গিয়ে আমরা মনি ভাই, মামুন ভাই, হশিম ভাই এবং মিজান ভাইয়ের সাথে দেখা করলাম। নেতারা বললেন যতদিন ট্রেনিং-এ যাওয়া না হয় এখানে থাক। আমরা দারাদিন আগড়তলায় ঘুরে বেড়াই, প্রাতে কসেত টিলায় ঘুমাই। এমনকি করে প্রায় মান ধানিক চলে গেল। আমরা সঙ্গে করে বাড়ি থেকে যে টাকা-পয়সা এনেছিলাম তা শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। এমিকে ট্রেনিং-এ যেতে আরো বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এই অবস্থায় বহু বারুল অজান একদিন বাংলা, নেত্রো দুনি থাক, আমি চাকার ঘাই, প্রায় বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বাবুলের প্রত্যাব প্রত্যাখান করলাম। বললাম, না ট্রেনিং-এ যতদিন না চাই ততদিন কেয়ে না করে কই করতে পারি।

বাওয়ার দাকন করেই পড়ে গেলাম। মিনে একমুঠো তাক পাইকো পাই ন অবস্থা। আর বাবুলের প্রতিদিন একই কথা—তুই থাক আমি চাকার ঘাই টাকা পয়সা নিয়ে আসি।

আমি বলি, না তুই ঢাকা ফিরে গেলে আর আসবি না।

বাবুল আমাকে বুঝায়, দেখ মোক, আমি যদি এখন থেকে চলে যেতে চাই, তাহলে কি চলে যেতে পারি না? তুই কি আমাকে আটকিয়ে রেখেছিল? আমি চলে যেতে চাইলে তো যে কোন সময় চলে যেতে পারি, তোকে বলে যাওয়ার

সরকার কি? আমি এই জন্যই তোকে বলে যেতে চাই যাতে তুমি জন-স্বার্থ না করিস। তুমি বিশ্বাস কর, আমি কথা দিলাম তিকই চাকার বেগে মা'র কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমার জের কাছে ফিরে আসবো।

আমি বাবুলের কথা বিশ্বাস করলাম না।

যে ছেলে বাংলাদেশে থাকতেই রাত্তা থেকে বাড়ি ফিরে যাওয়ায় অন্য কান্দাশটি ছুড়ে দিয়ে ছিল, সেই ছেলে একা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে চাকার বাড়িতে ফিরে গিয়ে টাকা নিয়ে আমার আশ্রয়ভাষায় আমার কাছে ফিরে আসবে! এটা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে চিন্তা করলাম বাবুল যে কোন দুহুর্কেই সত্যিই আমাকে না জানিয়ে বাংলাদেশে চলে যেতে পারে। তাকে ধরে রাখার কোন উপায় তো আমার নেই। না বলে থাকিয়ে গবেষক আর চাইবে আমিই বাবুলকে বাংলাদেশে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেই। সেই ভাল। আমি বাবুল আজাদকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলাম। দু'ঘণ্টা সীমান্তে এলাম, একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরলাম।

অশ্রুসজল চোখে আমি বাবুল আজাদকে বিদায় দিলাম। মনে হচ্ছিল যেন আর দেখা হবে না। এ দেবাই শেষ দেখা। বিদায়ের বেলায় শুধু বললাম, 'আমার মাকে সাধনা দিন।'

আমি টিমার উপর বাড়িয়ে গইলাম। সামনে সমতল ভূমি, বাংলাদেশ। বাবুল ধীরে ধীরে বাংলাদেশে নেমে গেল। পলকহীন নৃষ্টিতে তরুণের গইলাম বাবুলের যত্নের দিকে। নৃষ্টিতে যতদূর দেখা যায় বাবুল আরও অস্তে ছোট হয়ে যাচ্ছে। এক সময় নৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেল বাবুল আজাদ। টিমার উপর এ একই স্থানে কতকণ নির্ভর, পলকহীন, অগ্ন্যজ্ঞাত স্থানে আনন্দনা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। ভারতীয় এক শিখ সৈন্যের পূর্ণ সংজ্ঞা ফিরে পেলাম। এককণ্টা দ্বিধা মনে করলুম টিলায় ফিরে এলাম। নিজেদের জীবন নিজেদের মনে হলো। সত্যাকৃত ঘুম হলো না। হাতের শুধু মনেতে শক্ত করলাম। দেখতে দেখতে সন্ধ্যাকালেক পার হয়ে গেল। হাল্কা কলক টিমার আমরা দাড়া আতি তামের ঘুর-তাকাওড়ি ট্রেনিং-এ পারিয়ে দেওয়া হবে। তখন হনটা ভাল লাগলো। মুক্তিযোদ্ধা হব। দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করব। বাবুল আজাদের কথা মনে হলো। বাবুল আজাদ আঁই আসবে না, জানি। তবুও যদি আসে, আমাকে পাবে না। এসে দেখলে আমি ট্রেনিং-এ চলে গেছি। আমার সাথে বাবুল আজাদের আঁই দেখা হবে না। যদি বেঁচে থাকি, বাবুলও যদি বেঁচে থাকে, দেশ স্বাধীন হলে হয়তো দেখা হবে। মিঞানুর রহমান মিঞান জাই বুঝ অমায়িক লোক। আমাকে জেতে বললেন, 'তুমি তৈরি হও, দুই চার দিনের মধ্যেই ট্রেনিং-এ যাবে। তুমি ছোট ভো আই-একটু আসেনা হবে। জেতাকে ছোট বলে ট্রেনিং দিতে চাবে না। তুমি চিন্তা করো না। আমি সব ঠিক করে দেব।'



বিজ্ঞান আই-ই ট্রেনিং-এর নিয়মটা লিখে। তাই খুব একটা খাবড়ানাম না।  
 বাবুল চলে গেছে বেশ কয়েক দিন হয়ে গেল। যানের পজীরে নিম্নের অভ্যন্তরে  
 খীন আশা। একজনো বাবুল এগো না? আগামী পরের দিন সকাল সাড়েটার আমি  
 ট্রেনিং-এ চলে যাব। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। মাগরীবের নামঘরের সানান  
 কোরোতেই নেছি, বাবুল আজান বলছে, কেন্দু আমি আইনা পরছি।

আমি হুপ দেবছি: না, ঠিক ঠিক দেবছি, কিছুক্ষণ কুয়ে উঠতে পারলাম না।  
 মজা নাকিই বাবুল আজান এসেছে (নিম্নেজিমার আমীন আহমেদ চৌধুরী  
 ১৯৮৮ সালে ভারত সরকার-এর কাছ থেকে ৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা  
 লাইই করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেনানিবাস (ক্যান্টনম্যান্ট) ও মুক্তিযোদ্ধা  
 কল্যাণ ট্রাস্টে এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯৮/৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ  
 হাসিনা তার দপ্তরে (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে) মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা সংরক্ষিত  
 হয়, ভারতীয় সেই তালিকায় ১মঃ ভলিউম-এর ৪৩১ নং "মোঃ আবুল হোসেন,  
 পিতাঃ এ. কে. আজাদ ৬৪ বি, কে, দাস রোড ফরাশগঞ্জ, ঢাকা।" মোঃ আবুল  
 হোসেন এর ছাক নাম হলো বাবুল আজান)। তখন একা বাবুল আজান আইসনি।  
 সঙ্গে আবার মনির নামে একজনকে নিয়ে এসেছে (নিম্নেজিমার আমীন আহমেদ  
 চৌধুরী ১৯৮৮ সালে ভারত সরকার-এর কাছ থেকে ৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের যে  
 তালিকা সংরক্ষিত করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেনানিবাস (ক্যান্টনম্যান্ট) ও  
 মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টে এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯৮/৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী  
 শেখ হাসিনা তার দপ্তরে (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে) মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা  
 সংরক্ষিত হয়, ভারতীয় সেই তালিকায় ১মঃ ভলিউম-এর ৮৬৬ নং "মোঃ আবুল  
 হাসিম সিদ্দিক পিতাঃ মোঃ সুবেদ আলী ৫৩ নং বি, কে, দাস রোড ফরাশগঞ্জ  
 ঢাকা।" মোঃ আবুল হাসিম সিদ্দিক এর ছাক নাম হলো মনির। বর্তমানে মনির  
 স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস করে। মনির আমনতাবই পাক্তর হলে। আমি  
 অবশ্য মনিরকে এর আগে চিনতাম না। এই প্রথম দেখলাম মনিরকে। বিজ্ঞান  
 আইয়ের ক্লাস গিকে বললাম। আমন হু'বকু ছাড়া আমি ট্রেনিং যাব না। যে  
 করেই হোক বাবুল আজান ও মনিরকে আমার সঙ্গে ট্রেনিং-এ পাঠাতেই হবে।

পরের দিন সকালে মনির বললো, ওঃ বড় তাই মকু তাই আগরকলাতেই  
 কোরোও আছে।

খুটিনামে মনিরের বড় তাই মকু তাইয়ের সন্ধানে। কুঁড়ে ঘের করলাম মকু  
 আইকে। মকু তাই ট্রেনিং শেষ করে আজ নিচে বাংলাদেশের ভিতরে ফুকে মাওয়াত  
 অপেক্ষায় আছে। মকু তাইয়ের কাছেই চনগাম আমার সেজা তাই ঢাকা  
 কায়দে আকচ (বর্তমান শহীদ সোহরাওয়ার্দী) কলেজ ছাড়া মংসনের ছিঃ এস,  
 মজিবুর রহমান মকু ট্রেনিং-শেষ করে অনেক আগেই ঢাকার অপারেশনে চলে

দেখে। কলেজ ভিনাক করে এসে দেখা হলো শহীদ জাইয়ের সাথে। শহীদ ভাই আমাদের সেকেন্ড ভাই মজিবুর রহমান মজিব বকু এবং কায়দে আজম কলেজ ছাত্র সংসদের এ, বি, এস।

শহীদ ভাই আমাদের পরে মাঝে টেক্সা ট্রেনিং ক্যাম্পে সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য। মিজান জাইয়ের স্থানীয়তে পরের দিন সকালে আমরা তিন বকু একটা মিলেটারী সড়িতে উঠে বসলাম অন্যান্যদের সাথে। মিলেটারী সড়িতে উঠার আগে তিন চার জায়গায় আমাদের নাম লেখা হলো এবং আমাদের হাফের নেওয়া হলো। সামরিক সড়ি আমাদের নিয়ে চলতে বাক করল, দুফা বাগান সেতু চোরা নামক ট্রেনিং ক্যাম্প পৌঁছে গেলো। এই সেতু চোরা ট্রেনিং ক্যাম্পে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর কে, বি, নিং এবং মেজর আর, সি, শর্মা'র অধীনে একমাস সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে ২নং সেটেরের সমস্ত দলের মেম্বার থেকে অস্ত্র শস্ত নিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ২নং সেটেরের প্রথম সেটের কমান্ডার ছিলেন মেজর খালেদ মুশারফ। ২নং সেটের কমান্ডার মেজর খালেদ মুশারফকে প্রঃ কর্নেল পদে পদোন্নতি দিয়ে তাঁর নামের ইংরেজি প্রথম অক্ষর K অনুসারে পড়ে রাখা হয় K কোর্স। এবং এই K কোর্সের অধিনায়ক হন খালেদ মুশারফ। তখন ২নং সেটেরের কমান্ডারের সার্জেন্ট নেন ক্যাস্টেন থেকে সদ্য পদোন্নতি পাওয়া মেজর হায়দার। দু'ব সপ্তদত খালেদ মুশারফ তখন ২নং সেটের কমান্ডার তখন হায়দার ২নং সেটেরের টু আই সি ছিলেন।

আমরা খরা অধীনে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছি, আমাদের প্রশিক্ষকদের অসংখ্যের অসংখ্য জায়গায় আমাইন নাম, মিজান নাম, মজিব নাম ও ছাত্রী টিকানা কতজন ভাই, কতজন বোন, তাদের নাম ইত্যাদি বিধন লিপিবদ্ধ করা হয় এবং স্বাক্ষর নেওয়া হয়। এই আতিথ্য ব্যারোডাটা দিতে দিয়ে আমরা বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। ভারত সরকার যদি প্রচেষ্টা করেন তবে আরে ট্রাফিকের মাঝে এমনও আমাদের ইচ্ছে দেয় করে ফেলতে পারবে। একমাত্র তাদের নিকটীয় দীর উত্তম আর কাসেমীয়া বাহিনী ছাড়া, আমরা যারা ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছি—এই মুক্তিযোদ্ধাভাই মূল মুক্তিযোদ্ধা বা প্রথম মুক্তিযোদ্ধা। এই মুক্তিযোদ্ধাভাই দেশে এসে ফরা বুরকনের ট্রেনিং দিয়ে আরো মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করে। অর্থাৎ ভারতীয় প্রশিক্ষণার্থী মুক্তিযোদ্ধাদের থেকেই অন্য নতুন সৈন্য প্রশিক্ষণার্থী মুক্তিযোদ্ধা। এই হলো ইন্ডিয়ান ট্রেনিং এবং সোভিয়েট ট্রেনিং মুক্তিযোদ্ধা। এই মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে এদেশের আপামর জনতা যোগ দায় হলো মুক্তিযোদ্ধা। যদি মুক্তিযোদ্ধা বলা হয়, বা ধরা হয়, তাহলে কেবল যারা রাজাকার, আলবদর, আল-আমস ন্যায়ীত দল (মাফে সাত কোর্স) নাহালিই মুক্তিযোদ্ধা।

যেমন সেনাবাহিনী, সেনাবাহিনীর সকল সদস্যই যুদ্ধ করে না। সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের লোকদের দায়িত্ব হচ্ছে, ব্রীজ, কালভার্ট, পুন ইত্যাদি তৈরি করা। যুদ্ধ করা নয়। আরও সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোর বা সিগন্যাল কোর—এর সদস্যরা যুদ্ধ করে না। মেডিকেল কোরের দায়িত্ব হচ্ছে আহত সৈনিকের চিকিৎসা করা, যুদ্ধ করা নয়।

সিগন্যাল কোরের দায়িত্ব হচ্ছে সিগন্যাল দেওয়া। যুদ্ধ করা নয়। সেনাবাহিনীর সাপ্লাই কোরের লোকেরা যুদ্ধ করে না। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে রসদ, গোলাবারুদ, খাদ্য ইত্যাদি সকল কিছু সাপ্লাই করার বা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে সাপ্লাই কোরের। সেনাবাহিনীর পদাধিক (ইনফ্যান্ট্রি) গোলাবাজ (আর্টিলারি) ইত্যাদি কোরের কাজ হচ্ছে যুদ্ধ করা।

সেনাবাহিনীর পদাধিক (ইনফ্যান্ট্রি), গোলাবাজ (আর্টিলারি) ইত্যাদি কোরের কাজ হচ্ছে শত্রুরে আক্রমণ করা বা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা আরও সাধারণ ভাষায় যুদ্ধ করা। ইঞ্জিনিয়ারিং কোর, সিগন্যাল কোর, মিডক্যাল কোর, সাপ্লাই কোর ইত্যাদি সকল কোর মিলেই হয় সেনাবাহিনী।

এখন যদি ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের লোকেরা ব্রীজ বা পোল না বানিয়ে দেয়। তাহলে সৈনিকেরা বদী পার হতে পারবে না। মেডিক্যাল কোর চিকিৎসা না করলে আহত সৈনিক যুদ্ধ হতে পারবে না। সিগন্যাল কোর সিগন্যাল না দিলে সৈনিকরা যুদ্ধে পারবে না। সাপ্লাই কোর সাপ্লাই না দিলে সৈনিকেরা গোলাবারুদ পাবে না, খাদ্য পাবে না।

এখন যদি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর ব্রীজ না তৈরি করে। মেডিকেল কোর চিকিৎসা না দেয়, সিগন্যাল কোর সিগন্যাল না দেয়, সাপ্লাই কোর সাপ্লাই না দেয়। তাহলে কি পদাধিক বা গোলাবাজ কোর যুদ্ধ করতে পারবে? না, পারবে না। যুদ্ধ করতে হলো উল্লিখিত সকল কিছু চাই। এই সকল কিছু মিলেই হয় যুদ্ধ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধও সকল কিছু মিলেই হয়েছে। যেমন নৌকাত মাঝি মুক্তিযোদ্ধাদের নদী পার করে নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের দায়িত্ব পালন করেছেন। গ্রামে ছাত্তার বা গ্রন্থের লোকজনদের মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা করে মেডিকেল কোরের কাজ করেছেন। গ্রামের কৃষক পাতিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রতি বিধির পন্থা মুক্তিযোদ্ধাকে আশ্রিত সিগন্যাল কোরের ভূমিকা নিয়েছেন। গ্রামের বা ডাঙ জেবে কাইয়েছেন এবং সাধারণ মানুষ অস্ত্র ও গুলির বোমা সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের পৌঁছে দিয়ে সাপ্লাই কোরের কাজ করেছেন। তবেই না কেবল আমরা মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছি। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা পদাধিক বা গোলাবাজ কোরের কাজ করেছি। গোটা সাতক সাত কোটি বাঙালি ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল, সিগন্যাল, সাপ্লাই ইত্যাদি কোরের কাজ করেছেন। এবং এই সকল কোরের সমন্বয়ে অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা জনতার সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে মুক্তিবাহিনী।

কেবল মাত্র রাজাকার আগবন্দর ব্যতীত সকল বাঙালি মুক্তিবাহিনী। পাকিস্তানীরা অবশ্য এই কথাই স্বিকার করেতো, আর এই অন্যই তারা নির্বিচারে বাঙালি হত্যা করেছে। নির্বিচারে বাঙালি হত্যা করা ছাড়া পাকিস্তানী সৈনিকদের আর যা করার ছিল তা হলো আত্মসমর্পণ। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অবস্থা ছিল দীপান্তরে বা নির্বাসনে আসা মানুষের মত। নির্বাসনে বা দীপান্তরে আসা মানুষকে সাথে পাঠসেনাদের পার্থক্য ছিল শুধু নিরস্ত্র আর সশস্ত্র। নির্বাসনে পঠানো মানুষ থাকে নিরস্ত্র। কিন্তু পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সৈনিকদের আধুনিক অস্ত্রসর নিয়ে নিজ ভূখণ্ড পাকিস্তান থেকে ১২৭৩ মাইল দূরে বাংলাদেশে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। পাকিস্তানী সমরবীর ও রাজনীতিবীতরা মনে করেছিল তারা শুধু অস্ত্রের ক্ষেত্রে মানুষ খুন করেই বাংলাদেশ দীর্ঘ দিন দখল করে রাখতে পারবে। কিন্তু সেই সময় নিরস্ত্র বাঙালি সংক্ষিপ্ত সামরিক ট্রেনিং নিয়ে অস্ত্র হাতে কুলে নিজ, সঙ্গে সঙ্গে শুধু শহর অঞ্চল ছাড়া গোটা বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ চলে খেম মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিবাহিনীর কাছে। বাংলাদেশে আসা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীও কাছে যে ধরনের অস্ত্র এবং যে পরিমাণ অস্ত্র ছিল তা নিয়ে কেবল নিরস্ত্র মানুষকে দীর্ঘদিন মাঝিয়ে রাখা যেতো ঠিকই। কিন্তু সশস্ত্র মানুষকে যেদি দিন মাঝিয়ে রাখা কিছুতেই যেতো না। এখানে ভারতের মত একটি স্বেচ্ছা আক্রমণ যোদ্ধাবলী করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানীদের অস্ত্র ছিল সম্পূর্ণ অকার্যকর। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধা এবং এদেশের আপামর জনতা অর্থাৎ মুক্তিবাহিনীর নাপটো পাক হানাদকারী বাহকের বেলার চপাকেরা বদল করে নিল। তবে পাক হানাদকারী ঠাড়া বাহার, একটা পরিকল্পনা দ্রুত চালিয়ে যেতে থাকলো তাহলো—এদেশের নারীদের মর্ষণ করা। পাকিস্তানীদের নীল নকর্যাই ছিল এদেশের কিশোরী, যুবতী, রমণী নির্বিচারে মর্ষণ করে তাদের পেটে পাকিস্তানীদের যাত্রজ সন্ধান তৈরি করা। বাঙালি নারীরা খেতে পাকিস্তানী যাত্রজ বংশধর বুদ্ধিকর্য এবং পাকিস্তানী এই যাত্রজলের দিয়ে বাংলাদেশকে চিরচাল দখল করে রাখা। পাকিস্তানীরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে জন্য খোলাখ অধ্যম, মতিউর রহমান নিজাব্বীদের মত মুষ্টিমেয় হাতে সোনা কতিপয় দুলিত স্বস্তিকে তাদের দোসর হিসাবে পেল ঠিকই। কিন্তু গোটা বাঙালি জাতি পাকিস্তানীদের চিরদিনের জন্য উপড়ে ফেলার জন্য ছিল বন্ধ পরিকর।

অপর দিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধির সরকার এবং ভারতের জনগণ বাঙালির জন্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের সতক ধরনের সাহায্যের দুয়ার কুলে দিল অকৃপনভাবে।

মুক্তিযুদ্ধের মাত্র নয় মাসের মাথায় ভারতের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধ কোথ গেল। একদিকে মুক্তিযোদ্ধা জনগণ মিলে লাভে লাভ কোটি মুক্তিবাহিনী, তার আমার দাঁসি চাই—৩



সাথে যোগ হলো ভারতীয় সেনাবাহিনী। মুক্তিবাহিনী আর ভারতীয় বাহিনী মিলেমিশে হলো মিত্র বাহিনী। ৬ই ডিসেম্বর মিত্র বাহিনী সাতাশি অগ্রসর হয়ে কক্সবন্দী নির্বাসনে আসা দিশাহারা পক্ষে হানাদার বাহিনী মাত্র দশ দিনের মাধ্যমে ১৬ই ডিসেম্বর এ অসহায়-এর মত পরাজয় বরণ করলো। হিয়ানকই হানাদার পাকিস্তানী সৈন্য জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল এসেকোর্স ময়দানে (বর্তমান মোহরাওয়ানী উদ্যান) আত্মসমর্পণ করলো। এই আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দলিলে, আত্মসমর্পণকারীদের পক্ষে পাকিস্তানীদের জেনারেল নিয়াজি স্বাক্ষর করেন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল হলেকিং সিং আরোত্রা বিরোধীদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। বিবেচিত পরবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত হলো স্বাধীন সংবিধান বাংলাদেশ। মুক্তি পাগল মানুষ মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রকাশ্য অংশগ্রহণের মাধ্যমে জিনিয়ে আনলো স্বাধীনতার লাভ সূর্য।

বাঙালী জাতি শত্রু হুছের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন দেশে ফিরিয়ে আনলো।

স্বাধীন দেশে কিংবা এনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, দায় সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বিপুলি সরকারের প্রধানমন্ত্রী বা মুজিব নগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুম্মিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে নিজে প্রধানমন্ত্রী হলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে অস্ত্র জমা নিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে বাঙালিরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অধীনে চাকরী করেছে ও পরাজিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে সেই পরাজিত প্রশাসনকে, পুনর্নির্বাচিত করলেন ও দেশ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত করলেন। আর মুক্তিযোদ্ধারা কে কোথায় কোন কার কোন বদর রাখলেন না। শুধু তাই নয়, ভারত সরকারের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পূর্ণ অস্ত্র তালিকা প্রকাশ করেও সেই তালিকা না এনে নামানজমকে নিয়ে নানা চক্রের মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট বিতরণ করলেন। অয়ার জানা মতে, ঐ মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট কোন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা তো মেনেইনি, বরং যারা রাজস্বকারি ছিল, চরম সুবিধাবাদী ছিল, যারা মুক্তিযুদ্ধের ধার কাছ দিয়েও হাট্টেনি তারা ঐ সকল মুক্তিযোদ্ধা তালিকা ভুল হয়েছে এবং সার্টিফিকেট নিয়েছে।

একজন মুক্তিযোদ্ধার জাতির কাছ থেকে একমাত্র, কেবলমাত্র সম্মান স্বাধীন আর কিছু পাওয়ার থাকতে পারে না। মুক্তিযোদ্ধারা জাতির পৌরব। ভারত সরকারের কাছে যেতে মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা নিয়ে আসার সহায় প্রস্থা গ্রহণ না করে, কোন শেখ মুজিবুর রহমান নামানজমকে নিয়ে (অনেক বিতর্কিত ব্যক্তিও এর মধ্যে আছে) নানান চক্রের তালিকা আর মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট দিয়ে লোকে গোবড়ে বেহুল অবস্থা করলেন, তা বোধগম্য নয়।

মুক্তিযোদ্ধারা থাকবে না। স্বাক্ষরবে দেশ। স্বাভাবিক হলে মুক্তিযোদ্ধাদের  
তালিকা। কিন্তু শেখ মুজিব অতি সন্মান ও অতি সহজ কাজ জীবিত থেকে  
মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত তালিকা নিয়ে আসতে কোন ব্যর্থ হলেন। এই ব্যর্থতার জন্য  
একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কখনই ভুল করা হবে না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি জাতির ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সর্বোপরি  
বিশ্বাস অকাল হেরে, তিনি অন্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। জাতির আশ  
ছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব  
একটি জাতীয় সরকার গঠন করবেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তা  
করলেন না। তিনি সরকার গঠন করলেন মুক্তিযুদ্ধের কঠিন ত্যাগের পরীক্ষায়  
শিঙ্কিয়ে পড়া, দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনে চরমভাবে ব্যর্থ, সুবিধাজনক  
আগ্রহানী স্বীকার নেই নব স্বাক্ষরের নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতা আজুদ্দিন  
আহমেদসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যু হলে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান  
পর্যাপ্ত প্রশাসন ও যোদ্ধাদের নিয়ে স্বল্প মুক্তের মাধ্যমে বিজয়ী একটি জাতি ও  
একটি দেশকে পরিচালনা করতে চেয়ে, আসলে বিজয়ী জাতিকে পরাজয়ের  
মহত্ব হলে দিলেন।

একজন জাতীয় নেতার জ্ঞান পরিসর আর অভিজ্ঞতায় শূণ্য দল হতে যদি  
একশত মার্কিন লক্ষ্যের হয়, তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ছিল পঞ্চাশ  
মার্ক। পাকিস্তানের হেইল ককিণ বঙ্গবন্ধু আন্দোলন আর সংগ্রামের মাধ্যমে  
শেখ মুজিবর রহমান পঞ্চাশ মার্ক অর্জন করেছিলেন। অন্য স্বাধীন পঞ্চাশ মার্ক  
অর্জন হতো, যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় শাক্তিকরতা  
ক্যারি বন্দী না হয়ে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতেন। তাহলে তিনি প্রত্যক্ষভাবে  
বুঝতেন মুক্তিযুদ্ধ কি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কি। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ কি।  
মুক্তিযোদ্ধা কার ধ্যে এবং নিতাবে মুক্তিযোদ্ধা হয়। একটা জীবিত জীবনে  
মুক্তিযুদ্ধ বাধ্যতাব্য আসে না। জাতির জীবনে মুক্তিযুদ্ধ আসা বিরল জাপোয়  
বাধ্যতাব্য। একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই একটি জাতি সেই মনে দাখ্য হলে  
নিজাধ্য এবং পুজনা ধানধাকনা, পুজনা সকল দারদা, নহীর্ণ সকল জিয়া পেড়ে  
ফেলে জাতি বন্ধন করে জন নেত। একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের জীবনগণ কঠিন  
পরীক্ষার মাধ্যমেই দেশ ও জাতির সেবায় এগিয়ে আসে জাতির ধীর  
সন্তানরা। আর পিছনে পড়ে যায়, পাশিয়ে যায় সুবিধাজনকী ভীক  
কাপুকনের দল। কেবল মুক্তিযুদ্ধের সময়ই পরিকল্পনা চেনা যায় কার  
সুবিধাজনকী ভীক কাপুকন আর কারা জাপী নাহী পুজব। কিন্তু জাতির  
পুজাখো, দুর্ভাগ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান চিনলেন  
না, জানলেন না জাতির নাহী, জাপী পুজবদের। এগিয়েই বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবের পঞ্চাশ মার্ক ঘাটতি থেকে নেই। শুধু পঞ্চাশ মার্ক নিয়ে তিনি দেশ চালাতে গেলেন। স্বাধীনতার যুদ্ধে পরাজিত হলো। বন্দী হলো। কিন্তু তাদের পরাজিত ভাবেরটা বাঙালি প্রশাসনটা রক্তশোষণ। বন্দনকু শেখ মুজিবর বহুমান এই পরাজিত স্বাধীনতার প্রশাসনটা শুধু অকতই ব্যবহেলন না বরং বিজয়ী বাঙালি জাতির মাথার উপর পুনরায় গাঙ্গিয়ে দিলে।

তিনি বলে ও প্রশাসনে মুক্তিযোদ্ধাদের তেমন স্থান দিলেন না। এক সময়ে যাত্রা বন্দনকু শেখ মুজিবের দল ছিল, সমর্থক ছিল তারা নিতক হলো, জাতি নিতক হলো। মাজতে থাকলো নিরাশার সংসার। হতাশা আর নিরাশার কিতব দিলে সময় বরা হোত থাকলো।

এমনশর কৃষক-প্রাথমিক ছাত্র জনতা এবং সামান্য মানুর জীবনগণ করে যুদ্ধ করেছে। জীবনগণ করা সকল যোদ্ধাদের অধা পোতা জাতির শুধু একটি বপু ছিল। একটিই আশা ছিল। আর সে-ওপু ও আশা হলো সুখে থাকার বপু, সুখে থাকার আশা। সুখ বলাতে যা বোঝায় তাহলো, থাকার জন্য বপু। সুনার জন্য বপু। যোগ্যতারের জন্য চিকিৎসা। পরিধানের বস্ত্র এবং আনের জন্য শিক্ষা। এই বস্ত্র, বস্ত্র, খাদ্যপান, চিকিৎসা ও শিক্ষার নিত্যতাই হলো সুখে থাকা। আর এই সুখে থাকার জন্যই এদেশের মানুষ শতাই করেছে, যুদ্ধ করেছে।

অস্পষ্ট হলেও জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল সমাজ বিপ্লবের। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক উপাদান ছিল, মুক্তিযুদ্ধে সমাজতান্ত্রীয়াও ছিলো। কিন্তু সমাজতান্ত্রীয়া নেতৃত্ব দিয়ে আত্মীয়স্বজনদের উপরে উত্তর অংশে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধ বিঘ্নে লাভ না করে অসমাপ্ত থেকে যায়। কয়েক সামাজিক বিপ্লবও অসমাপ্ত থেকে যায়। স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে জনগণের মুক্তি। দেশ স্বাধীন হলেও কিন্তু জনগণ মুক্তি পেলে না। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি হলো না। স্বাধীনতা উত্তর স্বাধীনতাতে পুরাতন সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়ার মধ্য শিলা নতুন মানুষের জন্য আদিকার ও সুযোগের লান্দ পরিচালনা না করে বরং প্রাত্যহক করেছে সামাজিক বিপ্লবকে। বস্ত্র হেঁকেছে অসমাপ্ত বিপ্লবের পুরাতন বাগকে। তারা মুঠন করেছে দু'হাতে। আমলা, কালো ব্যবসায়ী, অসমাপ্ত রাজনৈতিক এরাই জগৎগত ধনী হতেছে স্বাধীনভাবে। জনগণের অর্থগতি হবে কি? কান্দা আত্মা নিঃশ্বাস, আরো দহিত হতে থাকলো। নেতৃত্ব সমগ্র জনগণের স্বার্থ না দেখে, শ্রেণীস্বার্থ দেখেছে। ভাষ্যবর্ষের বিষয় নেতৃত্ব যে কেবল শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, আটক ছিল দল এবং সর্বপরি পরিবাহের কাছে। দেশে দুর্ভিক্ষ শুরু হলো। হাজার হাজার মানুষ না হোত পেয়ে ক্ষুধার মাত্রা পেল। বৃষ্টি পেলো মুঠন ও দুর্নীতি। শেখ মুজিবের নেতৃত্ব বিঘ্নসম্পন্নতা হঠাতে কাপলো। অপর দিকে অসমাপ্ত সামাজিক বিপ্লবের বিপ্লবীরা পূর্ব বাংলা সর্বস্বতা পালিত

মহান নেতা কমরেড সিরাজ সিকদারের নতুনে তাদের সমস্ত বিপ্লবী কর্মপরতা তীব্রতর করে তোলে। যুবকরা পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি জিন্দাবান, কমরেড সিরাজ সিকদার জিন্দাবান ধনি দিয়ে দেশে ব্যাপক এক নতুন সংগ্রাম শুরু করে। এই সংগ্রামের নাম দেয় শ্রেণী সংগ্রাম। দলে দলে যুবকরা সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে এই সমস্ত সংগ্রামে যোগ দিতে থাকে।

আমি কাল থেকে শিক্ষিত ও ধনী পরিবারে সিরাজ সিকদার অন্যতম করেছি। সিরাজ সিকদার বুঝই মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং নিজের বি. এস. সি. (সিভিল) ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ছাত্র জীবনে তিনি বামপন্থি ছাত্র সংগঠন করতেন। শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজ বিপ্লবের প্রয়োজনে কমরেড সিরাজ সিকদারের সমস্ত সংগ্রাম এতই ব্যাপক ও তীব্র হলো যে, শেষ মুজিবর রহমানের প্রশাসন দিনে দিন অচল হয়ে যেতে শুরু করলো। নির্বাক্তিত নিষিদ্ধিত শোহিত বাঙালির ক্ষণে কমরেড সিরাজ সিকদারকে ঘিরে নতুন স্বপ্ন দানের বাঁধতে লাগলো।

১৯৭৪ সালের ২রা জানুয়ারী সিরাজ সিকদার খেতাব, পলায়নকালে পুলিশের ওলিতে নিহত, এই শিরোনামে দেশের সকল পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশিত হলো। পুলিশের প্রেসনোটে বলা হলো সিরাজ সিকদারকে খেতাব করা হচ্ছিল। এবং সাতার রোড দিয়ে নিয়ে আসার সময় সিরাজ সিকদার পুলিশের গুলান থেকে লাফিয়ে পড়ে পাশিয়ে মাওয়ার চেষ্টা করেছিল। এখন পুলিশ ওলি করে, সেই ওলিতে সিরাজ সিকদার নিহত হয়।

কিন্তু অবুসন্ধান হবে জানা হার পুলিশের প্রেসনোটে কোনোটি। সিরাজ সিকদারকে খেতাব করা হয় ঠিকই। এবং খেতাবের পর কিনা নিচারে যদি অবস্থায় ওলি করে হত্যা করা হয়। সিরাজ সিকদারের বুকে মোট পাঁচটি ওলির চিহ্ন ছিল। যা সামনে থেকে কল্প হয়েছে। কেউ যদি পাল্লাতে থাকে এবং পল্লারন পর ব্যক্তিতে যদি পিছন থেকে ওলি করা হয়, তাহলে সেই ওলি পিঠে নিক হয়। কিন্তু সিরাজ সিকদারের বুকে বুকে পিঠে নিক হচ্ছিল। তিনি যেহেতু মানুষের মুক্তির জন্য, শোষকের শোষণ থেকে মানুষের মুক্তির জন্য ব্যক্তিগত সকল ভোগ বিলাস সুযোগ-সুবিধা বিসর্জন দিয়ে সর্বহারা শ্রেণীতে মিশে গেলেন। নিষিদ্ধিত নির্বাক্তিত সর্বহারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঘর সংসার, আত্মীয়-পরিজন, আত্ম-আত্মা ভোগ করে সমাজ বিপ্লবে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিলেন। মানুষের জন্য এমন উৎসর্গকৃতপ্রাণ কমরেড সিরাজ সিকদারকে কিনা বিচারে বনী অবস্থায় নির্মম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পর শেষ মুজিবর রহমান পবিত্র পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে দেশের মাঝে বললেন, আজ কোঁথার সিরাজ সিকদার?

এই ঘটনার পর শেষ মুজিবের দেশপ্রেম, স্বকলুতবতা, এবং আইন ও বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রণয়ের সবুধীন হয়ে পড়লো। মানুষ জব্বতে লাগলো শেষ



মুক্তির যদি একজন দেশপ্রেমিক হন, একজন বীর হন, একজন মহান নেতা হন, তাহলে কি করে আর একজন দেশ প্রেমিককে আর একজন বীরকে আর একজন সর্বস্বত্যাগী মহান নেতাকে বিনা বিচারে বন্দীশাসন তুলি করে হত্যা করতে পারতেন? আবার এই জঘন্য অন্যায় ও কলঙ্কের কথা পবিত্র পাল্লামোড়ে লঙ্কেই নামে শেখ মুজিব কি করে বলতে পারতেন।

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবের বহমান প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি হলেন। দেশের সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। এবং প্রতিষ্ঠিত করলেন একতলীয় হাকশাসি শাসন ব্যবস্থা। শেখ মুজিবের হাকশাসি ছাড়া কেউ অন্য কোন দল করতে পারবে না। সরকার নিয়ন্ত্রিত চারটি সংবাদপত্র ছাড়া, দেশের অন্য সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। জাতির বিতর্কিত পেল না। আশা মিথ্যার মিশ্র প্রতিজ্ঞা বইতে লাগলো। ১৯৭৫ সালের ৭ই জুন বহু মানুষ, বহু শেখাজীবি সংগঠন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বহমানকে হাকশাস করার জন্য প্রবল বর্ষন উপেক্ষা করে অধিবেশন জানালো।

সরকারী মালিকানায নেওয়া দৈনিক ইকোমাকনহ চারটি পত্রিকা ছাড়া হাকি সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ। শেখ মুজিবের নেওয়া নতুন একতলীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজনীতিবীদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সাময়িক-বেসাময়িক বাঙালিহ দেশের সকল নাগরিকের কিছুই বলার সুযোগ থাকলো না। সর্বত্র নিপুত্বতা।

১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সাল। ফজরের আজানের পর কাক ডাকা ভেয়ে রেডিওতে মেজর ডালিমের কণ্ঠ, আমি মেজর ডালিম বলছি, স্বৈরাচারী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য কার্ফু ঘোষণা করা হয়েছে।

এর পর দ্বিতীয়বার ঘোষণা করা হলো, শেখ মুজিব ও তার স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করে বঙ্গবন্ধু মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে সাময়িক বাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে এবং কার্ফু তুলি করা হয়েছে।

সরকারী হিসেবে শেখ মুজিব খাদেম দীর্ঘদিন করে এবং পরে বোকাহেন সেই সকল আওয়ামী লীগের নেতা নীতন এবং নিপুত্ব করেছে। সামান্য সংঘাত কিছু ছাত্রলীগের তরুণ নেতৃস্থানীয় কবীর আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে গোপাযোগ করলে তারা সবাই দুর্গতাপ প্রকৃত এবং অপেক্ষা করার ও সেকর পরামর্শ ও নির্দেশ দেয়। নেতাদের ইচ্ছাকৃতভাবে এতটা কঠিন ভাবনাগ ছিল, যা কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দেশ হিসেবেও মানা হয়েছে, এই ভাবনাগ বা নির্দেশটি হলো 'ওয়েট এড সি'। '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিব হত্যার পর আওয়ামী নেতাদের 'ওয়েট এড সি'-এর রাজনীতি শুরু হয়। ছাত্রনেতা কর্মীদের পুখই

সামান্য একটা অংশ 'জয়েট এন্ড সি' রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে অনুপ্রবেশযোগ্য কর্ম তৎপরতা শুরু করে এবং এই তৎপরতা মূলত তবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই নীতাবদ্ধ থাকে। এই কর্মতৎপরতার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বর্তমান কমুনিষ্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম।

১৫ই আগস্ট-এ শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর হত্যার সমর্থনে জ্ঞানেন উদ্ভাবন করে রাজপথে কোন মিছিল হয়নি। আবার হত্যার বিশেষেও কোন শোভা সভা, শোক মিছিল এবং প্রতিবাদ মিছিলও হয়নি।

বলা যায় শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের পিছনে প্রায় সকল সাময়িক এবং বেসাময়িক নেতৃত্ব সমর্থন ছুঁগিয়েছিল। অতীত একটা সহজেই বলা যাবে যে, নতুনই নীরবে এ হত্যা ঘেঁষে নিয়েছিল কেবলমাত্র ব্যতিক্রম কাদের সিন্দিকী জড়।

মুজিবুকের কিংবদন্তী কাদের সিন্দিকী শেখ মুজিব হত্যার প্রতিকারে '৭১-এর মুজিবুকের দ্যায় আগেরো সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করে। শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের পর আগরামী ধাঁচেও নেতৃত্ব এবং শেখ মুজিবের মন্ত্রী সবার সদন্যতাই বন্দকায় মোস্তাক আহমেদ-এর নেতৃত্বে মন্ত্রী সভা গঠন করে। বন্দকার মোস্তাক আহমেদ শেখ মুজিবের হুলাভিষিক্ত হন। বন্দকার মোস্তাক আহমেদ ছিলেন শেখ মুজিবের রহমানের মন্ত্রী সভার রাণিজামন্ত্রী। রাণিজামন্ত্রী বন্দকার মোস্তাক আহমেদের রাষ্ট্রপতি হওয়ায় সাংবিধানিক কোন বৈধতা ছিল না। বন্দকার মোস্তাকে রাষ্ট্রপতি হওয়া সর্গবিধানিকভাবে সম্পূর্ণ অবৈধ ছিল। তবুও দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি হন বন্দকার মোস্তাক আহমেদ এবং বন্দকার মোস্তাক আহমেদের নেতৃত্বে মন্ত্রী সভায় খোদাশান করেন বর্তমানে শেখ হাসিনার মন্ত্রী সভার সদস্য আবুল হাসানৌলী পিতা সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। শেখ হাসিনার আগরামী নীতি সভাপতি মন্তলির সদস্য এবং জমি আফুল মাদানসহ শেখ মুজিবের মন্ত্রী সভার অনেক মন্ত্রী।

বন্দকার মোস্তাক আহমেদের রাষ্ট্রপতি হওয়া সাংবিধানিকভাবে কোন বৈধতা না থাকা সত্ত্বেও অবৈধতার বন্দকার মুস্তাক আহমেদকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ থাকা পাঠ করান সুপ্রীম কোর্টে অব্যাহী প্রধান বিচার পতি এ. বি. আহম্মদ হোসেন।

এছাড়া মুজিবুকের দীর্ঘ নেদানী ধর্মদীর্ঘ জেনারেল এম. এ. জি ওসমানী বন্দকার মোস্তাকের সাময়িক উপদেষ্টা হন। ১৫ই আগস্ট সকাল ৯টার তৎপরতায় সেনাবাহিনী প্রধান শেখ হাসিনার নামের বর্তমান এম. সি মেজার জেনারেল শক্তিউদ্ভাহ সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে বন্দকার মোস্তাক আহমেদের অতি আনুগত্য প্রকাশ করে রেডিওতে ভাষণ দেন। এরপর আনুগত্য প্রকাশ করে

নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্বন্দরান মোস্তাফিজ আহমেদ পার্লামেন্টে স্বাগতের সভা করেন। এই সভায় যোগদান করা থেকে বিকট হাস্যরস জন্ম দ্বায়নেতা মিহক সৈয়দ নুরুল ইসলাম নুরুল নেতৃত্বে ছাত্রলীগের হাটু শোয়া করে এক ভান কর্মী ছোর চেঁচা ও কদমীর চামাথেও আওয়ামী লীগের প্রায় সকল এম. পি উক্ত সভায় যোগদান করেন।

ডাক্তার সালেহ ডি. পি মুজাহিদুল ইসলাম সেনিদ্দ (বর্তমানে কমিউনিষ্ট (সিপিবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক) ইসমত কাদির নামা, বহিউল আলম চৌধুরী (বর্তমানে সরকারী আমলা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পি. এস. মোজানির চৌধুরী)দের নেতৃত্বে মাত্র শ'সালেহ ছাত্রনেতা ও কর্মী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কর্ম অব্যবস্থা শুরু করেন, এই কর্ম অব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বান্ধব ছাত্রলীগ (মণিহারিনি) প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

৪ষ্ঠ নভেম্বরের যৌন মিছিল সকল করে জোয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা শহরে শোণন বৈঠক চলাতে লাগলো। ২য় নভেম্বর নিরপত্তা বাহিনী চলেতে অর্থাৎ ৩রা নভেম্বর প্রত্যয়ে দেশে ২য় সামরিক অভিযান ঘটলো। ৩রা নভেম্বর সকালে সোভিয়েত রাশিয়া নির্মিত বোম্বার্ক বিমান মিশ ২১ আকাশে উড়লো এবং দুই নীচ দিয়ে ঘন ঘন বহুটা নিকে লাগলো। বাংলাদেশ বেতারেও বা রেডিও বাংলাদেশের এবং টেলিভিশন সম্প্রচার সারাসিন বন্ধ পড়িল। বোম্বার্ক বিমানের নীচ দিয়ে ঘন ঘন বহুটা বেওয়া এবং রেডিও বন্ধ পাতায় দেশে যে ২য় দ্বারা সামরিক অভিযান হয়েছে এটা স্পষ্ট বুঝা গেল। এবং এটাও সুস্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই ২য় সামরিক অভিযানের অর্থ-পরাক্রমের কোন নির্দিষ্ট ফলাফল এখনও হয়নি। কোন শত্রুই এখনও নির্দিষ্ট বিজ্ঞানী হয়নি। আর এই জন্যই

বোম্বার বিমান মিশ্র ২১ বার বার নীচে ড্রাইভ দিয়ে প্রতিপক্ষকে বোমা মারার হুমকি দিচ্ছে এবং বেতার বা রেডিও বন্ধ রয়েছে। বোম্বার বিমান বোমা মারার হুমকি দিচ্ছে, কিন্তু বোমা মারছে না, এ থেকে বুঝা যাচ্ছে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা চলছে। আর সেই জন্যই যুদ্ধ বিমান আক্রমণের মহড়া দিচ্ছে কিন্তু আক্রমণ করছে না।

স্বাভাবিক টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু করলো কিন্তু অত্যাশ্চর্য সম্পর্কে কোন কিছুই বলা হলো না। ৪ঠা নভেম্বর সকাল বেলা পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী যৌন মিছিলের প্রতীতি নিয়ে শ' পাঁচেক ছাত্র জনতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রটভাগার সমাবেশ হলো। সমাবেশ ছাত্র, জনতা বিহীনভাবে সামগ্রিক অভ্যুত্থান নিয়ে আলোচনা শুরু করলো। এদের অধিকাংশেরই দ্বারা সেনাবাহিনীর নতুন প্রধান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাদানকারী মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান 'অভ্যুত্থান' করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের যোদ্ধা হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে জেনারেল জিয়ার একটা পরিচিত ছিল এবং বহনযোগ্যতা ছিল। তাই অনেকেই মনে করেছে জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বই সামগ্রিক উত্থান হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ বলল প্রিগেজিয়া খালেস খুশারুজ অভ্যুত্থান করেছেন। অভ্যুত্থান এই নেতৃত্ব কে দিয়েছেন তা পুরোপুরি নিশ্চিত না হওয়া গেলেও, একটা বিষয় নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, ১৫ই আগস্টে অভ্যুত্থান করে শেষ মুজিবকে মারা হত্যা করেছে; তারা এখন আর কর্মতাত্পর নেই। এবং তারা দেশ ত্যাগ করেছে। ইতিমধ্যে আরো কয়েকশত লোক সমাবেশে যোগ দিয়েছে। সাত আটশত লোক নিয়ে যৌন মিছিল শুরু হলো। যৌন মিছিল ধানমন্ডি ও২নং সড়কে বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবর রহমান এর স্মরণার্থে অভিযুক্ত যাত্রা করলো। পলাশির মোড়ে পুলিশ প্রথম বাধা দিল। পুলিশ বলছে, মিছিল নিষিদ্ধ আপনাতা মিছিল করছেন না। কে মিছিল নিষিদ্ধ করেছে জিজ্ঞাস করলে পুলিশ কোন উত্তর দিতে পারেনি। পুলিশ বলছে আপনাতা একটু অপেক্ষা করুন আমরা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে জেনে নেই। কিন্তু মিছিল থামলো না। মিছিল চলতে থাকলো। পুলিশও নামকাতারে হালকা পাতলা বাধা দিতে লাগলো। কিন্তু একতরফে পুলিশী বাধা বলতে যা বুঝায় তা পুলিশ মোটেও দেয়নি। আসলে পুলিশও জানতো না কারা এমন দেশের কর্মতাত্পর আছে, দেশে কি হচ্ছে পুলিশের কি করণীয়। পুলিশ অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিল। বিশেষক যৌন মিছিল বাইল দ্ব্যাবরোচীরীর মোড় পার হয়ে কল্যাণগঞ্জের দিকে যেতে থাকলে এদিকে পাহাড়ার থাকা সেনাবাহিনীর দশ বাত জন সৈন্য মিছিলের দিকে এগিয়ে এলো। সৈন্যদের মিছিলের দিকে এগিয়ে আসতে গেলে বেশ কিছু মিছিলকারী মিছিল ত্যাগ করে আশপাশে লড়ে পড়ল। সৈন্যরা মিছিলের দিকে এগিয়ে এলো ঠিকই কিন্তু মিছিলে বাধা দান বা সমর্থন কোন



কিছুই করলো না। শুধু তাকিয়ে থাকিয়ে দেখতে লাগলো। তবে সৈন্যদের তাকানোর ভিটটা বিহীন ছিল। তারা বাক্যে ঘোরেই মিছিলটাকে দেখেছে। এবং মনে হয়েছে বিজয় সামরিক অভ্যুদ্যান ও সৈন্যদের করণীয় সম্পর্কে তারাও নিশ্চিত নন। মিছিল কলকাতার প্রতিরক্ষা করার সময় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশারফ-এর মা এবং ছোট কান্ট্রি রাশেল মুশারফ (বর্তমানে শেখ হাসিনার জুনি প্রতিমন্ত্রী) মিছিলে অংশ নিলে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশারফ-এর নেতৃত্বে অভ্যুদ্যানের বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়। এখানেই জানা পেল নতুন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশারফ এর আনুগত্য বাহিনী বন্দী করেছে এবং অনতিবিলম্বে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশারফ মেজর জেনারেল পদোন্নতি নিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান হচ্ছেন। মিছিল ৩২ম ধানমন্ডি বঙ্গবন্ধু ভবনের গেটে গিয়ে বিকাশ তিনটার বিশ্ববিদ্যালয়ে জমায়েত ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি নিয়ে শেষ হয়।

দুপুর ১টা৫ দিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ভবনের সামনে থেকে যে যাত্রা স্থানে ফিরে যায়। যাত্রা আধা ঘন্টা সময়ের মধ্যে দুপুরের আহার শেষ করে পুজান ঢাকা থেকে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রওনা হয়। বিকাশ তিনটার আগেই আমরা ঢাকার ভবনের সামনে উপস্থিত হয়ে দেখি প্রায় হাজার সৈন্যের ছত্র জনতা ইতিমধ্যেই সন্মেলন হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে সমাবেশ শুরু হয়নি কিন্তু বিক্ষোভভাবে সবাই আলোচনা করছিল, এই আদাপ-আলোচনার মূল বিষয় ছিল জেলখানায় জাতীয় চার নেত্রী হত্যার। গতকাল ওরা নাভেরব শেখ মুজিব ইচ্ছাকারীরা জেল খানার অভ্যন্তরে বন্দি অবস্থায় বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতৃত্ব দানকারী জাতির তাজমুদিন আহমেদ, প্রথম রাষ্ট্রপতি (অধ্যাক্ষী) সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অবঃ) মুনসুর আলী এবং মন্ত্রীর কামরুজ্জামানকে ওসি-বহর হত্যার বহর এবং তারপরে সশস্ত্র আক্রমণ করে।

ঢাকায় সাবেক ডি. পি. বর্তমানে কমিউনিস্ট পার্টির সাদ্যরন সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ইসলাম কানির দানা সংগ্রহ ও বিক্ষিণ বক্তৃতার পর মিছিল শুরু হলো। জেলখানায় জাতীয় চার নেত্রী হত্যার বহরে মিছিলের মানুষগুলো কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। মিছিলটা পুজান ঢাকার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু মিছিলের গতি, প্রকৃতিটা এমনই হলো যে-এটা না হলো বিক্ষোভ মিছিল, না হলো মৌন মিছিল। মিছিলটা পুজান শহর দিয়ে বাজিনুটিন রোড এর নেটল জেনের (কেন্দ্রীয় কমান্ডার) দায়িত্বে দিকে বঙ্গবন্ধু দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিবাস হক হলের মাঠে এসে শেষ হলো। এখানে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম আগামী এই নাভেরব শোকসভার কর্মসূচী ঘোষণা

করে পাড়ায়-মহল্লায় মিছিল ও পথসভা করার নির্দেশ দিলেন। এর আগে বিকাশ  
এবং নিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তিন নেতার মাজারের  
সামনে জাতীয় চার নেতাকে ঢাকন দেওয়ার জন্য কবর খোঁড়া হলো। কিন্তু শেষ  
পর্যন্ত পুলিশের বাধার জন্য জাতীয় চার নেতাকে এখানে কবর দেওয়া গেল না।

আমরা মশ এপারোজন মিছিল করতে করতে পুরাতন শহরে আমাদের  
মহল্লায় ফিরে এলাম। তখন রাত ৮টা হবে। মহল্লায় এসে পরিচিত মাইকের  
দোকান থেকে মাইক এবং গেরজ থেকে রিক্সা নিয়ে মাইক বেঁধে মিছিল এবং  
পথসভা করতে লাগলাম। পথসভা ও মিছিলে জাতীয় চার নেতা হত্যার  
প্রতিবাদে আধ্যাতিক শোক সভার ঘোষণা দিতে থাকলাম। পথসভা এবং  
মিছিলে জনতা তো অংশ গ্রহণ করলই না, এমনকি খাওয়ামী লীগের নেতা  
কমীল্লাও অংশ গ্রহণ করল না। আমরা মশ এপারোজন ছাত্রনেতা-কম্বই সাড়াটি  
পুরাতন শহরের বড়টা এলাকা সফর মিছিল আর পথ সভা করতে থাকলাম।  
রাত ১১টার নিকে শাহমাজার এলাকায় মিছিল নিয়ে এসে মুজাপুর থানার পুলিশ  
রাতার দুই দিক থেকে ঘেরাও করে আমাদের বেধড়ক লাঠি পেটা করে রিক্সা  
এবং মাইক জিনিয়ে নিয়ে যায়। পুলিশের এই হামলায় গুরুতর আহত হয় ছাত্র  
ইউনিয়ন নেতা বর্তমানে সরকারি আমলা বন্দকার শওকত হোসেন (জুলিয়ান)  
এবং কবি নজরুল সরকারী কলেজের তুখোর ছাত্রনেতা শহ ও প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব  
নি,এন,পি সরকার কর্তৃক মনোনীত ৭৯ নং ওয়ার্ড চেয়ারম্যান বর্তমানে  
জাতীয়তাবাদী মল ৭৯নং ওয়ার্ড সভাপতি জননেতা মোঃ ফরিদ উদ্দিন। আমরা  
সবাই পারিয়ে গেলাম। রাত কেউই বাসস্থান থাকলাম না। কিন্তু রিক্সাওয়ালা,  
রিক্সার মালিক, মাইকওয়ালা ওরা সবাই আমার বাসায় এসে রিক্সা আর মাইক  
দাবী করে বসে বসে। পরদিন সকালে টাকা পরস্যা নিয়ে থানায় লোক পাঠান  
হলো রিক্সা আর মাইক হাভারের জন্য কিন্তু থানা পুলিশ কিছুতেই মাইক আর  
রিক্সা ছাড়লো না। ওরা নজরুল ব্রিগেডিয়ার বালেন হুশারকের নেতৃত্বে সংগঠিত  
বিক্রয় সামগ্রিক অভ্যুত্থানে কলকাতা শেখ মুজিবর রহমানের হত্যাকাণ্ডের দেশ  
থেকে শান্তি গেলেও তার নেতৃত্বে শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যা করা হলো  
এবং তিনি বহির্বিধান বহির্ভূতভাবে অধৈর্য পন্থায় দেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে বসলেন  
সেই বন্দকার মোস্তাক আহমেদ ঠিকই রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকলেন। ১৫ই  
আগস্ট সকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যা করে  
সংবিধান বহির্ভূত পন্থায় সম্পূর্ণ অধৈর্যভাবে রাষ্ট্রপতি হয়ে বসা বন্দকার মোস্তাক  
আহমেদকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ দাকা পাঠ করান বাংলাদেশ মুক্তির কোর্টের  
তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রধান বিচারপতি এ. বি. আহম্মদ হোসেন। সংবিধান বহির্ভূত  
পন্থায় রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত বন্দকার মোস্তাক আহমেদ-এর কাছে থেকে ৫ই



মার্চ ১৯৫৩-এ ত্রিগোত্রিয়ার খালেদ মুশরফকে পদোন্নতি নিয়ে মেজর জেনারেল হন এবং সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধের যোদ্ধা মেজর জেনারেল জিবাইর রহমানকে সেনাবাহিনী প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজেরই সেনাবাহিনী প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হন। বিমান বাহিনী প্রধান ও নৌ বাহিনী প্রধানগণ খালেদ মুশরফকে মেজর জেনারেল ও সেনাবাহিনী প্রধান এর স্বাভাবিক পদে নিষেধন এই ছবি প্রতিভাও প্রকাশিত হয়।

এই মার্চের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় 'ব' পাঠ্যক্রম ছাত্র-জনতা সমাবেশও হলেও নেতৃত্বের অভাবে এবং আসন্ন ছাত্রলীগের সাপোর্টের কারণে ৪ঠা মার্চের পোষিত এই মার্চের শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়নি। দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অস্পষ্টতা এবং আতঙ্ক নিয়ে বিক্ষিপ্ত কথাবার্তা আর মিছিলের চেতনা মার্চ নিয়ে এই মার্চের দিন শেষ হয়ে গেলে সত্যায় আমরা পুরাতন ঢাকায় ফিরে আসি এবং সরকারী কবি নজরুল কলেজের শহীদ সামসুল আলম ছাত্রবাসের ছাত্রদের নিয়ে ছাত্রনতা করি। পরদিন ৬ই মার্চের সকালে পুরাতন ঢাকা থেকে স্বাধীনতা আমরা নশ/এগারোজন মিছিল নিয়ে আবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবেশ হলে স্বাক্ষর মোস্তাক আহমেদকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সরিয়ে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাহাদাত মোঃ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি করা, (আওয়ামী লীগের) পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেওয়া, সামরিক আইন জারি করা এবং সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে মেজর জেনারেল খালেদ মুশরফকে প্রধান সামরিক আইন প্রচারক হওয়াসহ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত শোনা যায়। এবং এই দিনেও আমাদের মিছিল ও আলোচনার কোন আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। সবাই ছিল বিক্ষিপ্ত এবং বিক্ষিপ্ত। সত্য নাগান আমরা পুরাতন শহরে ফিরে আসি। নেতৃত্বের কোথাও কেউ নেই। সব কেমন যেন শূন্য ও ফাঁকা। দেশে আরো সামরিক বড় বড়দের কি যেন কি হতে পারে তা অনুভব করা যায়। উপলব্ধি করা যায়। কিছু পরিকার বুঝা যায় না। আওয়ামী দাতব্যগী নেতারা সব কে যে কি করছে বা কোথায় পালিয়ে গেছে তাও বুঝা যায় না। ছাত্র নেতাদের মধ্যে বহরতু শেষ মুজিবের ভাষণে শেষ শহীদ অনেকটা পাকানো গৃহবন্দী ভগেই যেন হচ্ছে। ইসলামত কাদির গামা ওতটো বুঝিও নেই, তবে কিছু করার চেতনা আছে। রবিউল আসম চৌধুরী (বর্তমান আমলা প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনার পিএন যোকারির চৌধুরী) আছেন, নব নবরই আছেন। সবচেয়ে গেল সেই এখন সব চাইতে বড় নেতা। ঢাকাসহ সারসক জিমি ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম হলেন কিছু একটা করার চেতনাবাদের মূল নেতা। ছাত্রনেতা সৈয়দ মুক কাদের সিন্ধুকীর সাথে যোগ নিয়েছেন।

আন্যায়ীকাল স্বাধীনতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা ছাত্র আমলের কোন কর্মসূচী নেই। স্বাক্ষর গভীর হালো, সেডটা দুটা আছে, ঘড়িরা নম্বর অনুযায়ী এই মার্চের পত্রিকার স্বাক্ষর হওয়া ওলির আওয়াজও শুধুই বাজতে লাগলো। স্বাক্ষর হতে লাগলো ওলির আওয়াজও শুধুই বাজতে লাগলো। ওলির আওয়াজে যেন হতে লাগলো এ যেন পটিনে মার্চ '৫১-৫৩ মার্চই এক কালো রাত। পটিনে

মার্চ '৭১-এ গাফিলতানী ছানাদার বাহিনী নিরস্ত্র দুঃস্থ বাঙালিকে নির্নিচরত তলি করে হত্যা করেছে। কিন্তু অত্যাচার তলি কামা করেছে? কেন করেছে? কার বিরুদ্ধে করেছে কিছুই বুঝা যায় না।

৭ই নভেম্বর কোর হতে না হতেই দেখা গেল সেনাবাহিনীর সিপাহীরা (জোয়ান) আকাশপতনে তলি করতে করতে প্রহর দিতে পারে হেঁটে, পাড়িতে চড়ে যে যেভাবে বুশি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর এই সেনা সিপাহীদের সঙ্গে হস্তক্ষেপত ভাবে জনগণের একটা অংশ যোগ দিয়েছে। সিপাহী জনতা, বাঙালি মিছিল করতে আর আকাশের দিকে তলি ফুড়ছে, প্রোগান দিচ্ছে। সিপাহী জনতার এই মিছিল থেকে মানা ধরনের প্রোগান দিতে গোল গেল। কোন মিছিল থেকে প্রোগান আসতো মোস্তাক-জিয়া জিন্দাবাদ, মুসলিম বাহো জিন্দাবাদ। কোন মিছিল থেকে প্রোগান উঠলো কর্নেল তাহের জিন্দাবাদ, তাহের-জিয়া ছাই তাই। গণ বাহিনী জিন্দাবাদ, সিপাহী জনতা তাই তাই ইত্যাদি মানা ধরনের প্রোগান দিতে গোল গেল সিপাহী জনতার মিছিল থেকে। এই সিপাহী জনতার সামনে কোন সুন্দর লক্ষ বা পরিষ্কার কোন ধারণা যে ছিল না তা বোঝা যাচ্ছিল। এবং এই সিপাহী জনতার বিদ্রোহ কোন একক নেতৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ যে ছিল না তাও বোঝা যাচ্ছিল। তবে এই সিপাহী জনতার বিদ্রোহ যে আওয়ামী বাকশালী এবং শেখ মুজিব-এর অনুসারীদের বিরুদ্ধে তা নিশ্চিত ছিল।

এ মিছিলকারী সিপাহী জনতা আওয়ামী বাকশালী বা শেখ মুজিব-এর অনুসারীদের দেখামাত্র যে মেতে ফেলত তাতে কোনটই সন্দেহ ছিল না।

## ভারতে পলায়ন

৭ই নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিদ্রোহ ছিল শেখ মুজিবর ব্রহ্মান, আওয়ামী বাকশালী ও ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সাধারণ সিপাহী-জনতা এই বিদ্রোহ বাহিনীতার যোনক জিয়াউর রহমানকেই নেতা মনে করেছে। '৭৫-বালের ১৫ই আগস্টে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী বাকশালীরা বা শেখ মুজিবের অনুসারীরা কে যে কোথায় পাড়ল হতে গেল তার কোন ইনিস পাওয়া গেল না। অথবা শেখ মুজিবের সহপাঠী বা আওয়ামী বাকশালী নেতাদের একটা বিরাট অংশ মুজিব হত্যাকাণ্ডীদের সাথে হাত মিলালো এবং হত্যাকাণ্ডীদের নেতা স্বাক্ষর মোস্তাক আহমেদের নেতৃত্বে সরকার গঠন করল। আর আমরা এটি কয়েক স্বাক্ষরিত-করী স্বাক্ষরিত ও স্বাক্ষরিত ছানাদার বা মুজিব হত্যার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করছিলাম, তারা '৭৫-এর ৭ই নভেম্বরের বিদ্রোহ সিপাহী জনতার বিদ্রোহ দেখে করে পাড়িতা গেল তারা সবাই।

ছাত্রনেতা এবিউল আলম চৌধুরী বর্তমানে সরকারী আমলা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পি. এস. মুজিবুর চৌধুরী-এর নেতৃত্বে আমরা দশজন ছাত্রনেতা-কর্মী কুমিল্লায় লাকসাম-কসবা গিয়ে পাণ্ডিত্য ভাওতেও ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় গিয়ে উঠলাম। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় আগরতলা ছিল ২নং সেক্টর। অন্যত্র যাত্রা ২নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম তাদের কাছে আগরতলা ছিল পূর্ব পরিচিত শহর। এই আগরতলা শহরের এম. বি. বি (মহারাজা বীর কীৰ্ত্তন) কলেজের ডি. পি. সঙ্কট পালের থাকিতে আমরা সবাই উঠলাম। সন্ধ্যা পালের কাছে থেকে কলসাম শেখ মুজিবুরের আমলে আওয়ামী লীগের কুটীয়া/চতুর্থ সার্কেল নেতা, পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা এবং শেখ হাসিনার আমলে কিছুই না এস. এম. ইউনুস আগরতলা থেকে কলকাতায় চলে গেছেন এবং সাপ্তাহার সময় বেলে গেছেন তিনি কিছুদিনের মধ্যেই আবার আগরতলায় আসবেন।

অন্যদিকে সাবেক ছাত্রনুর জিপি বর্তমানে কমিউনিষ্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম; সাবেক মুক্তির বাহিনী নেতা আওয়ামী যুব লীগের সাবেক চেয়ারম্যান বর্তমানে গণ ফোরামের কেন্দ্রীয় নেতা মোস্তাফা মোহসীন খট্ট, সাবেক ছাত্রনেতা পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি, বর্তমানে জাতীয় পার্টির প্রাক্তন এম. পি শাহ মোঃ আবু জাকের, সাবেক ছাত্রনেতা ইসলামত কামির গামা, শেখ মুজিবুর মন্ত্রী মোঃ আশাফের ছেলে সাবেক ছাত্রনেতা রুমি, কবি নজরুল সরকারী কলেজের তুখোর ছাত্রনেতা সব ও প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব বি.এন.পি সরকার কর্তৃক হত্যাকার ৭৯ নং ওয়ার্ড চেয়ারম্যান বর্তমানে জাতীয়তাবাদী দল ৭৯নং ওয়ার্ড সভাপতি ছাত্রনেতা মোঃ ফরিদ উদ্দিন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথা প্রতিদ্বন্দ্বী আবু সাঈদ, রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ এস. এ. মামুনওসহ শত্রুনেতা-কর্মী পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলকাতায় পালিয়ে যায়। বলা যায়, যা মুখে শুনে আমরা দেশ জাগে কবে ভারতে পালিয়ে যাই। যা ছিল নাবালকযুগের রাজনৈতিক অনতিব্রজ। আমার ধারণা দেশজাগে করে ভারত যাত্রা আমাদের সংস্থা হাজার দিনেওও বেশি হবে না। তবে দেশ থেকে পালিয়ে ভারতের বিভিন্ন মাঠেও আগ্রহ নেওয়া হাজার দিনের নেতা-কর্মীর উদ্দেশ্য ছিল একমুখিই। আর সে উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারত সরকারের কাছে থেকে সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বড়ো রাজনৈতিক ও সামরিক অবশেষকে উদ্বাসন। কিছু ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ভারতে আমাদের সহায্য করে ছাত্র ছাত্র, পাত্রই দোনি।

(১) গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু কলেজ ছাত্র সংসদ এবং জি, এস, পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা গোলাম মোস্তাফা খান মিরাজ (২) ছাত্রলীগ ও মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের কেন্দ্রীয় তাত্ত্বিক নেতা বর্তমানে অজ্ঞানী ক্যাঙ্ক -এর কর্মকর্তা ও নেতা মোহারক হোসেন সেলিম, (৩) টাঙ্গাইলের ছাত্রনেতা বর্তমানে ব্যবসায়ী বাবর আলী (৪) টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রনেতা বর্তমানে এ্যাডভোকেট সিয়াকত হোসেন আহাঙ্গির (৫) যুবনেতা, নজিবুর রহমান নিহার (৬) ছাত্রনেতা বর্তমানে ব্যবসায়ী নওশের আলি মসু (৭) যুবকর্মী বর্তমানে জনসেতার নাগরীক প্রোভির্সর বিশ্বাস (৮) সাবেক ছাত্রনেতা বর্তমানে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা গোপালগঞ্জের আব্দুর রউফ সিকদার (৯) সাবেক, যুবনেতা দীর্ঘদিন ধরবে থেকে বিদেশীনীকে বিয়ে করে, ঘর সংসার করে, দুই সন্তান জন্ম দিয়ে অবশেষে বিদেশী কালজারের সাথে মানিয়ে নিতে না পেরে বিদেশী বন্ধু এবং সন্তানদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দেশে ফিরে বর্তমানে স্বাবস্থায় রত গ্রীন রোড জামিল বাগানের এস. এ. কাইয়ুম বসত এবং (১০) আমি যখন বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সশ্রীক অব্যাহিত ঘোষিত।

আমরা এই নশজন এবং আমাদের নেতৃদ্বন্দ্বমানকারী রবিউল আলম চৌধুরী ওরফে মোক্তাদির চৌধুরীসহ মোট এগারোজন আগরতলা এম বি বি কলেজের ডি পি সত্তা পালের বাড়ির সাথে ময়লা নিকাশনের ড্রেনের উপর পুরনো টিন দিয়ে একটি চাশা বানিয়ে তার নিচে একটি বড় চৌকি ফেলে থাকতে লাগলাম। অবশ্য রবিউল আলম চৌধুরী ওরফে মোক্তাদির চৌধুরী সত্তা পালের সঙ্গে ওদের ঘরে ঘুমাতো। আর নশজন ড্রেনের উপর ভাঙ্গা টিনের চালার নিচে রাখা ঐ এক চৌকিতেই ঘুমাতাম। একজনের পাশে একজন করে নয়জন পাশাপাশি ঘুমাতো। আমি আমি ঘুমাতাম সকলের পায়ের ধারে। কারণ পাশাপাশি শশমানের জায়গা ঐ চৌকিতে হতো না। তাই আমি সকলের পায়ের ধারে যে জায়গা সেই জায়গায় ঘুমাতাম। ঘুমাতো না, কোন বকমে ঘরে থাকত। একে বো প্রচণ্ড মশা, তার উপর আমার চতুর দিক শোলা, তারপর আবার ড্রেনের উপর, তাও আমার মশারী ছাড়া। মশারী সেই। এখানে দিনের বেলাতেই মশা ধরতো। এই অবস্থায় ঘুমাতোর তো কোন প্রশ্নই তুলে না। অবশ্য আমাদের ঘুমাতোর জন্য দুই তিনটা কবল দেওয়া হয়েছিল। সবাই একটা কবল বিছিয়ে আর একটি কবল দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত মুড়ে ফেলে থাকতো। আমি কবল না পেয়ে চুপি দিয়ে শরীর থেকে সার্টির ভিতর মুক্ত অঙ্গা চুকিয়ে রাখতাম। আমি আর মোহারক হোসেন সেলিম অধিকাংশ রাত ঘর করে আর মশা মেলে কাটিয়ে নিতাম। মশা মেলে দুই বহু দিলে আমার এগতাম কত হাজার কত শ'মশা মারলাম। এই কারে রাত



পারত করে দিয়ে নকশা পাঠের দার কর পরতান । যতখানি বেশী সম্ভব দুখিয়ে দুখিয়ে পার করে নিতাম । কারণ আমাদের কপালে নকশার নাপা পাওয়া ছিল না । তাই হোজা গাখার মতো হয়ে হয়েই বেশী পার করে দিতে গাইতাম । ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেস নেতাজীরা রানু ওর নুপুবেব কাগজার জন্য ভারতীয় এক টাকা মশ পরমা এবং ভারত কাগজার জন্য এক টাকা, মোট ত্রিভিন্ন দুখোয়া কাগজার জন্য দুই টাকা মশ পরমা দিতেন, তাও আমাও কটীন গ্রাফিক নিয়মিত দিতেন না । সংগ্রহে দু'একদিন বা তাতও বেশি দিন তো বান হোজাই ।

অর্থাৎ কখনও সংগ্রহে কাগজারকর, আমাও কখনও সংগ্রহের মধ্যে মধ্যে দু'তিন দিন কংগ্রেস নেতাজীরা রানু ওর টাকা দিতেন না । আমাদেরকে টাকা দেওয়ার জন্য রানু ওর কাগজারকর অভাব ছিল না । তিনি টাকা খোপাত করতে পারতেন না, তাই আমাদের দিতে পারতেন না । আর খবর টাকা দিতে পারতেন না, তখন আমাদের না খেতে থাকা ছাড়া বিকল্প কিছু ছিল না । রানু ওর রবিউল আলম চৌধুরী ওরফে মোকামির চৌধুরীর কাছে টাকা দিতেন । রবিউল দিতেন শব্দক খোজি-এ এবং শব্দক খোজি-এ বসে ছিল দুখুতে একটিনা মশ পরমা, ভারত এক টাকার বেশি কাটকে খেতে নেওয়া করে না । দুখুতে এক টাকার সাত মশ পরমাও তালি । কাটা মরিচ, পিয়ার ও চাল ত্রি । রাতে নকশই পরমাও সাত মশ পরমাও তালি । এই ছিল আমাদের বয়স্ক । আমরা দুখুতে এক টাকার সাত খেতে হোটেলেও আশ খেতে মশ পরমা খেতে নিয়ে ঐ মশ পরমা দিতে বিড়ি কিনে খেতাম । কাপড়চোপড় আমরা এখনই গিটিনাট মে, কেউ ছিন্তাও করতে পারতো না যে আমাদের পেটে আশ ঢের, পকেটে পরমা নেই ।

আমরা শীতের কথা চিন্তা করে আমি আমাও তবল বেইজ সুটটা বানা থেকে পকেটে নিয়ে নিয়েছিলাম । আমি ববল, ববলবেইজ সুটটা পড়ে আপসতলার রাস্তার বের হতাম তখন মাছা আশবতলায় নর-নারী আমাও দিকে মানে আমাও ববলবেইজ সুটের দিকে তাকিয়ে থাকতো । সারা আগরতলা শহরে আমাও ছাড়া বিজীয় কোন ববলবেইজ সুট ছিল না । সেজেগে তাকিয়ে থাকতো আতবীয়ভাবে এবং হোলেগে তাকিয়ে ইর্ষান্বিতভাবে । কতজন জিজ্ঞাস করছে এটা কোথা থেকে নানিয়েছি? বলতে হয়েছে কলকাতা থেকে নানিয়েছি । কারণ আমরা যে ব্যক্তাদেশ থেকে এসেছি এটা ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস নেতাজীরা নির্দেশে গোপন করতে হয়েছে । শুধু তাই নয়, আমরা যে হুনলমান এটাও গোপন করতে হয়েছে । আমাদের গতিয় গোপন করে মিথো পবিত্রত থাকতে হয়েছে । বলতে হতো আমরা কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি । এবং আমরা সকলেই হিন্দু । আমাদের প্রত্যেকেরই একটা করে হিন্দু নাম ছিল । এস, এন, ইউনুসের নাম ছিল সহজলা, রবিউল আলম চৌধুরী ওরফে মোকামির চৌধুরীর নাম ছিল রবিজায় চৌধুরী ওরফে রবিনা, আমাও নাম ছিল অনর দার ওর ওরফে অনর দা ।



[illegible]

পাশি নিয়ে আমাদের হাত এসে থান্ডা ধরে নিয়ে গেল। তৃতীয় বয়স বলতি করে কাত আর মাটি নিয়ে আমাদের সামনে এসে বলতি থেকে মাটি মেলে আমাদের খান্ডাও দেখে ভাত নিয়ে দাবি জম্মি দান্দান্দুর ঠিক, এই পাচনা কই? আমি বললাম বিনিদা (বিকটন আলম জৌমুরী ওকফে মোতাপিত জৌমুরী) নিয়ে আসতেছে। দান্দান্দুর হাত নিয়ে ইশারা করলো, বড় চলে গেল। নব কটিমার কাছে। আমরা দুই বন্ধু খানি থান্ডা সামনে নিয়ে বসে আছি। সবাই কাছে। আমরা চেয়ে চেয়ে দেখছি, ভাত আবার সামনে খানি থান্ডা নিয়ে। এইভাবে কতকাল ছিলো জানি না। আমরা তো জম্মি বনি দা আসলে না, ততখবরও বনি দা এসেছে আসছে না কেন? চলতো গিয়ে দেখি-বলতে বলতে এক সময় বুজনে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলাম। তখন দুপুর বেলা। আমরা যেখানে থাকি সেই পাচনা এক পাড়ীতে ভেতোরতখন হচ্ছে। জিজ্ঞাস করলাম, দান্দা এখানে কি হবে?

আমাদের উত্তর ছিলো সত্যায় কীর্তন হবে।

তখন আমরা তো মহাখুশি। কীর্তন হবে। দানে কীর্তনের প্রসাদ হিসেবে নিজস্বই কিছুটা খাওয়াবে। বেজায় আনন্দ নিয়ে দুজনে ধরে বেড়াচ্ছি। কখন নক্সা হবে, কখন কীর্তন হবে, কখন আমরা খেতুরী খাব। বুজনে যুক্তি করছি, আমরা আগে খান ডারলার অন্য বন্ধুদের কথা দি। বইলে আবার কোন ভেজান বেধে যায়। বনি দা আবার বনি কীর্তনে আসা, কিছুটা খাওয়া আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করে। তাই ঠিক করলাম আমাদের খাওয়ার আগে কটকে জানাবই না।

সত্যায় আগেই আমরা দুই বন্ধু এসে হাজির হলাম। তখনও কেউ আসেনি। বাড়ির বাইরের লোকদের মধ্যে আমরাই দ্বারা আসে এসেছি। বাড়ির গৃহকর্তা ইশারা সামনে বিছানা ছোপলার বসতে বললেন। আমরা বসে পড়লাম। আমরা কোন কথা বলছি না। কীর্তন শুরু হলো। হাত লাগে, হাত লাগে, হাত কুন্ড, হ...রে হ...বে। কীর্তন শেষে গৃহকর্তা বা আমাদের বিশেষ বন্ধু সহকারে প্রসাদ দানে কিছুটা খাওয়ালেন। আমরা খুব খেলাম। হাত গিলে কটকই খেলাম, বিশেষ করলাম না। যে বন্ধু করে কটকটেন মনে মনে তার খেলায়, খানি টের পায়ে আমরা দুসকমান, তাহলে আর কেনে প্রাণ থাকবে না। সেইটাও বাক্য কিসা লম্বা, সবাইতে প্রকটী জিলায়। পরে কি মরি করে দৌড়ে গেল সবাই। পরদিন দুপুরে পুস্তকপাঠে গেলাম চান করতে, চান মানে গোসল। আমরা তো সবাই হিন্দু তাই গোয়ালখো চান করতে হচ্ছে, পানিকে জল খলতে হচ্ছে। এর কোন ভুল ভাবি হবে সর্বনাশ, উপায় থাকবে না। খান ইখান পুস্তক, পুস্তক পানে কোন আদেদ সেই গৃহকর্তা। আমাদের মতো বিবেকস করলেন, পুস্তকাল প্রত্যয় খেতেছিলো।

আমি বললাম, জিঁ খেয়েছি।

সান! বৃক পৃথকভাবে চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। ব্যাং কয়েক আমাদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর দ্রুত চলে গেলেন। আমি ভয় পেলাম। মনে মনে বুঝতে লাগলাম কি ক্রটি হলো। কিন্তু কোন ক্রটিই খুঁজে পেলাম না। আমরা তাকাতাড়ি চলে এলাম। ঐ ব্যক্ত্যই আর পেলাম না। কাউকে কিছু বললামও না। আমাদের মধ্যে যে সত্যিকার হিন্দু বন্ধু ছিল জ্যোতিষার থেকে একদিন ঘটনাটা বলার জ্যোতিষ্য বললো, খেঁচ পেছিন, দূর পড়ে গিয়েছিলি তোরা হিন্দু না।

কি ভাবে?

ঐ যে জিঁ খেয়েছি বলেছিল।

আমলে কি বলতে হবে?

বলতে হবে আজ খেয়েছি। জিঁ বন্ধ থাকবে না। জিঁর ফলে আজ বলতে হবে। জিঁ মুসলমানরা বলে।

## বাংলা সিদ্ধিকীর কাছে যাওয়া

১৫ই ফেব্রুয়ারী '৭৬, রাতে ত্রিপুরা রাজ্যের ঝংহেল সেক্রেটারী রাধু তত্ত্ব এসে বললেন, আগামীকাল সকালে কামের সিদ্ধিকীর কাছে যাওয়ায় জন্য আমজা চৈরী হও।

তবে আমরা ভোঁ মন্থা আননিত। যাক জাহাঙ্গীর এই কর্মহীন ক্ষুধার্ত জীবন থেকে বাঁচাল। রাধু তত্ত্ব রাধু আমাদের হাতে আগবতলা। দু' কর্মহীন কামের কলটি টিকিট এবং ত্রিশটি গ্রাডমিন (বসি বন্ধ হওয়ার) টিকিট নিয়ে। আমরা সবাই হতভাক হয়ে বলে উঠলাম, ত্রিশটি গ্রাডমিন।

রাধু রাধু বললেন, নোকানে আর ছিল না তাই বেশি দিতে পারি নাই, জেমজ সকালে যাওয়ার সময় আরে কিছু গ্রাডমিন নিয়ে নিও।

কথা শুনে আমরা সবাই হেসে নিয়ে বললাম, এতো গ্রাডমিন টিকিট নিয়ে কি হবে? রাধু তত্ত্ব হেসে হেসে বললেন, কাছে এক কাছে আগবে।

তারপর আমাদের দুই হাজার টাকা নিয়ে বললেন, বুঝে চোখেচোখে খরচ করবে, মনে রাখবে কুড়িয়ে গেলে আর পাবে না।

সকালের কামের সিদ্ধিকীর কাছে যাওয়ার জন্য সম্পর্ক বললেন, আগের ধর্ম নগর রেলওয়ে অফিস। সেখান থেকে ট্রেন করে আসাম-রাজ্যের প্রান্তিক পোহটি হয়ে ধুবড়ী, তারপর বাসে এবং বেটে মহাবল্লভ বি, এস, এক (বর্তমানে সিদ্ধিকীর কোর্স) কাম্পে যেতে হবে। এবং সেখান থেকে বি, এস, এক আমাদেরকে কামের সিদ্ধিকী দাঁত উল্লেখ-এর কাছে পৌঁছে দেবে।

পর্বদিন সকাল ৭টার আগরতলা টু ধর্মনগর বাসে উঠে বসলাম। ঠিক কীটাম কীটাম ৭-৩০মিঃ বাল ধর্ম নগরের উদ্দেশ্য ছেড়ে দিল। বাসের সুপার আইজার বললো, আপনারা সকলেই বমিও টেনলিট এ্যাজেমিন খেয়ে নিন। কারো দরকার হলে আমাদের কাছ থেকে টেনলিট নিতে পারেন।

বাস চমকে বকু করলো। মিনিট বিশেকের মধ্যেই আমাদের বাস উঠু পাহাড় উঠতে লাগলো। কি অল্প প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। চতুর্দিকে শুধু পাড় মনোরম সবুজের সন্ধ্যায়ে। উপরে পরিষ্কার নীল আকাশ। পৃথিবী যেন নীল আর সবুজ এই দু'রঙ এ বিভক্ত। উপরে নীল আকাশ, তারই নিচে পাড় সবুজ পৃথিবী। মনোহর পাড় সবুজের ভিতর দিয়ে আমাদের বাসটি চরিত্র মতো ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের উপর উঠে বাসে। আবার ঘুরতে ঘুরতে নিচে নেমে যায়। এইভাবে এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে বাস যায়। ইতিমধ্যেই বাসের মহিলা যাত্রীদের বমি শুরু হয়ে গেছে। সেই মাঝে কিছু পুরুষ স্ত্রীও বমি করা শুরু করেছে। বাসের ড্রাইভার ঘুরতে ঘুরতে আমাদের মধ্যেই মহিলা যাত্রী সকলে বমি করে ফুটি। মহিলাদের গায়েও কাপড় জোপড় বেশামাল। পুরুষ নরীয়া প্রাণপন চেঁচা করেও মহিলাদের কাপড় গায়ে রাখতে পারছে না। এরই মধ্যে পুরুষ যাত্রীদের প্রায় অর্ধেক বমিতে সামিল হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের কয়েক জনও আছে। এ্যাজেমিন টেনলিট খাচ্ছে আর বমি করছে। এতজন পুরুষেরা শাড়ীপড়া মহিলাদের কাপড় সামলাবার দুখা চেঁচা করেছে। আর এমন কে কারো সামলায়। চাচা আপন প্রশ্ন বাচা। নরীয়াদেরকর মধ্যে আমি আর টাঙ্গাইলের বাবর অলী। ছাড়া বাসের মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে সকল যাত্রীই বমি করে ফুটি। কাপড় জোপড় বেশামাল মহিলাদের নিতে ডাকিয়ে দেখা ছেদ ঘুরে থাক, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে থাকা মহিলায় নিকট ডাকবোর কেউ নেই, তাবো সামর্থ নেই। আমার অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ।

চতুর্দিকের গায়েও পাড় সবুজ বকু আর আকাশের নীল ঝড় যে কত কীড়ানায়ক তা অপরিবর্তন। টু ধর্মনগর এই রাস্তায় যে ছাড়নি সে কখনই বুঝবে না। বকি দুই পর্ব পাহাড়ের একটা চপড়া প্রকার মাঠের মতো জটিল বাসটি খোদে খেল। বাবর অলী আর আমি বাল থেকে নেমে এলাম। একদিকে সেই কীড়ানায়ক পাড় সবুজ আর নীল ছাড়া অন্য কোন রঙ নেই। নেই অন্য কোন কিছু। বসের দুখার ডাইনার কানাকালন, একদল অন্ন্য বকি চের।

বাস থামতে আর এক দুই মিনিট দেরী হলই আমিও বমি করে ফিলাম। সুপার আইজার বললো, ছাড়াছাড়ি এ্যাজেমিন টেনলিট খেয়ে নিন, বমি শুরু



হয়ে গেলে আর খেয়ে লাভ হবে না। আমরা চুট করে এক সঙ্গে দুটো করে এ্যাডোখিন খেয়ে নিলাম। সুপার জাইজারকে জিজ্ঞাস করলাম, আপনারদের বমি হয় না?

উত্তরে বললো প্রথম প্রথম হতো এখন হয় না। প্রতিদিন মাওয়া আসা করি তো সঙ্গে গেছে, তাছাড়া আমরা লাভ থেকেই টেনলেট খেতে থাকি। রাতে দুটো খাই, সকালে খালি পেটে দুটো, নাক্সর পর দুটো খাই, তারপর বাসে উঠি।

আমি আর বাবর আলী ঘাসের উপর টেনটান হয়ে তরো পড়ি। লাসের জনাবা যাত্রীরাও হয়ে পড়ে। আধা ঘন্টা পড়ে বাসের চালক যাত্রীদের লাসে উঠার জন্য হর্ষ বাজাতে থাকে। আমরা সবাই বাসে উঠে পড়ি। বাস চলতে থাকে। ঘন্টা তিনেক পর ধর্মনগর এসে বাস থামলো। আমরা বাস থেকে নেমে ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশনে গিয়ে গোধাটি হয়ে দুবরী বাওয়ার টিকিট কাটলাম। ধর্মনগর রেলওয়ে জংশন ডাকার কমলাপুর রেলস্টেশনের চাইতেও বেশ বড়। ত্রিপুরা রাষ্ট্রের সাথে কলকাতাসহ সমস্ত ভারতের এটাই হচ্ছে স্থলপথে একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা। স্টেশনে লুটি বিক্রি হচ্ছিল। আমার দুবই লুটি (পুরী) খেতে ইচ্ছে করছিল। নজিবর রহমান নিহার (বর্তমানে পরলোকগামী)। রংপুরের কুড়িগ্রাম—এ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে আমাদের অষ্টাং জনের এক সখুখ যুদ্ধে আমাদের চৌদ্ধ জন নিহত হয়। এই নিহতদের মধ্যে নজিবর রহমান নিহার (একজন) এর কাছে রবিউল আলম চৌধুরী (বর্তমানে সরকারী আমলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পি.এস. মোক্তারির চৌধুরী) আমাদের সরকারি টাকা একসঙ্গে দিচ্ছিলেন। আমি নজিবর রহমান নিহারের কাছে লুটি (পুরী) বাওয়ার জন্য টাকা চাই। কিন্তু নিহার আমাকে টাকা নই, কল্যা মানে না বলে বিম্বন করে। আমি অনেক বলি, অনেক সার বোঝাবার চেষ্টা করি যে আমার লুটি (পুরী) খেতে দুবই মন চলেছে। আমি এও বলি রাতেও খাবারের পরিবারে আমি লুটি বান, আমাকে দুই টাকা দেওয়া হোক। কিন্তু কিছুতেই নজিবর রহমান নিহার আমাকে লুটি বাওয়ার জন্য দুই টাকা দেয়নি। আমার আকণ্ঠ এই বিশ বাইশ বছর পরও মনে হয় নিহার আমাকে লুটি বাওয়ার জন্য টাকা না দিতে বাড়ারাজি করেছে। অন্যায় করেছে। মোহাম্মদ একই নাম দিন যায় কথা থাকে। আমরা সকলে ট্রেনে উঠলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল। ট্রেন একসময় অসোমের রাজধানী গৌহাটি স্টেশনে থামলো। আমরা ট্রেনে কয়েক মনমুগ্ধকর মনোহর পাহাড়িয়া শহর গৌহাটিকে দেখলাম। সৌন্দর্যের অপূর্ণ গীলান্য ভরপুর পাহাড়িয়া গৌহাটি শহর। দেশে মনে হয় থেকে ফাই। গৌহাটি স্টেশন থেকে ট্রেন পাণ্ডিগ্রে আমরা দুবরীর ট্রেন-এ



উঠলাম। তারাতের ত্রিপুরা রাজ্য পাকি নিয়ে, আসাম রাজ্যের পুরো জেলপল জটিলের করে আমরা দুখরী এসে ঐন থেকে নেমে বলে করে খুব সম্ভবত বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরতীর আশেপাশে থাকে আসলাম। ইজিউন জটিল নৌকায় বিশাল চকড়া এই নদী পার হয়ে তারতের মেঘালয় রাজ্যে প্রবেশ করলাম। তারপর মেঘালয়ের শহরভিত্তি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকলাম, সন্ধ্যা পড়িয়ে তার নেমে এসে। সেই দুপুর থেকে হাঁটতে শুরু করেছি, এখন রাতি কিরহর। জায় বিদগ্ন কুখার্ত সেই আর চলতে চায় না। কিছু না চলে উপায় কি? খুটখুটে অন্ধকার, মাঝে মাঝে জঙ্গলের ঘাঁক-জবুর জ্বল জ্বলে চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। এর মধ্যেই আমরা দশজন ভরল। একই উদ্দেশ্যে অস্বাভাবিক চলছি। আমরা কিছুকাল একত্রেই অন্ধকারে ছায়ায় মতো মনে হলো ঐটা বি, এস, এক ক্যাম্প হতে পারে। উচ্চস্বরে চক্কা গলায় জিজ্ঞেস করলাম— এ জাইয়া, ইয়ে বি, এস, এক ক্যাম্প হ্যাং?

কলতে কলতে আর একটু এগুতেই “হোল্ড হ্যান্ডস” বলে বি, এস, এক লেট্রি থেকে উঠলো। আমরা সবাই হাত উঠে করে পাড়িয়ে রইলাম। তিন-চারজন বি, এস, এক আমাদের দিকে টর্ক মেয়ে হাতে করে নিয়ে এগিয়ে এলো। তারা এসে জিজ্ঞেস করলো, তুমি লোক কোন হ্যাং?

আমরা বললাম, হাম লোককো ত্রিপুরা বা কয়েকস সেজেটোরী রাধু চক্কা নে মহেন্দ্রগঞ্জ বি, এস, এক ক্যাম্পমে জানেকা দিয়ে হেজা হ্যাং।

আরো পাঁচ সাত জন বি, এস, এক এসে আমাদের দিকে বেলে বললো, হুত নামাইতে।

আমরা হুত নামালাম। একজন বি, এস, এক “হুম লোক ইয়া ঠেরো হুম জায়া হ্যাং” বলে ক্যাম্পের ভিতরে চলে গেল। আমরা বললাম, হুম লোক ইয়ার নামে হেজা হ্যাং?

বি, এস, এক বললো, ব্যাট বজাটে।

আমরা মাটিতে বলে পড়লাম। প্রথমে একটু হাতের উপর তর দিয়ে বললাম, তারপর মাটিতে করে পড়লাম। সেদেখ প্রাণ্ডিত খুনির পড়লাম। কতকখ খুনির ছিলান জাবি না। বি, এস, এক এর-জাকো ঘুম ভাঙ্গলো। তারপর চক্কা গাছদার আমাদের ক্যাম্পের ভিতর দিয়ে গেলে একজন ক্যাপ্টেন বা মেজর আমাদের সাথে তলা বললো। তারক আমরা বিস্ময়ভিত্ত বললাম এবং আমাদের থেকে নেওয়া ৩ বিট্রান নিষ্ঠ দেওরতে কুসোম দেওয়া জন্ম আরেমন করলাম। তিনি দশ জন বি, এস, এক নিয়ে বললেন, উনলোককা সাথে গাইয়।

বি, এস, এক-এর সাথে আমরা আবার হুটিকে শুরু করলাম। সন্ধ্যা শেষ হলো আমাদের হুটা শেষ হলো না। পূর্বাকাশ রহিন করে সূর্য উঠলো। আমরা চলতেই থাকলাম। পাঁচ ঘণ্টা মাইল দূর আর একটা বি, এস, এক ক্যাম্পে এসে আমাদেরকে বুকিয়ে দিলে নতুন বি, এস, এক দল আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে হুটতে শুরু করলো। আমরা তাদের কাছেও খাওয়ার আবেদন করলাম। কিন্তু কোন ফল হলো না। বেলা বারোটার দিকে অন্য একটা ক্যাম্পে আমাদের এনে দুটা কুটি আর দুটো ডাল খাওয়ানো হলো। পেটে প্রচণ্ড খিদে মুহুর্তের মধ্যে কুটি শেষ হয়ে গেল। আমাদের খাওয়ার জন্য আধা ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছিল। আধা ঘণ্টা পর আবার আমাদের নিয়ে বি, এস, এক হুটা শুরু করলো। একটানা পর একটা ক্যাম্প আর মধ্য রাস্তার মাধ্যমে আমরা হুটিতেই লাগলাম। এই ভাবে দুই দিন দুই রাত এক লাগারে বিরামহীন হেঁটে আমরা মহেন্দ্রগঞ্জ বি, এস, এক ক্যাম্পে পৌঁছলাম। এখানে বি, এস, এক-এর একজন প্রিন্সিপ্যাল আমাদের পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাত্ত জিজ্ঞাসাবাদ করে।

২০শে ফেব্রুয়ারী বিকেলে আমাদের মনে হলো আজ রাত বারোটার পরই তো একুশে ফেব্রুয়ারী, মহান শহীদ দিবস। সিদ্ধান্ত নিলাম শহীদ দিবস উদযাপন করায়। ছাটি টিন (তৈল বা হুটির টিন) আর গায়ের চাদর নিয়ে মহেন্দ্রগঞ্জ বি, এস, এক ক্যাম্পের মাঠে আমরা তৈরি করলাম অস্থায়ী কৃত্রিম শহীদ মিনার। রাত বারোটা এক মিনিটে (১) গোলাম মোস্তফা খান মিররাক, (২) মোবারক হোসেন সেলিম (৩) আব্দুর রউফ সিকদার (৪) এস, এ কন্ট্রিফর্ম বসক (৫) নজিরুর রহমান নিহার, (৬) নওশের আলী নসু (৭) বাবর আলী (৮) নিয়াকত হোসেন আহম্মির (৯) জ্যোতির্ময় বিশ্বাস এবং (১০) মতিজ্জুর রহমান রেট্টু আমরা এই দশ জন লাইন ধরে আব্দুল গাফফার চৌধুরী রচিত, শহীদ আলতাক মাহমুদ সুবারোগিত বিদ্যাক ঐতিহাসিক জমর গান “আমার ভাইয়ের সঙ্গে বঙ্গোশো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি তি ভূমিতে পারি” গাইতে গাইতে মাঠ ঘনকণ করে আমাদের তৈরি শহীদ মিনারে পুষ্প অর্পণ করি। মহেন্দ্রগঞ্জ বি, এস, এক ক্যাম্পের হারা সকল সদস্য গভীর কৌতূহল আর আগ্রহ নিয়ে নাকিচো প্রস্তাব দিয়ে এ দৃশ্য অবলোকন করেছে।

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তর-এর পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকার মাহাবুবুর রহমান মাহাবুব মাহেন্দ্রগঞ্জ বি, এস, এক ক্যাম্পে প্রথম আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দিন দশেক পর আমাদেরকে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর বেড়ছে গড়ে ওঠা জাতীয় মুক্তি বাহিনীর বেড কোয়ার্টার চান্দুতুইতে নেওয়া হয়। পাহাড়ীয়া জমলের

চান্দুড়ই নাগরত ফুলে দুই পাখীকেই মাঝখানে, যেখানে মিলে খুঁই দেখা যাত না, আকাশও দেখা যায় না, জামলেও ছিটখ এমনি একটি ফুলে খেদকুটো দিয়ে কোন চক্রেই কানোনে ঘরে আশ্বাসের থাকার ব্যবস্থা হলো।

আমি যুগে মানুষ যখন পাচোড়-জামলে হাসি করতো, তখনো হঠাৎ মানুষ থাকার জন্য এর চাইতে ভাল ঘর করেছিল।

বঙ্গবীর আমূল কানের সিঁদিলী বীর উত্তম এর কাছে বললাম। কিন্তু যুগে গেল না। দুই সপ্তকেই হয়ে গেল। একানেও কুখার যন্ত্রণা। প্রতি চকিল যন্ত্রণা একবারে খাওয়া। কেনা বায়োটিব দিতে নারিকেলের আচার এর আটা ভাত, সঙ্গে সন্ধান জামের পানি। পানের মিল আবার কেনা বায়োটিব ঐ পরিমানেও ভাত। অর্থাৎ চকিল মদী পর পর একবার যন্ত্রণাদান। ভাত। চান্দুড়ই পৌষ্যত দিন দিন পর বাবা কানের সিঁদিলীর সঙ্গে আশ্বাসের কেনা ফুলে। বাবা সিঁদিলী আশ্বাসের প্রথম মর্ষনেই বললেন, কষ্টের অংশে ধুলেধুলে অমার হতে হবে, তারপর বেশ দেখা করতে হবে। যদি পার তাহলে তোমরা আমার সাথে থাক, না পারলে ভাই চলে যাও।

তিনি মাঝে বললেন, হালি যুগে কষ্ট করতে না পারলে বেশ দেখা করা যাবে না। বেশ দেখাও মানেই হচ্ছে কষ্ট করা। '৭১-এও মুক্তিযুদ্ধের চাইতেও আচ্ছা বেশি কষ্ট করতে হবে। আচ্ছা বেশি তাম হীকর করতে হবে। ৭১-এ আমরা সব কিছুই সহ্য করে গিয়েছিলাম, তাই কষ্টের জীবনে আচ্ছা এই বিপর্যয় নেমে এসেছে। তাই বলি ভাই, হালি কষ্ট করতে পার, যদি মর্ষোচ্চ তাম বীজের ভরতে পারো, তাহলে থাক, নাটলে চলে যাও।

প্রতি উত্তরে আমরা বললাম, আমরা যুগে খুঁই হতো খাওয়া। শুধু আপনার সাথে খেতে পারবো না।

মাদীনের প্রাচীর আমি বললাম, পৃথিবীতে এমন কোন জেবক আছে, এই মায়া এই পৃথিবী, এই পৃথিবী নিয়ে মিলে মানুষকে কখনো পায়বে?



৭০-এ শেষ কর্তব্য পূরণ করতেন কুসুম ও মোহা। কর্তব্য শেষে "আমরা ফেরি চাই" চিহ্নে সৈন্য-  
বাহিনীকে অসহায়ী সৈন্যে ১নং কর্তৃকর্তন করতেন। কর্তব্য শেষে সৈন্য-  
এবং ৪ কর্তব্য পূরণ

## প্রতিবাদ যুদ্ধ

আমরা অভিযানেই '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে। তাই সামরিক ট্রেনিং-এর বিশেষ  
প্রয়োজন হলো না। আমাদেরও ট্রেনিং-এর বহুতর গিয়েই আমরা সফলতর  
ভিত্তিতে চলে গেলাম। জিফের মাঝে সীমান্ত এলাকায় আমাদের ক্যাম্প। আমরা  
দলজন নিহিত হতে একেই ক্যাম্প এতেকজন-৮লে গেলাম। অর্থাৎ খেদায়  
মহম্মদকিং জেলাও জলুয়াখট সীমান্তের ক্যাম্প।

সিদ্ধান্ত হলো যেহিলা যুদ্ধের জন্য জেতার ভেতরে গিয়ে শেষে মুক্তি  
অনুসারী যুদ্ধজনের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে নিহিত হতে যেহিলা ক্যাম্প গড়ে  
তোলা।

জি ট্রি অসিমেট্রিক রাইফেল, পাকিস্তানের ডেইরী এই রাইফেল। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানীরা আমাদের বিকতে ব্যবহার করেছিল। বেশ স্বাধীন ইওয়ার পর ভারত এই জি ট্রি রাইফেলসহ পাকিস্তানী অন্যান্য অস্ত্রসহ নিয়ে গিয়েছিল। এম, এম, জি, (মিডিয়াম মেশিনগান) টেনগান, নির ইজ (হয় ইজি) মটারসহ আমরা আঠারোজন যোদ্ধা বৃহত্তর নিরোটের সুনামগঞ্জ জেলার প্রবেশ করি। আমাদের আবেদনকে একটি গ্রামে বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে দেশের ভেতরে প্রবেশ করে।

সুনামগঞ্জের অধিকাংশ মানুষই হলো হাওড় অঞ্চল। এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো হিন্দু এবং মুসলমান পৃথক পৃথক গ্রামে বাস করে। যে গ্রামে হিন্দু বাস করে তার পাঁচ সাত মাইল পর অন্য একটি গ্রামে মুসলমান বাস করে, তার পাঁচ সাত মাইল পর আবার হিন্দু গ্রাম। একদিকে সব পরিন্যায়ই কৃষিপন্থা নির্ভর। একেত পরিবার পাঁচ, সাতজন, এমনকি হাজার কচরাস মন মান পাড়। তবে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুরাই বেশি ধনী। এখানে পনের বিশ মাইলের মধ্যে কোন পাকা বা পিচ-এর রাস্তা নেই। হাওড় এবং নিজ অঞ্চল ইওয়ার প্রচুর ফসল হয়। নগর বা শহর সভ্যতা কি তিনিস এখনকার মানুষ জানে না। এখানে কোনদিন নান্দনায়িক মাথা খুটনি। হিন্দুরা মহা উৎসবে মহা আনন্দে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে। নগর সভ্যতার আলো এখানে পৌছায়নি, হয়তো তাই সংখ্যালঘুর দ্বারা, সংখ্যাভিত্তিক অত্যাচার কোন কিছুই বেশিমান নেই।

দিনের বেনাত্র একটি হিন্দু গ্রামে দুপচাপ বসে থাকা, হাওয়া-নাওয়া, সন্ধ্যা হলেই অন্য একটি হিন্দু গ্রামের উদ্দেশ্যে হেঁটে যাত্রা করা। এইভাবে একটি হিন্দু গ্রাম থেকে আট নশ মাইল কিংবা আর চেয়েও দূরের আর একটি হিন্দু গ্রামে সারা রাত ধরে হেঁটে যাওয়া। সারা রাত হাঁটার পরে অন্য কোন গ্রাম পড়ে না তা নয়। কিন্তু নেই গ্রামে ওঠা যাবে না। কারণ এই গ্রাম মুসলমানের। আমাদের কমান্ডার বকী বাহিনীর ভেপুটি শীতের সুকুমার সরকার-এর একা কথায় কোন মুসলমান গ্রামে ওঠা যাবে না। কারণ মুসলমানরা আমাদের বাহাদুরের সেনাবাহিনীর কাছে পরিচয় দেবে। তাই আমরা কোন মুসলমান গ্রামে উঠি না। সন্ধ্যা হলেই আমরা হাঁটা তরু করি। সাধারণত হেঁটে এক হিন্দু গ্রাম থেকে আর এক হিন্দু গ্রামে গিয়ে উঠি। এইভাবে দিনে হাওয়া-নাওয়া দুপচাপ বসে থাকা। এবং সারারাত হাঁটা। দিন দশেক পরেই শরীর কাঁপতে লাগলো। প্রথমে জামি জামলায় এটা বুঝি আমরা কোন রোগ। পরে দেখি সন্ধ্যারই শরীর কাঁপছে এবং লকলেই আমরা তখনও শরীরের অবস্থা অবহিত করছি।

কিন্তু শরীর বড়ই কাঁপুক বাতে তো হাঁটতেই হবে। হাঁটা ছাড়া আমাদের বিকল্প কিছুই নেই। একদিন সন্ধ্যার পর হাঁটতে বের করলাম। নিশিবার পর



হয়, কিন্তু হিন্দু গ্রাম আর আসে না। সামলে জাবছা একটা গ্রাম দেয়া যায় কিন্তু  
 ঐ গ্রামে উঠা যাবে না। ওটা মুসলমানের গ্রাম। রক্ত শেনে ভোর হয় হয় জান।  
 আনাদের সকল সাক্ষী বেঁকে বসলো। তাদের শরীর আর চমকে না, আর হাঁটতে  
 পারছে না। সকলের এক মাধী। এই গ্রামেই উঠতে হবে, এই গ্রামেই আশ্রয়  
 নিতে হবে। কিন্তু কমান্ডার সুকুমার সরকারের ঐ একই কথা—ওটা মুসলমান  
 গ্রাম, এই গ্রামে উঠা বা আশ্রয় নেওয়া যাবে না। এর পরের গ্রাম হিন্দু। সেই  
 গ্রামে আশ্রয় নেওয়ার জন্য উঠতে হবে।

এই কথা শুনে সরাসরি বসে পড়লো। কেউ কেউ ভয়ে পড়লো। সামরিক  
 ভাষায় যাকে বলে ট্রিপস আউট অফ অর্ডার। সুকুমার সরকার আর আমি  
 দাঁড়িয়ে। বাকি সবাই যে মার মতো কমান্ডার তেজা দালের উপর গড়ে-বসে।  
 সুকুমার বাবু আমাকে বললেন—বীচতে চাইলে ট্রিপস উঠাও।

আমি শত চেষ্টা করেও কাউকেই উঠাতে পারলাম না। অবশেষে কমান্ডার  
 সুকুমার জাপানিক ভাষায় বললেন, শব্দার ভারতের আমায় কি বেকাইইন  
 (নকলেই) মরবে, চল এই মুসলমান গ্রামেই উঠি।

বলে গ্রামের দিকে হাঁটতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সবাই উঠে হাটতে  
 লাগলো। সুকুমার বাবু আব্বাভা মুসলমান গ্রামে না উঠার কথা বললো, কিন্তু  
 কোন কাজ হলো না। সবাই মুসলমান গ্রামের দিকেই চলতে লাগলো। যিনি  
 পনেরত মধ্যেই আমরা আশ্রয় নেওয়ার জন্য মুসলমান গ্রামে উঠে পড়লাম। মূল  
 মাটি থেকে পনের বিশ-ফিট উঁচু, লাফ আট শত ফুট লম্বা, একশত ফুট চওড়া  
 এবং পঞ্চাশ গাটটি ঘরের গ্রামে যে বেশিক নিয়ে পাতে চুকলো এবং যে ঘরে  
 পারবে গুয়ে পড়লো। লাফ গ্রামে ডাকাত ডাকাত বলে সোরা পড়ে গেল। অবস্থা  
 বৈশিষ্ট্যক লেখে আমি চিত্রকর করে বলতে লাগলাম, তাই বল, আমরা ডাকাত  
 না। আপনাদের গুয়েও কোন কারণ নেই, আমরা ডাকাত নই। আপনারা হুইচই  
 বহু ককন, আমরা ডাকাত নই।

এক পর্যায়ে লাফ হয়ে বললাম, আপনারা হুপ না ককলে আমরা আপনাদের  
 জলি করতে বাধ্য হবো।

বলেই কি খ্রি অটো কইফেন ডাক করে পড়লাম। কিন্তু লোক কথায় এবং  
 ভয়ে হুপ করলো। আমি গ্রামের পুরুষদের বললাম, আপনাদের মসজিদে আসুন।  
 ফজর নামাজের পর আপনাদের সাথে আমাদের কথা আছে। এবানকার গ্রাম  
 দেশের অব্যাহত গ্রামে মডো ন্যা। এই গ্রাম মূল মাটি থেকে বিশ খ্রি ফুট উঁচু  
 পাঁচ শত শত বা হাজার ফুট লম্বা পঞ্চাশ গাট ফুট চওড়া করে মাটি ফেলে স্থায়  
 উপর পারিকল্পিতভাবে দুই সারিতে ঘর, এক কোথায় মসজিদ, পাঠশালা তৈরী  
 করা। মসজিদে ফজরের আযান শেষে নামাজ হলো। আমাদের কে যে কোন

যবে কোথায় ঘুমিয়ে নাক ডাকছে তার কোন হসিস নেই। একবারে অসি প্রবেশ মানুষের ভীতক উপচে পড়া মসজিদের বাগানায় অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে বহুতলা করছি। ভাই নথ, আমরা ডাকাত নই। আমরা যদি ডাকাত হতাম, তাহলে একক্ষণে আপনারের জানমাল ধনসম্পদ লুট করতাম। কিন্তু কই, আমরা তো আপনারের কিছুই লুট করছি না। কারণ আমরা ডাকাত নই। আমরা ইলান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সৈনিক। আপনারা ইরাকের জানেন না প্রতিটি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সম্প্রতিবারে নির্মম হত্যার হত্যা করে হত। আর তাই এই হত্যার প্রতিবাদে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছি। আমরা ডাকাত নই, আমরা শেখ মুজিবের সৈনিক। আমরা বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। এবং এই যুদ্ধের প্রয়োজনেই আমরা অস্ত্র আপনারদের কাছে আগ্রহের জন্য এসেছি। আমরা আপনারদের সন্তান। আপনারা আমাদের পিতা-মাতার হতো। শুধু আজকের দিনের জন্য একটুখানি আগ্রহ আমরা আপনারদের কাছে চাই।

আমার বহুতলা গুলে গ্রামের এক মহিলা বহুতলা, ইম ডাকাত দেনি ভাল ভাল কথা বলে।

জোজা পারিষ মতো আরো কত কিছুই না বোকাগাম, গামদাসিত মুখলো। আমি মসজিদের বাগানায় অস্ত্রটা বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লাম। গামদাসিতর ডাকাত অস্ত্রাই দুই হাওদো।

গ্রামবাসী আমাকে ঘুম থেকে তুলে বললো, সাত, আরসেন আপনারদের জন্য বাগানায় দাবিল্লা হয়েছে।

আমি বললাম, আপনি যান আমি আসছি।

তিনি বললেন—না, আমার সন্তাই খেতে হবে। আপনারদের জন্য আমরা খানি জ্বাই করেছি।

আমি উনার সাথে খেতে বাসিন্দাম। একটা ঘরে আসাকে আমার আরো তিনজন শরীফর ষাওরতে বসানো হলো। বেঁচে বসে সেখানে খানি সাতাই খানির মাংস দিয়ে খেতে দিয়েছে। আমি মনে নিজেই নিজের বহুতলা প্রশংসা করতে লাগলাম, আর গর্বে বোধ করতে লাগলাম। আমার বহুতলা এমনই বালু এবং আমি মানুষকে এমনভাবেই বহুতলা পারি যে, আমার মানুষ খানি জ্বাই দিয়ে আমাদের ষাওরাম। আহ, কি আমার ঘোষণা।

খানির মাংস দিয়ে পুরো গোট ডাক ষাওরাম গুলে একটা মু। গোট জালা না দাকার দুখ ডাক খেতে অস্বস্তি জননান। কিন্তু প্রতিটি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান—এর তও সামর্থ্য মানুষেরা বাগানাকরান। দুখ ডাক খেতেই হবে। তাদের অনুভবের কাছে নীতি বীজের তরে দুখ ডাক খেতে বসলাম। এক

লোকেরা দুধ-ভাত ভুজে বেই মুখে দিতে পেলাম, এমনি আচমকা ওলি ভর  
 হলো। খাঁকে খাঁকে ওলি বাশের বেড়া ভেদ করে খাওয়া চুকতে লাগলো। বাইরে  
 পাকা জি জি আটো বাইরের নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। মুহুর্তের মধ্যেই  
 পান্টা ওলি ভরতে করতে গরের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম বাংলাদেশ  
 সেনাবাহিনীর সৈন্যরা আমাদের তিন দিক থেকে ঘেরাও করে হামলা করেছে।  
 এতক্ষণে বুঝলাম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভক্ত, অনুচরী  
 সমর্থক সংগ্রাম-সরল গ্রামের মানুষের বাসি জবাই করে ও দুধ-ভাত খাওয়ানোর  
 প্রবৃত্তি রহস্য। তিনচার শত লোকের বাস এই গ্রামে। গ্রামে কোন মহিলা নেই,  
 শিশুও নেই, এমনকি পুরুষও নেই। রয়েছে শুধু আমরা আর আমাদের সামনে,  
 জান দিকে, এবং বাম দিকে—এই তিন দিক থেকে ওরা আর্মির সৈন্যরা।

আমাদের পিছনে হাওড়। হাওড় মানে কুল-কিনারাবিহীন এক বিশাল  
 জনাশর। আমাদের ত্বরিত পান্টা অকস্মাৎ প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ফজরের  
 নামাজের পর গ্রামের মানুষদের আমাদের সম্পর্কে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ  
 মুজিবুর রহমান সম্পর্কে বিস্তারিত বুঝানোর পর আমরা বন পড়ীও নিদ্রায় মগ্ন  
 তখন গ্রামের মানুষেরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্নেল (পরবর্তী কালে জি, জি,  
 ডি এক, আই মেজর জেনারেল এবং বট্টদুত দীর্ঘ প্রক বাগদান জেনারেল  
 মাহামুদুল হাসান নন) মাহামুদুল হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং জেনারেল  
 (ঐ সময়ের কর্নেল) মাহামুদুল হাসানের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের পাওয়ার  
 জন্য বাসি জবাই করে মাংস এবং দুধ-ভাত খাওয়ার আয়োজন করা হয়। আমরা  
 ঘুমে থাকতেই মুহিমের কয়েকজন লোককে আমাদের হাওয়া-দাওয়ার জন্য  
 থেকে গ্রামের মানিক মহিলা শিশু এবং পুরুষ সন্ধ্যাকেই অনেক সন্ধ্যা নেওয়া হয়।  
 হিসেবটা এই ঠকম ছিল, আমরা বাসির মাংস আর দুধ ভাত খেতে ব্যস্ত  
 থাকতাম, আর মাহামুদুল হাসানের সৈন্যরা তিন দিক থেকে কঠিন আক্রমণ  
 করে আমাদের জীবিত পরে নিয়ে যাবে। আমাদের সঙ্গে থাকা অত্যাধুনিক  
 সমরায় সম্পর্কে জেনারেল মাহামুদুল হাসানের সঠিক ধারণা ছিল না। তিনি  
 আমাদের আভার ইন্টিমেট করেছিলেন। অস্ত্রমস্ত্রে সর্বল মনে করেছিলেন। ফলে  
 প্রায় তিন শতাধিক সৈন্য নিয়ে, তিন দিক থেকে ঘেরাও করে আক্রমণ করেও  
 আমাদের কাবু করতে পারেননি। আমরা ত্বরিত পান্টা আক্রমণের মাধ্যমে  
 মাহামুদুল হাসানের আক্রমণ প্রতিহত করে দেই। জেনারেল মাহামুদুল হাসান  
 হেলিকপ্টারের সাহায্যে অস্ত্র ও সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। আমরা হেলিকপ্টার  
 লক্ষ্য করে নিস্ত্র ইস্তাফার থেকে গোলা নিক্ষেপ করলে হেলিকপ্টার পালিয়ে  
 যায়। কিন্তু ইতিমধ্যেই জেনারেল মাহামুদুল হাসান তার সৈন্যদের ও অস্ত্রবল  
 বিপলজনক মাত্রায় ধ্বংস করে। প্রচণ্ড পড়িয়ে যুদ্ধ চলাতে থাকে। বাংলাদেশ

সেনাবাহিনীর লক্ষ্য। আমাদের জীকিত কিংবা মৃত অবস্থায় পরায়ত্ত করা। আর আমাদের লক্ষ্য প্রাপ্ত যাঁরা। যুদ্ধের কৌশলগত কারণে আমাদের অবস্থান ছিল অনেক সুবিধাজনক। কারণ আমরা ছিলাম গ্রামে অর্থাৎ উঁচু জায়গায়। আর সেনাবাহিনী ছিল যান কেতে অর্থাৎ নিম্ন জায়গায়। যুদ্ধে আমাদের মিডিয়াম (এম, এম, জি) মেশিন গান চালক উপজাতীয় গাড়ি তরুণ আর মারাত্মক ও ভারী অস্ত্রবরাদী তরুণ সহকারী চালক দিনবন্ধু মারাত্মক কিলিমেত নায়কের মতো অকৃতপূর্ব সাহেনিকতার সাথে একশত রাউন্ড গুলির এক চেইন বিশিষ্ট এম, এম, জি (মেডিয়াম মেশিন গান) চালাতে থাকে। এম, এম, জির সামনে দুটি পা আছে। এই পা দুটি মাটিতে রেখে, হয়ে থেকে তার পর এম, এম, জি চালাতে হয়। কিন্তু আর মারাত্মক এই রীতি বা প্রশিক্ষণের তোরাক্তা না করে একশত রাউন্ড গুলির একচেইন এম, এম, জি হাতে নিয়ে মাড়িয়ে সিনেমার নায়কের মতো শত্রুকে খারোদ করতে লাগলো। আর তার সাথে তাল মিলিয়ে কিশোর তরুণ যুবক দিনবন্ধু চেইনে দ্রুত একশত রাউন্ড গুলি করে চেইন এম, এম, জিতে ফিট করে দিতে লাগলো। সিনেমায় যেমন নায়ক একের পর এক শত্রু নিধন করে যায়। কিন্তু নায়কের গায়ে গুলি লাগে না, ব্যস্ত যুদ্ধেও আর মারাত্মক ঐ বক্ষ একের পর এক শত্রু নিধন করে যেতে লাগলো। কিন্তু আর মারাত্মক গায়ে শত্রুর গুলি লাগলো না। আমরা একত অর্থে চারদিক থেকেই ঘেরাও। আমাদের পালানোর কোন পথ নেই। কারণ তিন দিকে সেনাবাহিনী আর এক দিকে কুলকিনারাবাহিনীর হাওড়ের বিশাল জলরাশি। পালানোর কোন পথ নেই। মোলারেল মাহামুদ হাসানের মারামা ছিল আমরা আর কতক্ষণ যুদ্ধ করবো? এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, পাঁচ ঘণ্টা, দশ ঘণ্টা, চাক্ষুশ ঘণ্টা, একদিন, দুইদিন? তারপর কি? হয় মৃত্যু, না হয় বন্দী। আসলেও তাই, আমাদের এর পালানোর কোন পথই নেই। প্রচণ্ড যুদ্ধ কেউ কারো নাহি হাতে সমানে সমান। অগ্নি চিহ্নিত হলাম। তলিৎ করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে নিজেদের সর্বশেষ অবস্থানটা দেখে নিলাম। যুদ্ধ শুরু হলেই দুপুর বেলা, এখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। মনে মনে শেলুক ডিসিশনটা কি নেব করবে লাগলাম। দর পড়ব, না আত্মহত্যা করবো। হিক এমন সময় আমাদের কমান্ডার সুকুমার বাপু তিক এই ভাষণ- “কে আর জোহান হও আতহান ইকিছে হবিনগ” বলেই আমাদের বললেন, ঐ উত্তর দিকে হিজল গাছগুলোর আড়ালে যে সৈন্যগুলো আছে, তাদের ঘর এক খটক্য আক্রমণে নিহত বা সড়িতে নিহত পাও তাহলেই কেবল আমরা বাঁচতে পারি।

কারণ ঐ একটিই মাত্র পথ আছে পালানোর। কমান্ডারের কথটা শুনে একতক্ষ মনে মনে যে শেষত ডিসিশনের কথা ভাবছিলাম তার সুরাহা হয়ে গেল।



সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেপলাম, হয় সেনাবাহিনীদের নিহত বা কাড়িয়ে দেব অথবা  
 নিজেই মরবো। তিনজন সারী বন্ধুকে ইশারায় কাছে ডাকলাম। আমি সহ  
 চারজনের একটি সুইসাইড কোয়ার্টা খনন করলাম। যদিও পরিস্থিতি ও পরিকল্পনা  
 আমরা সবকোনই সুইসাইড কোয়ার্টা মেথার হয়ে দেখছি, তারপর একটি সামান্য  
 আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে একে অশরের সাথে কর্মমর্দন করে তুলি করতে করতে  
 হিজল বাগানের দিকে কটিকা আক্রমণ করলাম। নিজেদের গায়ে তুলি  
 লাগতে পারে সেই পরোক্ষা করলাম না। শুধু আক্রমণ আর সামনের দিকে  
 এগিয়ে গেলাম। ফুকের দরন গেল পাশেই। একজন আনন্দের তু শক্তির আক্রমণ  
 প্রতিহত করতে আত্মরক্ষার্থে পাল্টা আক্রমণ করেছি। শক্তির ঝাঁকে ঝাঁকে তুলি  
 আমাদের দিকে আসছে। এতে আমাদের কোনই ভয়ঙ্কর নেই। আমরা তো  
 মরার জন্যই এসছি। মিনিট পনেরোয় মধ্যেই আমরা হিজল বাগান দরন করে  
 ফেললাম। আর্মিও হেলমেট, বুট এবং জায়গায় জায়গায় হক ঘোষে অনুমান  
 করলাম এখানে সেনাবাহিনীর বেশ সদস্য ইত্যাহত হয়েছে। যার ফলে ইত্যাহত  
 সৈন্যদের নিয়ে বাকি সৈন্যরা এই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র অবস্থান নিয়েছে।  
 হিজল বাগান আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। আমরা কমান্ডারের অপেক্ষায় বইলাম।  
 সন্ধ্যা হয়ে অন্ধকার নেমে এলো। চারিদিকে দুটুখুটে অন্ধকার। ফুকের ভেজা কমে  
 এলো। এখন এমনই একটি সময় যখন আকাশে ঠান্ডেই তপ্পাংশ ওঠে। রাত  
 দশটা এগারোটায়। আকাশে ঠান্ড ওঠার আগেই এই অন্ধকারেই আমাদের  
 পালিয়ে যেতে হবে। কতকগুলি জানি না, তবে অনেকগুলি হলো আমাদের কমান্ডার  
 এবং অন্য সারীদের অপেক্ষা আমরা বসে আছি। ঠান্ড উঠলে আমাদের পালানের  
 করিন হয়ে পড়বে। কতক ঠান্ডের আলোয় আমাদের দেখা যাবে। শক্তির ওয়ার  
 পরিশ্রমে আছে, তাদের আলোয় আমাদের দেখলেই তুলি করে মাথার খুলি  
 উড়িয়ে দিবে। পালাতে পালো তো দুতের কথা, ঠান্ড উঠলেই আমাদের হয়  
 পরিশ্রমে থাকতে হবে, নইলে মাঝে যেতে হবে। এখনও কমান্ডার এলো না।  
 আত্মাহুত করে প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ, তুমি আত্ম মেয়ে ঠান্ড তেকে রাখ।  
 নইলে আমরা মারা যাব।

অনেককাল হয়ে গেল, আমাদের কমান্ডার ও অন্য সারীরা এখনও এলো না।  
 কারার বেলক ভিভিশন নিলাম এবং সাধারণ তিন সারীতে জানালাম যেতো  
 কিছুকাল অপেক্ষা করবো। এর মধ্যে কমান্ডার ও অন্য সারীরা না-হলে আমরা  
 পালিয়ে যাব। কারণ আকাশে ঠান্ড উঠলে আর পালানো সম্ভব না। পালাতে হলে  
 ঠান্ড উঠার আগেই পালানো হবে। এই হিজল বাগানের পরেই স্থান ক্ষেত। সেই  
 ক্ষেতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৈন্যরা পরিশ্রমে আছে। আকাশে ঠান্ড উঠে  
 গেলে তাদের আলোয় হিজল বাগান থেকে স্থান ক্ষেতে যাওয়া হবেই পরিশ্রমে



খাক সৈন্যরা আমাদের দেখতে পাবে, আর দেখা বাড়ই সৈন্যরা তলি করে আমাদের স্বাক্ষর করে দেবে। অতএব কিছুক্ষণের মধ্যেই পালিয়ে যেতে হবে।

কিছুক্ষণ পরে বললাম, আমি এখন পালিয়ে যাব, তোমরা যদি সন্তে চাও তাহলে আমার সঙ্গে যেতে পার।

চাকজন মিলে পালিয়ে লাগলাম। খুটখুটে অন্ধকার নিজেকেই নিজে দেখা যায় না। আমরা চাকজন একে অপর থেকে যারত বিচ্ছিন্ন না হই সেই জন্য গায়ে গায়ে মিশে পথ চলতে লাগলাম। হিজল বাগানে থেকে ধানক্ষেতে এসে পড়লাম। ধানক্ষেতে কিছুক্ষণ চলার পর আমরা দাঁড়িয়ে পরলাম। অত অন্ধকার যে, আমরা কি সোজা হাঁটছি, না এক জায়গায়ই দাঁড়ই কিছুই বুঝি না। তবে এইভাবে যে পালিয়ে পারব না তা বুঝতে পারলাম। হঠক সাদা রাত হেঁটে দেখা যাবে আমরা সেই জায়গায় ছিলাম সেই জায়গায়ই দূরপাক বাড়ি। সাদী তিনজন দানতে গেল আশিওর মাথকে পেলাম। একজন জিজ্ঞেস করলো, এখন উপায় কি?

বললাম, দাঁড়িয়ে তো থাক যাবে না। হাঁটতেই হবে-তাহলে যা হও হবে। তবে নকলসেই বেয়াল সাংসে গ্রামের মানুষ যে পথে চলে সেই পথেই যাস উঠে পিয়ে সাদা মাটির পথ হয়, সেই পথ অন্ধকারও অন্ধরা দেখা যাবে। আমরা হাঁটতে থাকি সেই পথ পেলে একটা উপায় হবে।

আমাদের এক সাথী বিমল বললো, দাড়ান আমার পায়েখানা পেয়েছে।

আমরা দাঁড়লাম। বিমল পায়েখানা করতে বসেই বললো

পেয়েছি, পেয়েছি, পথ পেয়েছি। আমরা সবাই দেখলাম, ইতি এই কো গ্রামের মানুষের গায়ে চলার পথ। বিমলের পায়েখানা শেষে বুঁকে পাওয়া পথ ধরে দীর্ঘ দীর্ঘ হাঁটতে লাগলাম। হাল অনেক ভয়, এই পথ না হারায়। সাদী নতুনকো প্রাণী নমু বললো, দাঁড়ান, আমার শরীর কেমন ভারী হয়ে আছে।

বললাম, প্রাণী হোক, অত হাল হোক, দাঁড়ানার সময় এই বস্তু।

এক-মহলেই দেখলাম একটা লোক ধানক্ষেতে বসে বিড়ি বা সিগারেট খাচ্ছে। প্রতি টানে টানে ধূমকি দিয়ে স্পষ্ট আঙন দেখা যাচ্ছে। আমি নিশ্চিত হলাম এই লোক বেসামরিক লোক, মানে পারদর্শক। কেননা কোর আমেরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক এই সময়ে, এই রাতে, এই যুদ্ধ ময়দানে বিড়ি বা সিগারেট খেতে পারে না। সামরিক প্রশিক্ষণকালেই যুদ্ধ ময়দানে তাতেও বেসামরিক বিড়ি বা সিগারেট খাওয়ার ভয়াবহ পরিতর্কিত সম্পর্ক বিশেষ তামিল দেওয়া হয়।

সাদী বস্তুদের বললাম, এই লোককে ধরে যান পয়েন্টে নিয়ে পালানোর পথ বের করে দিতে হবে। এই লোককেই খান পয়েন্টে আমাদের সাথ্য নিয়ে পালিয়ে হবে। আপনারা বিভিন্ন আঙন লক্ষ্য করে চলিং করে টি-গোয়েন পুড়িন হুত সামনে ঘেরা অবস্থানে নোবন। আমি চেপিং করে পেছন দিক দিয়ে এ

লোককে ধান পরাই করাবো। যাতে ঐ লোক চিকিৎসার অধিনা ঘেঁড়ে গালাগতে না পারে। আমাদের কোন প্রকারে শখ করা চলবে না এটা মনে রেখের কাজ করতে হবে।

আমরা কলিং করে যাওয়া শুরু করলাম। আমি ঠিক সিঁহন সিক দিয়ে ঐ লোকের পিঠে হাত রেখে বললাম, কেজা?

লোকটি ঘাবড়ে গিয়ে বলল, আমি, আমি।

আমি ধমকের স্বরে বললাম, চুপ।

একপাশ ধীরে ধীরে জলচলানকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নাম কি?

ঐ লোক কামেন, জিভেন হাজং।

নামটি আমার চেনা চেনা লাগলো তবুও ভি বি আইফেলের ক্যাজেল (নল) পিঠে ছেঁকিয়ে বললাম, আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন। মইনে তলি বড় মেতে কেবব। আমরা কানেকীয়া বাহিনীর লোক।

শবে শবে জললোক বলামেন, আপনারদের জন্যই তো আমি নৌকা নিয়ে এসেছি। নৌকা কোথায়? যাটে। চলুন আগে যাটে যাই।

জিভেন হাজং হলেন কনবেড মনি নিং-এর কমিউনিটি পার্টির সদস্য। সংগ্রামী আর বিপ্লবীদের সাহায্য করাই তার ধর্ম। সুশাসনপন্থী সীমান্ত এলাকায় বাসিন্দা। চীতকুমার জিভেন হাজং, চিরকাল হানুঘের সেবা করেই জীবন অতিয়ে দিয়েছেন। এই সুমানসজ্ঞ অধ্যবসায়ী সোটিগুটি সমস্ত মানুষ জিভেন হাজংকে চেনে। তিনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভেজাণা আন্দোলন, গাম্বন যার জারি ভাষ এবং জমিনারী প্রণা বাতিল আন্দোলনের পিণ্ডি যোদ্ধা ছিলেন। যৌবন বয়সে তিনি কনবেড মনি নিং-এর সহযোগী ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক নীওজান বিস্তারে তাঁর ধুক নিয়ে বুটিশ সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। একবার নামে আমাদের অস্থান মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ছিলেন। কিন্তু ঐ অঞ্চলে তেমন একটা যুদ্ধ না হওয়ায় তিনি যুদ্ধ করতে পারেননি বলে দুঃখিত।

আন্দোলন, সংগ্রাম, যুদ্ধ জিভেন হাজং-এর কাছে দেশের মতো লাগে। সীমান্তে আমাদের ঘাঁটিতে তিনি একবার এসেছিলেন। যোদ্ধাদের জিভেন হাজং ভালবাসেন। নিজের বিপদ উপেক্ষা করে যোদ্ধাদের সাহায্যে এলিয়ে আসতে তিনি সাক্ষর আনন্দ পান। তাই আমরা যখন সীমান্ত থেকে দেশের ভেতরে ঢুকি তখন গোত্রই নিরাপদ দূরত্বে থেকে তিনি আমাদের ছাড়াও মতো অনুসরণ করেছেন। এই অঞ্চল তার এতোই নথদর্পণে যে, আমরা যখন রাতে শুয়ান্দ হতাম তিনি সহজেই অনুমান করে দিচ্ত পারভেন আমরা এক রাতে পারে হেঁটে ওত ঘুরে এবং কোথায় গিয়ে পৌঁছতে পারি। শরের দিন তিনি আবার আমাদের কাছাকাছি কোন জায়গায় অধবাস নিতেন। কিন্তু পরাসরি আমাদের কাছে আবার ফাঁসি চাই—৫

মাসতেন না। এই অক্ষতের হিন্দু-মুসলমান সবলের কাছেই তাঁর সমান সমান  
ছিল। যত-সংসার ভাগী চিরকুমার এই পুরুষের কাজই ছিল আজ এই ছান  
কাল অন্য গ্রাম ঘুরে বেড়ানো। ঘাটে এসে দেখলাম মতিই একটা বড় ছোলে  
নৌকার রয়েছে। সঙ্গে তিনজন নাকি। জিতেন হাজংসহ আমরা চারজন নৌকা  
উঠে বসলাম। আমাদের চারজনের একজন হলো কমান্ডারের ছোট-ভাই অরণ  
নরকার। নৌকার উঠেই অরণ নরকার বললো, নানা বে কিমান্ডার সুকুমার  
নরকার) ছাড়া যামু না। নানারে প্রাণের বাঁধা করেন।

জিতেন হাজং বসলেন, তোমরা নৌকা বহে আমি কমান্ডারকে হুইজা  
খনি।

জিতেন হাজং কমান্ডার সুকুমার বাদু এক অন্য সখীসহ বুকে আসতে  
সেলো। আমরা চারজন নৌকা থেকে নেমে ভয়ে প্রতিশান নিয়ে থাকলাম। এক  
নয় অকসরে দেখলাম বুই কাছাকাছি একজন বৈদ্য শাবিনকভাবে লাইন  
নিয়ে আমাদের নিকে আসছে। আমরা চারজন প্রতিশানে মুগ্ধ করে ভয়ে  
থাকলাম। সৈন্যরা আমাদের দু'তিন হাজং ঘুর নিয়ে নৌকার দিকে এগিয়ে গেল।  
এরপর কমান্ডার সুকুমার বাদু আগে আগে কোকিলের কণ্ঠে কু কু করে ডাক  
লেন।

আমরা দুকতে পারলাম এই সৈন্যদল আমাদেরই নাকি। আমরাও পাঁজা কু  
কু ডাক নিয়ে তাড়াতাড়ি নৌকার দিকে গেলাম। দার-দার দ্রুত সবাই নৌকা  
উঠে পড়লাম। নৌকা ছেড়ে গিল। প্রতিরিক মোটা ও মাড়ল দিয়ে আমরাও নৌকা  
লাইতে কাপলাম। আকাশে চাঁদ এঁরে আগেই অতন্ত দু'তিন মাইল দূরে চলে  
ছেতে হলে। দ্রুত প্রতিতে নৌকা চলতে লখলো। দুই দ্বীপমাংগ পথ হয়ে যাওয়া  
ঠান চাক্ষুর্বিদে হালকা উপলী আলো হুড়িয়ে আকাশ উঠলো। আমাদের গিঠি  
পরিষ্কার আলোতে সহ তিষ্ঠু-স্পষ্ট দেখা দিলে। স্থলকিনায়াবিহীন বিশাল বহি  
মাপিত মাঝে একটা নৌকা আমরা সবাই বলে আছি। এতকালে আমাদের মুখে  
কথা শুটিলো। আমরা সবাই আশ্চর্যজনকভাবে বিধাকার কৃপায় সম্পূর্ণ অকত  
স্ববস্থায় পালিয়ে এসেছি। এ কোন কিছুতেই বিশ্বাস হতে পারে না। মনের আনন্দে  
হলে হলো, উচ্চ করে গান গাই। আমাদের এই পীড়ার পিছনে মার একক  
অদ্যাক গিঠি আর কেউ না। তিনি হলেন মাকুমের সেখর উইসর্গিক্ত প্রদ  
জিতেন হাজং জিতেন হাজং-এই প্রতি কুতজ্ঞতার শেষ নেই। কল-এই শেষ  
নেই। কোন দিন কি এমন আসবে, যে দিন জিতেন হাজং-এই কল শেষ করা  
অকত চেষ্টা করা যাবে?

জোর হলো, নৌকা উঠে চিতুলো। আমরা সবাই নৌকা থেকে নেমে  
পড়লাম। জিতেন হাজংকে বুকে মতিয়ে পরে বিদায় নিলাম। আমার পথ চলতে

তক্ করলাম। এবার পশ চমকে লম্বা হলো সীমান্তের নিকে। উদ্দেশ্য সীমান্তের নিকটবর্তী জায়গা নিয়ে আমরা দুরন্তে থাকবো। জনগণের অবস্থা খুব একটা ভাল দেবলাম না। আমাদের হাতে অস্ত্র আছে বলেই জনগণ আমাদের কিছু বলেনি। কিন্তু মনে হচ্ছেছে পরলে জনগণ আমাদের ধরে ফেলে।

জনগণকে এতো বুঝাশি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দেশের প্রভা, তাঁকে আমাদেরভাবে হত্যা ..... ইত্যাদি। কিন্তু জনগণ গ্রহণ করছে না। কেবলই তা প্রত্যাখান করছে। মনটা তাঁরণ ধারণ। তাহলে কি শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠার চেয়েও নিচে নেমে গেছে? জনগণ যদি আমাদের আশ্রয় না দেয়, তাহলে আমরা গেরিলা যুদ্ধ করবো কিভাবে? জনগণ আর গেরিলা যোদ্ধার সম্পর্ক হতে হবে, পানি আর মাছের, মাছ যেমন পানি ছাড়া বাঁচে না, গেরিলা যোদ্ধাও জনগণ ছাড়া বাঁচে না। পানি যদি মাছকে আশ্রয় না দেয় তাহলে মাছের যেমন নিশ্চিত মৃত্যু হবে, ঠিক জনগণ যদি গেরিলা যোদ্ধাকে আশ্রয় না দেয়, তাহলে গেরিলা যোদ্ধারও নিশ্চিত মৃত্যু হবে।

মনে বানান প্রশ্ন, শেখ মুজিবুর রহমান কি মানুষের কাছে এতোই অসহনযোগ্য হয়ে পড়েছিল? তাকে এইভাবে খুন করা হলো, আমরা তার প্রতিবাদে যুদ্ধ করতে এসলাম, অথচ জনগণ আমাদের গ্রহণই করছে না! আসলে নশ্বর প্রতিবাদই শেষ কথা নয়। আমরা খায়া শেখ মুজিবুর অনুসারী, আমাদের নিজেদের কর্ম দ্বারা এবং জনগণকে বুঝানোর মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবার জনগণকে শেখ মুজিবুর প্রতি মমত্বশীল করে তুলতে হবে এবং শেখ মুজিবুর রহমান-এর হত্যার জনপ্রিয়তা আবার সিরিয়ে আনতে হবে। তাহলেই কেবল আমরা সশস্ত্র যুদ্ধ বা নিরস্ত্র লড়াইয়ে বিজয়ী হতে পারবো। এছাড়া আমাদের অন্য কোন বিকল্প নেই। জেনারেল মাহমুদুল হাসানের সৈন্যরা জনগণের মাধ্যমে আমাদের গতিবুদ্ধির ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে পথে পথে এতুণ করতে থাকলো। এতুণ মানে আগে থেকেই ফাঁদ পেতে বসে থাকা। আমরা এক সন্ধ্যায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জেনারেল মাহমুদুল হাসানের এতুণে ফাঁদে পা দিলাম। সন্ধ্যায় এক আধক্ষেতের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আগে থেকেই এতুণ করে ফাঁদ পেতে বসে থাকা বাংলাদেশ আর্মী সৈন্যরা অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করলো। আমরা আধক্ষেতের ভেতর আশ্রয় নিয়ে পাল্টা জবাব দিলাম। প্রথমে তীব্র লড়াই শুরু হলো। তারপর রাত-ভর ধেমে ধেমে সংঘর্ষ চলতে লাগলো। রাত পোহালো। ভোর হলো। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সেনাবাহিনীর সৈন্যরা দ্রুত গতিবুদ্ধি পুনরায় আক্রমণ শুরু করলো। আমরা তার সন্ধ্যায় জনগণ দিতে লাগলাম। বতাই বেলা বাড়তে লাগলো আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ ততই বাড়তে লাগলো। আমরা যে আধক্ষেত্রে আশ্রয় নিয়েছিলাম ওপিতে সেই ক্ষেতের আধ



ছিল কিন্তু হঠাৎ যেতে লাগলো। আমাদের গুলি ক্রমশ ঘুরিয়ে যেতে লাগলো।  
 দুপুর বাড়িয়ে বিকেল হতে লাগলো। ধীরে ধীরে আমাদের অন্তরালো একের পর  
 এক ধেমের যেতে লাগলো। যখনই আমাদের একটা অন্তর পেরে যাক তখনই  
 বুঝতে পারি আমাদের সাথী মোক্ষার গুলি ছর গেল, অথবা আহত, কিংবা নিহত  
 হয়েছে। সন্ধ্যা বাগান আমাদের একের পর এক প্রায় সকল অস্তর ধেমের গেলো।  
 অর্থাৎ আমাদের প্রায় সকল সাথীর গুলি শেষ অথবা আমাদের প্রায় সাথীই  
 নিহত। সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথেই অবস্থা ক্রমশঃ দেখে আমি ত্রস্তিৎ করে  
 আশঙ্কিত থেকে বেরিয়ে খানেকোতে ঢুকে পড়ি। সারাক্ষাত খানেকোতে ত্রস্তিৎ  
 করার পর তখন সকাল হয়, তখন আমি কোথায় আ আমি জানি না। খান বাগানের  
 পাড়া আর শীঘ্রের ধারে আমার সমস্ত পরীক্ষা কেটে ফালি ফালি হয়ে সারা দেহ  
 থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত বের হতে থাকে। দীর্ঘ সময় ত্রস্তিৎ করার ফলে আমার  
 দু'হাটু, হাতের দুই তনুই এবং বুক চিরে কতবিকৃত হয়ে গেছে। শরীরে অসহ্য  
 যন্ত্রণা। নেহে বল নেই। নেহে আর চলে না। নেহে মিষ্টক। গ্রীষ্মের মাঝা ত্যাগ  
 করে খান ফেতেই পড়ে বইলাম। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম, না জ্ঞান হানিয়ে  
 ফেললাম জানি না। যখন ইস ফিরে এলো তখন দেখি একটি কুকুর আমার নাক  
 কামছে। মল করে উঠে বসতেই কুকুরটি তিন চার হাত পিছনে সরে গেল।  
 আমার পাশেই পড়ে আছে আমার গ্রীষ্ম রক্তকারী জি প্রি অটো রাইফেল, আর  
 দুটো মাগজিন। আমার কিছুই মনে নেই। কোন আমি এই অবস্থায় এখানে।  
 পেটে তপ্ত প্রচণ্ড ক্রোধ। সুধার ছালায় আমি অস্থির। চিন্তা করছি আমি কি হয়  
 দেখছি না করতে, ধীরে ধীরে আমার সমস্ত কিছু মনে হতে লাগলো। আমি  
 আবার ভাব পেতে গেলাম। বলব ভয়। কুকুর ভয়। সঙ্গে সঙ্গে আমার মস্তনের  
 মাথী, বাঁচান সাথী প্রিয়তমা জি প্রি অটো রাইফেলটা আর মাগজিন দুটো হাতে  
 তুলে নিলাম। এখনও একটা মাগজিন পুরো গুলি ভর্তি অন্যটা অর্ধেক ভর্তি,  
 আর ত্রস্তিত সাথে ফিট করা মাগজিনে দিশ রাউন্ড গুলিও মধ্যে মধ্যে তিন রাউন্ড  
 গুলি আছে। কিন্তু গুলির ব্যাপটা কোথায় আমি না। এখন সকাল বা দুপুর না  
 বিকাল কিছুই বুঝি না। হাতের ঘড়িটা গুলির ব্যাপের নতুন কোথায়ও পড়ে  
 গেছে। পেটের ক্রোধ নিবারণের জন্য কোন মানুষের কাছে যাওয়া যাবে না। কোন  
 গাম বা লোকলয়ে যাওয়া যাবে না। মানুষোত্ত আমাদের শত্রু। আমাদের অবস্থা  
 নাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর মধ্যে। '৭১-এ ইরান মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের  
 সকল মানুষই ছিল পাক হানাদার বাহিনীর শত্রু। তখন পাক হানাদার বাহিনীর  
 যে অবস্থা হয়েছিল এখন আমাদেরও সেই একই অবস্থা হয়েছে। মানুষ আমাদের  
 সাহায্য করবে না। মানুষের কাছে যাওয়া যাবে না।



কুশল স্থানায় ঘান ঘাছের কটি-ভাগ আর কটি ধানের বুগ চুষতে লাগলাম।  
 আর ভাবতে লাগলাম এখনই অন্যত্র বওয়ানী হেনো, না সন্ধ্যা হলো বওয়ানী  
 হলো। এখন বওয়ানী হলে শব্দে কবলে শব্দার বিপদ আর সন্ধ্যার পর বওয়ানী  
 হলো অন্ধকারে পথ-স্থানায় বিপদ। কোন বিপদটা গ্রহণ করবো? পানির  
 পিপাসায় কুকের জ্বাতি কেটে ফাটে। আর কিছুকণ পর পানির পিপাসায় এমনই  
 মরতে হবে। কুশ পানিটা ভাজ করে নেংটির মতো বানালাম। সাটটা খুসে  
 কোমরের সাথে বেঁচে জি ত্রি চাইফেলটা বা হাত দিয়ে শরীরের সাথে মিলিয়ে  
 ধরলাম, যাতে দূর থেকে বোঝা না যায় অম্বার কাছে অস্ত্র। তারপর সোজা  
 পানির বোকে হাঁটা শুরু করলাম। কিছু দূর হাঁটিতেই একটি পানির ডোবা পেয়ে  
 পানি নেলাম। এক লোক পাশবান্য করে ঐ ডোবায় নোঁচ করতে এসেছে। আমি  
 ঐ লোককে ঘান পয়েন্ট করে আমাকে লোকা সীমাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার  
 নির্দেশ দিলাম। নইলে প্রাণে মারার হুমকি দিলাম। সীমাতের কাছাকাছি  
 আনতেই দূরে থেকে জমজম পাহাড় নজরে এলে আমি ঐ লোকের হাত ধরে  
 ভাঙে ধোঁব করে নিয়ে আসার জন্য জমা চেয়ে ছেড়ে দিলাম। তারপর তারতের  
 পাহাড় লক্ষ্য করে দ্রুত হাঁটিতে প্রাথমিক। সীমাতের পৌছাতে আমার সন্ধ্যা পড়িয়ে  
 রাত হলো। আমাদের সীমাত অঞ্চলের হাউডাউট বা ক্যাম্প পৌঁছে দেখি আনাত  
 যুদ্ধের পাখী বৈদ্যনাথ কর যুদ্ধ সংজ্ঞাহীন অবস্থার পড়ে আছে। বৈদ্যনাথ কর-  
 এর সারা শরীরে অলংকার ছোট ছোট ছিল। সেই সকল ছিল দিয়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত  
 বেরিয়ে আসছে। উপজাতীয় সারী ভক্তাব জন হেনরি এবং রাধা রমন রায় বান্ধু  
 (১৯৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী হাশুমদাট পানার বেকগুড়া গ্রামে এক সহন যুদ্ধে  
 রাধা রমন রায় বান্ধু ভক্তাব জন হেনরি নিহত হলেন।) বৈদ্যনাথ করকে  
 চিকিৎসা করেছে।

বৈদ্যনাথ কর যুদ্ধ হওয়ার পর আনাত পারলাম সে আশঙ্কিত থেকে চলি  
 করে পানিয়ে একটি কচুরীপানা ভরা পচা জলশায়ের আশ্রয় নিয়েছিল। সেই নীচ  
 জলশায়ের ছিল অনেক দিন না বাওয়া রক্তচোয়া জৌক। রক্তচোয়া জৌক  
 বৈদ্যনাথকে পেয়েই কিংকিল করে ফিরে গলে রক্ত হুসে ফোটে থাকে। বৈদ্যনাথ  
 কর প্রভাব-এর দারুণ আর পায়খানার রক্ত দুই হাত দিয়ে চেপে ধরে রক্ত  
 পড়ে। যাতে জৌক পাশবান্য বা প্রাণের রক্তা নিয়ে পেটের ভিতরে চুষতে না  
 পারে। বৈদ্যনাথ করের পালাবার কোন পথ ছিল না। কারণ গাংলাদেশ  
 সেনাবাহিনীর লোকেরা ঐ পুকুর পাড় সজাগ পাহারায় ছিল। পালাবার চেষ্টা  
 করলেই ধরা পড়তে হবে। তাই সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পরার চাইতে জৌককে  
 রক্ত দেওয়াই শ্রেয় মনে করেছে বৈদ্যনাথ কর। গাংলাদেশ সেনাবাহিনী ঐ পুকুর  
 পাড় থেকে সরে যেতে যদি আর এক দুই ঘন্টা সেটি করতো, তাহলে রক্তচোয়া

কোনো বৈদ্যনাথ করের শরীরের সমস্ত রক্ত চুষে গেলে কেমনটা। রক্ত শূন্যতার কারণে এখনও যে কোন সময় বৈদ্যনাথ কর মারা যেতে পারে। এই দিনের মধ্যে আমি আর বৈদ্যনাথ কর ছাড়া আমাদের বাকি সত্তর জন সাক্ষী নিহত হয়। জনসাধারণের চরম অসহযোগিতা এবং বিবোধীতার কারণে একই পরিণতি হয় বতজ্বর প্রেতাটিল বাকি এবং দুলাল সে বিপ্লব ও তার সাক্ষীদের।

কমান্ডার দুলাল সে বিপ্লব যুদ্ধে প্রচণ্ড মত্ত হয়ে আহত অবস্থায় নৌকা করে পালিয়ে আসার সময় তীব্র ঝড়পায় তাল টু, আই, সি মোঃ হিকমকে নির্দেশ দেয়, "হিক তুমি আমাদের ওলি করে ঘেরে ফেল।" এই নির্দেশ পালনে টু, আই, সি হিক অক্ষমতা প্রকাশ করলে পুনরায় দুলাল সে বিপ্লব একই নির্দেশ দেয়। কিন্তু হিকও নির্দেশ পালনে পুনরায় অক্ষমতা প্রকাশ করে। এইভাবে কয়েক বার কমান্ডারের নির্দেশে পালনে টু, আই, সি হিক অক্ষমতা প্রকাশ করার পর কমান্ডার দুলাল সে বিপ্লব অপর সাক্ষী সদনকে এই মর্মে নির্দেশ দেয় যে, "মদন আমি কমান্ডার দুলাল সে বিপ্লব তোমাকে নির্দেশ দিতেছি, আমার টু, আই, সি হিককে আমি যে নির্দেশ দিব, হিক যদি সেই নির্দেশ পালন না করে তাহলে তুমি হিককে ওলি করে ঘেরে ফেলেবে।" বলেই টু, আই, সি হিককে নির্দেশ দিল আমার কাছে ওলি করে ঘেরে ফেল। এখন অন্যতাপায় হয়ে টু, আই, সি হিক কমান্ডারের নির্দেশে কমান্ডার দুলাল সে বিপ্লবকে হত্যা করতে উদ্যত হল। টু, আই, সি হিক কমান্ডার দুলাল সে বিপ্লবকে টেনে নৌকার গোলাইয়ের বাইরে মাথাটা ফুলিয়ে দিল। দুলাল সে বিপ্লব "তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা" কবিতাটি পড়তে লাগলো আর খালি হাঙ্গা করে হিকের নিকট ডাকিয়ে থাকলো। হিক গি প্রি কাইফেল এর ব্যাকেল-(নল) টা দুলাল সে বিপ্লবের মাথায় ঠেকিয়ে ওলি করে দিল। "তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা" কবিতা পড়তে পড়তে একটা মাকুমি দিলে দুলাল সে বিপ্লবের বেহ নিখর নিজর হয়ে পড়লো।

অপরদিকে মুন্সিগঞ্জ জেলার নৌহজং থানার বাসিন্দা ঢাকা কলেজের ছাত্র নেজা মেথরী ছাত্র মোঃ ইউনুস গুলফর শুকতেই ওলিবিদ্ধ হয়। সারাদিন রক্ত ফাঁপের পর নাক-চুষে ছেবড়ি টাটে ইউনুসের সেই নিখর নিজর হয়ে যায়। সন্ধ্যায় ইউনুসের বেহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত সাব্যস্ত করে ইউনুসকে ফেলে তখন সাক্ষীরা পালিয়ে যায়।

বহু চরমক পরে খনিষ্ঠ এক প্রতিবেশীর বাড়িতে এক অনুষ্ঠানে ঐ ছাত্রের কথা উঠলে, অনুষ্ঠানে আগত এক জরুরিহীলা বাবাদিত ও এক কণ্ঠে জানাৎক গালাগালি দিয়ে বলেন, আমার ভাইকে তোমরা আহত অবস্থায় ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলে।

ঐ জ্ঞান মহিলায় কাছে জানতে পারলাম তিনি নিহত বলে ধরে নেওয়া মোঃ ইউনুসের বড় বোন। ইউনুসের বড় বোনের কাছে আরও জানতে পারলাম, সে যুদ্ধে ইউনুস আহত হয়েছিল। সেই যুদ্ধে ইউনুসের বিপক্ষে যুদ্ধ করা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে একজন সুবেদার মেজর ছিল ইউনুসের কৃপাকৃত্য ভাই। সেই সুবেদার মেজর ইউনুসের চেহারা এবং ইউনুসের জ্ঞান হারানোর কজিতে ধাক্কা মারলো জট দেখে ইউনুসকে চিনতে পেরে জেনারেল মাহমুদুল হাসানের কাছে ইউনুসকে বাঁচিয়ে রাখলে অনেক ভাগ্য পাওয়া যাবে বলে ইউনুসকে বাঁচিয়ে রাখার প্রস্তাব করেন। জেনারেল মাহমুদুল হাসান শুভকস্মাৎ হেলিকপ্টারে করে ইউনুসকে কমনাইড মিসেসিট্রী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেন। ইউনুসকে ওয়েন হাট সার্জারীসহ ঘলা থেকে নাতি পর্যন্ত চিরে অপারেশন এর মাধ্যমে সুস্থ করে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইউনুস ঘলা থেকে নাতি পর্যন্ত অপারেশনের এক বিরাট কাটা চিহ্ন নিয়ে দশ বছর জেল খেটে মুক্তি পায়।

অন্যদিকে টাঙ্গাইলে এক ক্রিয়াজ্ঞেয় গিরো ধরা পড়ে যায় বিশ্বজিৎ নন্দি। সামগ্রিক আদালত বিশ্বজিৎ নন্দিকে ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেয়। বিশ্বজিৎ নন্দি ফাঁসির প্রকোষ্ঠে (ডেথসেল বা কনডেম সেল) একে একে প্রায় পনেরটি বছর মৃত্যুর ভয় ভুগতে থাকে। ফাঁসি দেওয়ার নিয়ম অনুযায়ী সূর্য ভোবার পর এবং সূর্য উদয় হওয়ার আগে ফাঁসি কার্যকর হতে হবে। যখনই সূর্য ডুবে যেত, সন্ধ্যা হতো, বিশ্বজিৎ নন্দি অন্ধর ন্যমনে কানতে থাকতো, স্মৃতিকর্তা ইশ্বরকে বরণ করতে থাকতো। আর এই ভায়েই আশামী সূর্যোদয়ের আগেই ফাঁসি হবে। আর পৃথিবীর সূর্য দেখবে না। পৃথিবীর আলো ব্যতীত জেগে কখনো না।

এই সুন্দর ধরণী থেকে চিরদিনায় নিতে হবে। সারা রাত কানতে থাকতো আর প্রাণচ্যবে ভগবানকে ডাকতো। জীবনের শেষ ভাষা। আর কখনই ভগবানকে ডাকতে পারবে না। এ ভাষাই শেষ ভাষা। এই তো জন্মদ এল গেছে, এখনই ফাঁসিতে কুনানো হবে। এখনই মৃত্যু। ফাঁসির অঙ্গ প্রকোষ্ঠের বাইরের দেওয়ালে ইঠাং কোরের অঙ্গক। এমনি হালি। অট্ট হালি। হ্যা-হ্যা-হ্যা আহার ফাঁসি হয়নি। আমি মরিনি। আমি অস্তিত্ব আরো একদিন বেঁচে পেলাম। আরো একদিন পৃথিবীতে থাকবো। পৃথিবীর আলো মন্থন গ্রহণ করবো। হ্যা হ্যা-হ্যা আমি মরিনি, আমি মরিনি। আমি আর বেঁচে গেছি। ফাঁসির অঙ্গপ্রাঙ্গণ প্রকোষ্ঠে সারা দিন হালি থাকে আনন্দ। দিন শেষে সূর্য বসন ধীরে ধীরে ডুবেছে শুরু করলো। সন্ধ্যা নেমে এলো, আবার জন্মের নখরন তান্না আর ইশ্বরকে সন্তর্পণ করা। এই মুক্তি জন্মদ এল, ফাঁসির নড়ি পলায় ফাঁসিতে ছিল। মৃত্যু হাল। এইভাবে প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহ, প্রতি মাস, প্রতি বছর প্রায় পনের বছর। সারা

কিন্তু হুপি। সারা রাত কাটা। বিখিজিং নন্দি হিন্দু হওয়ার ভাবেরেব পশ্চিম বাংলায় জনগণের সমর্থন এবং ভারত সরকারের চাপের কারণে ফাঁসি কার্যকর হয় না। পরবর্তীতে বিখিজিং নন্দিকে প্রায় পনের বছর পর নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয়।

নজিবুল বহমান নিহার ও শাহম্মাৎ হোসেন সুজার যৌথ নেতৃত্বে ১৭ জুনের একটি গ্রাম '৭৬ নালের কাগটি-এ সুজার নিজ জিলা গাইবান্ধা দখল করে। গাইবান্ধা দখলের প্রথম লড়াইয়ে সহযোগী অগণিত নিহত হয়।

৩রা সেপ্টেম্বর '৭৬, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বড়তা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৬ বেঙ্গল এবং ৪ংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ১৬ বেঙ্গল-এর সৈন্যরা পুরো গাইবান্ধা বেড়াও করে নিহার ও সুজাদের আক্রমণ করলে নিহার-সুজার পাশী আক্রমণের মাধ্যমে পিছু হঠতে থাকে।

লড়াই-পিছু হঠা, লড়াই-পিছু হঠা করতে করতে নিহার-সুজার গোবিন্দগঞ্জ থানায় চলে গেলেও সৈন্যবাহিনীর খেড়াও ভাঙতে পারেনি। ৬ই সেপ্টেম্বর '৭৬ বিকেল পঁচটায় গোবিন্দগঞ্জের কারমিয়া গ্রামে নিহার সুজাদের ৮ জন সঙ্গী খোঁজা নিহত হয়। এবং ৬টি শেষ হয়ে যাওয়ার ও আহত হওয়ার নিহার সুজা হুমায়ুনসহ জটিল সাথী বন্দি হয়। বন্দিদের মধ্যে (১) নজিবুল বহমান নিহার (২) আবু বকর সিদ্দিকী (৩) রেজাউল করিম বেজা এবং (৪) বিভাশ এই চার জন খোঁজা আহত অবস্থায় বন্দি হয়।

সুজা, হুমায়ন, হুন্না ও বকিকুল এই চারজন অফার অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়। বন্দি হওয়ার কট্টরবাদের পর আহত নিহার, বকর, বেজা ও বিভাশকে সেনা বাহিনীর মোকেরা সুজা, হুমায়ন, হুন্না ও বকিকুলের সামনেই ত্রাণ করার করে মেরে ফেলে। এবং জীবিতদের ঘন্টা দুই পরে ৪ংপুর ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় একমাস যাপী নামা ধরনের নির্মাতন ও অন্যান্যাদি শেষে কর্নেল আফিজুর রেনঃ মার্শাল কোর্টে-বিচারে মাধ্যমীবন নতুন কারাদন্ড নিয়ে ৪ংপুর কারাদায়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়। ৪ংপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লার কারাদায়ে একতাল দশ বছর জেল খেটে সুজা, হুমায়ন, হুন্না ও বকিকুল মুক্তি পায়।

সীমান্তে নিহত প্রেসে আমাদের জাতীয় মুক্তি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক স্বর্গীয় আবদুল কাদের সিদ্দিকী দীর্ঘজীবন ওরফে নানা সিদ্দিকীকে খব গোঁশলক্ষ্যত কারণে আমাদের শ্রেষ্ঠিতা মুক্ত করা সক্ষম নয় এবং উচিত নয় হলে আমার অসম্মত ব্যক্ত করে, সিদ্ধনে শত্রু না রেখে বশকোশল নির্ধারনের কথা বনি। দেশের মানুষের অগ্রস্থ, আমাদের সম্পর্কে মানুষের ধারণা, সার্বপরি দেশ মুক্তিকর হুমায়ন-এর জনপ্রিয়তা ইত্যাদি বিস্তারিত বিস্তার বিশ্লেষণ করে কাদের সিদ্দিকী নজামতী সমুদ সমস্তের বিভাও নিলেন। তিনি খোঁজা দিলেন, কুত্রে স্তত সমবই লাগড় না কেন, কুতরা সামদা-সামনি মুক্ত করলো। প্রয়োজন বাংলাদেশে একইকি, একইকি করে ভূমি মুক্ত করলো। ৩৬ সিদ্ধনে কোন শত্রু রাখব না।



আমরা বৃহত্তর সিগেট ও ময়মনসিং জেলায় সীমান্ত অঞ্চলে শক্তিশালী গাতি স্থাপন করণায় এবং বেশ বড় এখোকা জুড়ে মুক্ত অঞ্চল তৈরি করলাম। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বি, ডি, আর এর সাথে আমাদের সম্মুখ যুদ্ধ চলতে লাগলো। সেনাবাহিনী, বি, ডি, আর চাইও আমাদের সীমান্তের ওপরও অর্ধাৎ ভারতে আড়িয়ে গিয়ে। আমরা চাইতাম আমাদের মুক্তাঞ্চল আরো বাড়তে।

আমাদের সাথীরা ময়মনসিং জেলার কমকাকান্দা থানার আক্রমণ করে খালার ওসি আশরাফ উদ্দিনকে সশস্ত্র করে মুক্ত অঞ্চলে নিয়ে আসে। পরে আমরা ওসি আশরাফ উদ্দিনকে চলে যেতে বললে তিনি চলে না গিয়ে আমাদের সাথে একাত্ত হয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। বহুরথানেক পর আমাদের নবাবিনায়ক বান্দেব সিদ্দিকী আমাদের পক্ষে রেডিও টেলিভিশনে প্রচার চালানোর জন্য ওসি আশরাফ উদ্দিনকে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে কিংবা মাওয়ার নির্দেশ নিলে তিনি সশস্ত্র গিয়ে যান এবং কথামতো ঠিকই রেডিও টেলিভিশনে তার সাক্ষাৎকারে আমাদের কথা প্রচার করেন। সতন থেকে প্রচার সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আখুস গাফফার চৌধুরী বাংলায় তার নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বেত করে আমাদের কথা প্রচার করেন। এছাড়া আমাদের আর কোন প্রচার ছিল না। ভারতের এস, এস, বি (সেন্ট্রাল সিকিউরিটি ট্রাফ) দু'বই গোপনে আমাদের সাহায্য করতো। তারা অত্যন্ত সংগোপনে আমাদের গল্প ও গোনা-বাক্য সবরকম করতো। এস এস, বি একই সতর্কতা ও গোপনীয়তার সাথে আমাদের সাহায্য করতো যে, তা ভারতীয় বি, এস, এক (যর্ধাত সিকিউরিটি ফোর্স) সহ অন্যান্য সংস্থা এবং কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত জানতো না। ভারতীয় এস, এস, বি বা সেন্ট্রাল সিকিউরিটি ট্রাফকে প্রত্যক্ষভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি পরিস্রবনা বা নিয়ন্ত্রণ করতেন।

## যুদ্ধে পরাজয়

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধি পরাজিত হয়ে মোরারজি দেশাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। ইন্দিরা গান্ধির পরাজয় এবং মোরারজি দেশাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আমরা পশ্চিম হই। এনিয়েই সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের সম্পূর্ণ বিপর্যে। একমাত্র ইন্দিরা গান্ধি ছাড়া যেটা ভারতের রাজনীতিও ছিল আমাদের বিপর্যে। আমাদের একমাত্র সমর্থক এবং সাহায্যকারী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি এখন ক্ষমতাহীন। সামনের দিন আমাদের ভাল হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই প্রথমে আমাদেরও সকল সাহায্য বন্ধ করে দিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই উভ্যই ছিলেন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মার্কিন পন্থির লোক।



কালে সর্বশক্তি হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের পরামর্শে ভারত এবং বাংলাদেশ যৌথভাবে আক্রমণ করে আমাদের পরাস্ত করার চুক্তিবদ্ধ হয়।

সীমান্ত অঞ্চলে আমাদের সংশ্লিষ্ট থাকার মুহুরতসময় এবং আমাদের ঘাটিকলো ক্রাফট ভাঙতে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করে। অপর দিকে বাংলাদেশও অনুগ্রহ ভাবে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করে। আমরা সামনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বি. ডি. আর এবং পিছনে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও সি. এস. এক ঘারা মার্কট্রিশ কয়লায় চতুর্দিক থেকে ঘেরাও হয়ে পড়ি। আমাদেরকে বাংলাদেশ ও ভারতের সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করার ফলে আমরা এক কোম্পানি থেকে আরেক কোম্পানি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি হেডকোয়ার্টার থেকেও। আমাদের এক ঘাটি থেকে আর এক ঘাটির যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের সর্বাধিনায়ক কালের সিনিকীর সাথেও আমাদের সকল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

আমরা এক ঘাটির সাধীরা অন্য ঘাটির সাধীরা কি করছে, কি অবস্থায় আছে কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু বাংলাদেশের আর ভারতীয় আর্মিদের মাইকের আওয়াজ। একদিকে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী মাইকে বলছে অটচেষ্ট্রিশ (৪৩) খসিয় মণো অক্ষয়গর্ভন (সাহেবজার) করা। নইল আক্রমণ করা হবে। অন্যদিকে পিছনেও দিক থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী মাইকে বলছে, অটচেষ্ট্রিশ মনোকা আন্দার হুতিয়ার ডালসা।

আমার ঘাটি ছিল মহম্মদসিংহ জেলার দুর্গাপুর থানার ডুবনীপুর। আমার ঘাটির সামনে ছিল বেশ বড় সামুদ্রিক নদী। নদীর অপর পাড়ে ছিল জেনারেল মাহমুদুল হাসান, মেজর সামান, মেজর মইন-এর মোতাবে বাংলাদেশ সেনা বাহিনী এবং পিছনে ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। আমরা উভয় দোশের সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে বাধ্য হই। আমাদের অস্ত্রের ভাঙার মোটামুটি দারাব না, বসিও গেলোজলিত পরিমান কম। শেষদর থেকে ভারতীয় বাহিনী আমাদের সহজে কাবু করতে পারলেও সাফল্য নলী থাকায় কৌশলগত ক্ষয়ক্ষতি বাংলাদেশ বাহিনী আমাদের সহজে কাবু করতে পারলে না। আমরা ধরনা ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও-এতকাল হয়ে আমাদের ঘাটি বন্ধ করতে অসমর্থ না। ভারতীয় বাহিনী তাদের অবস্থান থেকে প্রচুর আক্রমণ করে আমাদের ব্যাটেল করতে চাইলে। কিন্তু একজন করে আমাদের ঘাটি বন্ধ করার যিচ্চ বা যুক্তি নেবে না। আর আমাদের ঘাটির সামনে নদী থাকায় কৌশলগত কারণে আমরা অনেক সুবিধা ও সুদৃঢ় অবস্থানে আছি। বাংলাদেশ বাহিনীর সঙ্গে নদী অতিক্রম করে আমাদের ঘাটি বন্ধ করা এক দুর্ভব ব্যাপার। এই অবস্থায় একমাত্র বিমান হুমকি অথবা ডালসা আমাদের

পর্যায় করা করিব। আমরা সমস্তা বিমান হামলা যোকাবেনা করার জন্য আগে থেকেই মাটি কেটে শাল-বনের বিশাল বিশাল শাল গাছ নিয়ে তার উপর সন্মত নদীর পাশের, বালি আর মাটি দিয়ে দুবৌধা মজুত বিশালকাথ ব্যাকার ও ট্রেকের তৈরি করেছি। আমরা মাটির উপর না উঠে মাটির নিচ দিয়ে ব্যাকার ও ট্রেকের স্তম্ভ দিয়ে অনায়াসে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারি এবং মুক্ত করতে পারি।

আমাদের আত্মনমর্পনের (স্বাভেচ্ছার) জন্য বেঁধে দেওয়া আটটালিশ ঘন্টা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর, জেনারেল মাহমুদুল হাসানকে নিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের মাটির উপর বাকের খন্দাবাদী মর্টারের প্রচা শক্তাধিক শেল নিক্ষেপ করে। সেই সময়ে শিহন দিক থেকে ভারতীয় বাহিনীও আমাদের উপর অধিরাম গোলা ও তলি নিক্ষেপ করে।

ভারতীয় বাহিনীর গোলাগুলি ও বাংলাদেশ বাহিনীর মর্টারের শেলিং চলাকালে আমরা ব্যাকার ও ট্রেক বনে বাংলাদেশ বাহিনীর দিকে সজাগ ও তীব্র নৃষ্টি রাখা স্বাভা এক রাতিক তলিও করিনি। তখনও ভোর হয়নি, অন্ধকার কাটেনি, আবহা অন্ধকারে ইঠান সেবা গেল বিশ-ত্রিশ নৌকা বোকাই হয়ে জেনারেল মাহমুদুল হাসানের বাহিনী নদী অতিক্রম করছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আক্রমণ করলে ভাবাও মরিয়া হয়ে পাশটা আক্রমণ করে। তাদের সমর্পনে সেনা বাহিনীর অন্য একটি দল কভারেজ প্রাটাই করে। আক্রমণ-পাশটা আক্রমণের মধ্যে দিয়ে প্রচলিত বুদ্ধ বেধে যায়। ঘন্টা তিনেক তীব্র সংঘর্ষের পর জেনারেল মাহমুদুল হাসানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ বাহিনী প্রচলিত মাত্র থেকে কিছু হুটে যায়। এইভাবে সপ্তাহখানেক জেনারেল মাহমুদুল হাসানের আক্রমণ প্রতিহত করতেই আমাদের গোলা ব্যাকার ফুরিয়ে যায়। আমাদের অস্ত্রের যে মজুদ আছে তা দিয়ে বাংলাদেশ বাহিনীর আক্রমণ কবরের পর বছর প্রতিহত করা যাবে। কিন্তু গোলা ব্যাকারের ভাঙ্গার প্রচা ফুরিয়ে এসেছে। আর চাইলেও জাহাঙ্গীর আদার রান্না করেছে বাদ্য সংকট। দিন দিন থেকে আমাদের কাছে কোন খাদ্য নেই। কয়েক দিন চাবটি থকু তলাই করে পুড়িয়ে পুড়িয়ে আমরা খেয়েছি। আর ভাত নেই। আমরা যারা একান্তরত মুক্তিযোদ্ধা, আমরা একান্তরত মুক্তিযুদ্ধে তমু অস্ত্রের সংকটে পড়েছি। কিন্তু খাদ্য সংকটে কখন পড়িনি। গোটা বাঙালী জাতিই আমাদের খাদ্য সরবরাহ করেছে। প্রয়োজনে বাঙালী নিয়ে এ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাইয়েছে। কোন মুক্তিযোদ্ধাই খাদ্যে কষ্ট করেনি। এদেশের মানুষ আগে মুক্তিযোদ্ধার সাওয়া জুগিয়েছে তাদের বিজয়ের সাওয়া জুগিয়েছে। একান্তরতের মুক্তে আমি খাদ্য সংকটেও পড়িনি এবং মুক্তে অস্ত্র ও গোলা ব্যাকারের হাতে খাদ্যও যে একটা বিরাট ভাইটাল ব্যাকটার প্রাণ ফুড়িনি।

এখন অস্ত্র আছে, কিন্তু গোলা-বাল্লমের সংকটে পড়েছি। তার চাইতেও বেশি সংকটে পড়েছি বাদ্যের। আমাদের অস্ত্রপ্রতি পাঁচ দাত রাউন্ড গুলি ও গোলা রয়েছে মাত্র। তা পাঁচ দশ মিনিটও টিকবে না। আমার মনে এখনো আশা শেষ মুহুর্তে ভারত হস্তে। নতর হস্তে পারে। আমার সর্বাধিনায়ক কাদের সিমিকীর সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমাদের কয়েকজন বন্ধু পাকিস্তানে যেতে গিয়ে ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশ বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে মাইকে আমাদের নাম ধরে ডাকতে লাগলো। আর বলতে লাগলো, কোন অস্ত্রবিদ্যা নেই, সবাই চলে আসেন ইকানি ইত্যাদি।

দুই দিন কোন পক্ষেই কোন যুদ্ধ নেই, গোলাগুলি নেই। চতুর্দিক শীতল। আমাদের কেউ ক্যামারে, কেউ উপরে। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। আমাদের কোনই খাদ্য নেই। অস্ত্র আছে, কিন্তু নেই যুদ্ধ করার গুলি। সর্বাধিক নেই যুদ্ধ করার মতো বিন্যাস, মানসিক শক্তি। আমি একটি ছোট কাঁচামাল পাছের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেখছি জেনারেল মাহমুদুল হাসান তার বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে নৌকা করে আমাদের উদ্ধার এসে নামলো। পাশে লাকা আমার অস্ত্রটা একবার তাকিয়ে দেখলাম। হয়তো মনের ভুলেই দেখলাম। কিন্তু হাত তুলে নিলাম না।

জেনারেল মাহমুদুল হাসান তার বাহিনীকে নদীর পাশে নীড় করিয়ে রেখে মেজর মইন, মেজর সাম্যাদসহ কয়েক জন অফিসার সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ আমাদের ঘাটতে উঠে এসে আমার নামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত মোদায়েম এবং ভক্ত কণ্ঠে আমাদের বললেন, দিন, আপনায় অস্ত্রটা আমার হাতে দিন।

আমি শেন বারের মত আমার অস্ত্রটা দেখলাম। তারপর আলতো হাতে জেনারেল হাসানের হাতে তুলে দিতে দিতে মনে মনে বললাম, বিনায় হে বন্ধু, কিয়দ।

এরপর জেনারেল হাসান বললেন, হলেন আপনাদের ঘাটটা একটি ঘুরে দেখি।

তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। আমাদের সাক্ষীরা যে ঘেনানে ছিল দেখানই দাঁড়িয়ে রইল।

কারো অস্ত্র হাতে, কারো অস্ত্র দাঁড়িতে। মেজর মইনকে অস্ত্রগুলো কলেকশন করতে বলে, আমাদের সবাইকে এক জায়গায় বীড় করালেন। এরপর নিয়ে গোলকম মূর্তীপুতে সৈন্যবাহিনী। একটি ঘাটতে। সেখানে নিয়ে জেনারেল মাহমুদুল হাসান আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনাদের চিহ্নার বা দাবড়ানার কোনই জায়গা নেই। আমরা সাথে প্রেন্সিডেন্ট জিয়াউর রহমান-এর কথা হয়েছে। প্রেন্সিডেন্ট জিয়াউর রহমান কথা দিয়েছেন আপনাদের সকলকেই ছেড়ে দেওয়া হবে। শুধু মাত্র ৭৫-এর ১৫ই আগস্টের আগে যদি কারো বিরুদ্ধে

বাংলাদেশ নব্বিবিধির আওতায় মামলা থেকে পাকে তাহলো তাকে বিচারের জন্য  
সোপান করা হবে। মূর্ত্যাপুত্র কয়েক দিন রাবার পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়  
নুগুজিন কনসোল্টেশন ক্যাম্পে। এরপর সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হলো  
ময়মনসিংহ বেনিফিটসিয়াল মডেল পার্লিস কুয়েট কনসোল্টেশন ক্যাম্পে।

এই ক্যাম্পে আমাদের ইন্টারোগেশন শুরু হয়। প্রতিদিন আমাদের (আলিমা)  
আলানাহারের বিভিন্ন খরনের প্রস্তুত উত্তর লিখিত ও বৌবিকভাবে নেওয়া হতো।  
আমাদের মাঝ থেকে আমাদের মাঝী চৌধুরার জননেতা মৌলভী নৈয়দ  
আহুদেবকে ঢাকা ক্যাটিনমেন্টে নিয়ে টর্চার (নির্ঘাতন) করে মেরে ফেলা হয়।  
এই সংবাদসহ আমাদের প্রতি ভারতের মোরারজি দেশাই সরকারের বর্ধগোচিও  
অমানবিক আচরণের সংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে, কংগ্রেস  
বিরোধী মোর্গির প্রতিষ্ঠান, ইন্দিরা গান্ধির পতনের মূল মন্ত্রক, কার কলৌপতে  
মোরারজি দেশাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী, ভারতের সেই শ্রবীল সর্বদলীয় নেতা  
ভারতকান নাগরান বিক্ষুব্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মোরারজি দেশাইয়ের পদত্যাগ দাবী  
করেন।

জয় প্রকাশ নারায়ণের বক্তব্য হলো, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরোধীদের আশ্রয়  
দেওয়া ভারতের নৈতিক দায়িত্ব এবং চিরকালের ঐতিহ্য। প্রধানমন্ত্রী মোরারজি  
দেশাই এই নৈতিক দায়িত্ব পালন না করে এবং চিরঐতিহ্য হক্কা না করে  
বাংলাদেশের বিরোধীদের মুক্তার দিকে হেঁসে নিয়ে অমরজনীয় অপ্রবণ করেছেন  
এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকার নৈতিক দায়িত্ব ও অধিকার হারিয়েছেন। সুতরাং  
আর এক মুহূর্ত দেরি না করে তাকে পদত্যাগ করতে হবে। নইলে ক্ষমতাচ্যুত  
করা হবে।

সর্বদলীয় নেতা জয় প্রকাশ নারায়ণ প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের পতনের  
কার্যক্রম শুরু করলে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই সরকার আমাদের  
সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর কাদের সিন্ধিকীসহ ওয়াতে থাকা কয়েকজনকে ভারতে  
স্বাধীননৈতিক আশ্রয় দেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের দুজিখোজা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর  
রহমান তার দেওয়া কপান্দুয়াতী ভবিক্যতে রাষ্ট্রপ্রোহিতামূলক কাজে জড়িত হলে না  
এই-মর্মে মুচলিকা (বৃত্ত) নিয়ে আমাদের নিগ্রহর্ভ স্থিতি দেন।

মূলতঃ আমাদের প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই সরকারের  
অমানবিক ও অনৈতিক আচরণের ফলে দেশে পর্যন্ত ভারতের সর্বদলীয় নেতা জয়  
প্রকাশ নারায়ণ জনতার মার্গে ভ্রমশে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের পতন  
করেন।



# হাসিনা যাওয়া শেষ মুজিবের জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনা

জনসংগঠন কম্পানি থেকে ছাড়া পেয়েই হাসিনা যাওয়া শেষ মুজিবের বহুমানের জনপ্রিয়তা পুনরায় টিকারের এবং সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নতুন করে ব্যপিরে পড়ি। একমাত্র কামের নিমিত্তী ও তার কয়েকজন সাক্ষী ছাড়া অন্য কেউ ভারতের রাজনৈতিক অশ্রয় না পাওয়ায় এস, এম, ইউসুফ, মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম, শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর (বর্তমানে জাফর পাট্টা নেতা), মোজাম্ম মোহসীন মল্লু (বর্তমানে গণমোহাম নেতা), রবিউল আলম চৌধুরী (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পি, এস মোজাম্মীক চৌধুরী) করিমপুরের কুখি (শেখ মুজিবের মন্ত্রী নেতা আলম উম্মিতের ছোলে) আবু সাদিক (বর্তমানে শেখ হাসিনার তথা প্রতিমন্ত্রী) জাঃ এস, এ, মালেক (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা) সহ শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর যে সকল নেতা কর্মী ভারতে গিয়েছিল তারা সবাইই একে একে দেশে ফিরে আসেন।

মোজাহিদুল ইসলাম কাকুল (শেখ মুজিব ও এরশাদের মন্ত্রী কোয়দাম আলীক ভাগে ১৯৯৬-এ সড়ক দুর্ঘটনার নিহত) গোলাম মোজাম্মা কাম মিহাল, আব্দুল নাসির শিকু, মোহাম্মদ শোহেন সেলিম (বর্তমানে অফিসী ব্যাক্ত কর্মকর্তা ও নেতা), শামীম আফজাল (বর্তমানে বিজ্ঞপতি) রাজশাহীর বজাপুর রহমান ছানা (বর্তমানে সহকারী এটর্নী জেনারেল) এবং রানারহ অশো কিং সাক্ষী বহু মিলে তারা দেশের সব কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং অঞ্চলে নতুন করে দ্রুত সংগঠন গড়ে তুলতে থাকি। বিশেষ করে কিছু হিসেবে আমি ঢাকা শহরের সব কয়টি অঞ্চল এবং মহানগর সংগঠন গড়ে তুলি। আমরা শুধু ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলেই ক্ষান্ত হইতাম না। তুর লীগ, কৃষক লীগ এমন কি মূল সংগঠন আওয়ামী লীগ ও আমরা পঠন করে বিভাগ। আমাদের কর্মী সৃষ্টি এবং কর্মী সারাে অভিযান দ্রুত পরিচালিত করতে থাকে এবং আমরা সাক্ষরতার সংগঠিত ও শক্তিশালী হতে থাকি। আব্দুল মাক্কাক, এস, এম, ইউসুফ, শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর, রবিউল আলম চৌধুরী ও করিমুল আলিম মুল্লু (আওয়ামী লীগের কার্যকর কেন্দ্রীয় নেতা, নামকরা ডাক্তার, দৈনিক বাংলার কাগীর সহ-সম্পাদক-সাহিত্যিক সাংবাদিক নিরামিত হাস, চিকিৎসক) এবং আমাদের মধ্যে একটা অধ্যায়িত গঠন অসু কয়টি উদ্বিগ্ন হই। অন্যদিকে বিশেষগতর থেকে আসা মহা উপাচার্য ও ব্যাপক সাক্ষর জগদীশনা সত্য ও সবাইয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতা করিমুর রহমান (জগদীশগর সারক সজ্ঞপতি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা, প্রাক্তন এম, পি, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ থেকে শেখ হাসিনা কর্তৃক বহিষ্কৃত)-এর জগদীশগরী বক্তৃতা এবং সেই সারাে অভিযান ও উদ্যোগ সংগঠক শ, য, আওয়ালি এম, পি শেখ হাসিনার মন্ত্রী সভার প্রতিমন্ত্রী) এর সাংগঠনিক সভা এই সব মিলে ১৫ই আগস্টে শেখ মুজিবের কয়ে নিহত হয়ে যাওয়া শেষ মুজিবের জনপ্রিয়তা এবং সংগঠন নতুন ভাগ পেতে থাকে। একমাত্র করিমুর জাহাঙ্গীরনের দত্ততা বিবৃতি এবং আমাদের মীতি ও আদর্শের রাজনৈতিক প্রতিপত্ত এবং কর্মী সৃষ্টি এই মূল্য দিয়ে রাজনীতিবহ এবং দেশে নতুন পোলাবাইয়েশন বা মেরুতরন এক ইংলুহা অকুনিদ আওয়ামী লীগের আত্মপ্রকাশ। আব্দুল মাক্কাক আওয়ামী লীগের চালিকা শক্তি। '৭১-এ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা যা পেয়েছিলাম এবং স্বাধীনতার পর আমরা যা হারিয়েছি, সেই ন্যায়-নীতি



আদর্শ, তথাপি সর্বোপরি মানুষের জন্য মানুষের ভালবাসা, ভোগে নয় ত্যাগেই বৃদ্ধ। দেশ ও মানুষের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি যাওয়া চেষ্টা করার ফিরে আসতে লাগলো।

গ্রেটেল ইভেনে শেষ মুক্তিযুদ্ধের মুহুর্তের পর আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় সম্মেলন হলো। প্রথম সম্মেলনে জহুরা তালুকদারকে আহ্বায়িকা করে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হলো। দ্বিতীয় সম্মেলনে কবীরের আগ্রহ ও জেহাঙ্গীর বিরোধীতা সত্ত্বেও সৈয়দা জাহ্নারা তালুকদারকে বাদ দিয়ে আব্দুল হালেক উকিলকে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও আব্দুর রাজ্জাককে সাধারণ সম্পাদক করা হলে আমতা কিছুটা চিন্তিত হই এই ভেবে যে, হালেক উকিল আদর্শবান ব্যক্তিও নন। হালেক উকিল প্রেন্সিডেন্ট হলেও পার্টির চলিকা শক্তি থেকে যায় সেক্রেটারী আব্দুর রাজ্জাকের হাতেই। এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন এবং যুগ শক্তি উন্নয়নের সম্মেলন হয়। সম্মেলনে আব্বা মেম্বার ছাত্র প্রতিনিধিদের ফকরু-জাহাঙ্গীর প্যানেলের একটি দাবি থাকলেও রাজ্জাক তারপরে কাদের-হুদু প্যানেল করা হয়। ফকরুদুল কাদের (শেখ হাসিনার ন্যূন ও উদীচা প্রতিমর্তী) কে সভাপতি ও বাহাদুর মজনুন দুজকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। পরে জানা যায় হালেক-রাজ্জাক নিজস্বের মধ্যে ভাষাতত্ত্ব করে কাদের-হুদু প্যানেল করে। এতে আমতা যাবা আদর্শের জন্য নিবেদিত প্রাণ ত্যাগ খুবই মর্মান্তিক হই।

বাহাদুর মজনুন দুজ নিজ প্রদ, ও ব্যক্তিগত আচরণ ব্যবহার এর মাধ্যমে নিজেকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মানিয়ে নিতে পারলেও সভাপতি হিসেবে ওয়ায়দুল কাদের কখনই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারা বো দূরের কথা একজন সাধারণ ছাত্রনেতা হিসেবেও দাঁড়াতে পারেনি।

চাকসুর নির্বাচনে দিন দিনকার প্রতিজ্ঞাশ্রুতি করে প্রতিদ্বন্দ্বী ভোট পেয়েছে কামালত বাকরয়ার হওয়ার সামান্য কিছু উপরে। কিন্তু বাহাদুর মজনুন দুজ নির্বাচন ছাত্র সমাজের কাছে একজন শিল্পী কর্মী ছাত্রনেতা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পারেননি।

১৯৭৯ সালে মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিলে, আওয়ামী লীগ সভাপতি নিজ মনের প্রার্থী বা নিজে গণতান্ত্রিক ইচ্ছা ভোট (গজ)-এর নামে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আব্বাউল গনি ওসমানীকে মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানের বিপরীতে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করে। ঐ নির্বাচনে মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল জিয়াউর রহমান মূলতঃ আওয়ামী লীগের প্রার্থী জেনারেল এম, এ, জি ওসমানীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে জনস্বার্থের প্রত্যক্ষ ভোটে দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পরে জানা যায়, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ঐ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলতু, অব্যবহ ও বৈধতা দেওয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সাথে গোপন সলাপবর্ষ ও গোপন-নীতিগত চুক্তিতে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আব্বাউল গনি ওসমানীকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করেছিল।

## রাজনীতিতে শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগে মালেক উকিল এবং ছাত্রলীগে ওয়ারেন্ডেল কাদের এর মতো ছাত্র, আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অন্যায় নিবেদিত কর্মীদের মাঝে ইতালী ও ইন্দু কোরকর সৃষ্টি হয়। এই ইতালী ও কোরকর মধ্যে আব্দুর রাস্তাকের চৌকি ও জুমিলা প্রমুখ সম্মিলিত হয়ে থাকে। এরই মধ্যে আসল '৭৫ পরবর্তী আওয়ামী লীগের তৃতীয় সম্মেলন। এই সম্মেলনকে মাননে রেখে রাজ্যকে এবং তাম্রায়েল উভয় গ্রুপ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দখলের অর্থাৎ সত্তাপতি ও আদর্শবান সম্পাদক পদ দখলের ইন্দু মজিদগোষ্ঠীয়ায় নিগ্র হয়। এই মজিদগোষ্ঠীয়ায় মালেক উকিল রাজ্যকে সঙ্গে থাকলেও তাম্রায়েল গ্রুপ নেতৃত্ব দখলের প্রচেষ্টা কোন প্রকারে ছাড় না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। এতে আওয়ামী লীগ জাতির সম্মুখীন হয়। এমনভাবেই মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি ক্ষুদ্র অংশ আসেই বলা থেকে বেড়িয়ে থিথিল আওয়ামী লীগ তৈরী করেছে। নেতৃত্ব দখলের সজাইয়ের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে দেশের তিতরয়ে বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলা করার জন্য আব্দুর রাস্তাক আওয়ামী লীগের সত্তাপতি পদে শেখ মুজিবের ঘেয়ে শেখ হাসিনাকে এই ভাবে নিতে আসেন যে, শেখ মুজিব পরিবারের এই অধ্যাক্ষনৈতিক মহিলা সব সময়ই তাঁর (আব্দুর রাস্তাকের) মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবেন। শেখ মুজিবের জীবদ্দশায় তাঁর ছেলে শেখ কামাল, ছাত্র শেখ মনি, শেখ সেলিম এবং কখনো কখনো শেখ জামাল রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ বা দাক পরালেও শেখ হাসিনা কখনই রাজনীতির দ্বারে কাছেও ঘেঁষেনি। যদিও সাম্প্রতিক কালে এক সময়ে শেখ হাসিনা ইন্ডন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ডি, পি, ছিলেন বলে প্রচার চালানো হলেও শেখ হাসিনা নিজে কখনই এমন দাবি করেননি। শেখ হাসিনার ডি, পি থাকার প্রচারণা চালানো হলেও কোন কখন বা কোন পালে ডি, পি ছিলেন তা প্রচার করা হয় না। এবং শেখ হাসিনা রাজনীতির কেন্দ্রীয় অধিষ্ঠিত সম্পাদক ছিলেন না—এই তিনি (শেখ হাসিনা) রাজনীতির দ্বার অনুদানেই বলেন।

তাহাজা শেখ হাসিনা মহিলা, অসহায় দেশের বাইরে রয়েছেন। কখনও দেশে এসেও রাজনৈতিক অস্তিত্ব ও অধ্যাক্ষনৈতিক মহিলা হওয়ার কারণেই আব্দুর রাস্তাক থেকেও চাপাবেন, শেখ হাসিনা সেইভাবেই চলবেন। এই কারণে থেকেই আব্দুর রাস্তাক যা শেখ হাসিনাকে আওয়ামী লীগের সত্তাপতি করেন।

অতীতে মালেক উকিলকে আওয়ামী লীগের সত্তাপতি এবং ওয়ারেন্ডেল কাদেরকে ছাত্রলীগের সত্তাপতি করার নগণ্যের সীতি ও আদর্শবান, অসহায় নেতা-কর্মী বাহিনীর আব্দুর রাস্তাকের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে দাট এবং শেখ মুজিবের ঘেয়ে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সত্তাপতি হওয়ার দৃষ্টি বোধ করে।

সেনাবাহিনী এবং জেনারেলেরা রাষ্ট্রনীতিতে যেমাইনি ও অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে থাকে এবং জনগণের উপর অত্যাচার করতে থাকলে আমরা '৭১ ও '৭৫-এর যোদ্ধারা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শক্তির চিত্রা করতে পারি। ছাত্রদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণকালে ছাত্ররা সেনাবাহিনীর চাইতেও শক্তিশালী বাহিনী বলে ধারণা সেওয়া হতো। ছাত্রদের বুঝানো হতো, নশত্র কিন্তু অশিক্ষিত বাহিনী হচ্ছে সেনাবাহিনী। নিরস্ত্র কিন্তু শিক্ষিত বাহিনী হচ্ছে ছাত্রবাহিনী। সেনাবাহিনী বান করে ক্যান্টনমেন্টের ব্যাপকে এবং ছাত্ররা বান করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাখসে।

সেনাবাহিনীর জনগণের বিক্ষোভাচারণ করে এবং জনতার আবেগ পরিণতি করে। ছাত্ররা জনগণের পক্ষাবলম্বন করে এবং জনতার জন্য জীবন দান করে। আগামী দিনে লড়াই হবে, সেই লড়াইয়ে শিক্ষিত ছাত্রবাহিনীর কাছে অশিক্ষিত সেনাবাহিনী পরাজিত হবে।

সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল বলিলুর বহনান এবং অদসর প্রাপ্ত কর্নেল শওকত আলী এই দুই ব্যক্তি আওয়ামী লীগে যোগদান করলে, রেজাউল বাকি, গোলাম মোস্তাফা খান মিরাজ, আব্দুস সালাম পিটু, মরহুম হোসেন্জুল ইসলাম কাজল, মোবারক হোসেন সেলিম এবং আরো কয়েকজন '৭১ ও '৭৫ এর যোদ্ধা মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিশায় কর্নেল শওকত আলীকে মাঝে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সংগঠন করার। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্নেল শওকত আলীকে আহ্বায়ক করে মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ নামে '৭১ ও '৭৫ এর যোদ্ধাদের একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলা হলো। আনাদের দৃষ্টি ক্যান্টনমেন্টের দিকে।

লক্ষ্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট দখল। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হলো। আমরা ছাত্র-সুবকদের আনন্দ সমাজ বিপ্লবে অংশগ্রহণের ও সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের শিক্ষা নিতে থাকলাম। ছাত্র-সুবকদের বলে করে জীবন সেওয়ার জন্য প্ররোচিত করতে লাগলাম। বিপ্লব করতে হলে ব্যক্তি জীবনের ত্যাগবহি স্বীকৃতি হতে পারে। কিন্তু সেই স্বীকৃতি হিসেবে রাখা যাবে না। কেননা, বিপ্লব ব্যক্তিগত স্বল্প-কতির হিসেবে রাখা যাবে না। বিপ্লব ব্যক্তিগত স্বল্প-কতির মধ্যে নিয়ে সাময়িক ফসল এনে দেয়। যা মূলত ভবিষ্যৎ সংশোধনের নিশ্চিত সুখের জীবন এনে দেয়। কার্যক্রমের এই পর্যায়ে আমাদের সাথে যোগ দেয়, '৭৫সালের ওরা নভেম্বর জেনারেল বালেদ মুশারফ-এর বেহুয়ে সংগঠিত বার্ষিক সাময়িক অভ্যর্থানের কতিপয় মুক্তিযোদ্ধা সাময়িক অফিসার। যোগদানকারী সাময়িক অফিসারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লেঃ কর্নেল এ, এইচ, এম, গাফফার খাঁর বিরুদ্ধে ('৭৫-এর ওরা আমাদের ফাঁসি চাই—৬

নভেম্বরের দ্ব্যর্থ অক্টোবরের দ্বায়ে সাময়িক বাহিনী থেকে বরখাস্ত এবং পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি হোনেন মোহাম্মদ একশানের পাণিজা নদী), মেজর নাসির (পত্রিকার কলাম লেখক এবং বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী লুফ্ফর নাজার কতর স্বামী) এবং ক্যাপ্টেন হাফিজুল্লাহ। কর্নেল পাখকার সব সময় ইংরেজিতে রাজনৈতিক ক্লাস নিতেন। এক ক্লাসে তিনি শিকিয়েছিলেন ভোগে ওয়ু সুখ আছে, কিন্তু কৃষ্টি নেই। অ্যাগে সুখ এবং কৃষ্টি দুটোই আছে। '৮১ সালের ১৭ই মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অরাজনৈতিক কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবে দেশে ফিরে এলে আওয়ামী লীগের কর্মী এবং জনতা দিয়ান বন্দরে শেখ হাসিনাকে নজিরাবিহীন সমর্থনা দেয়।

## এই জিয়া সেই জিয়া নয়

শেখ হাসিনার দেশে ফিরে আসার তিন ছয়দিন পরই তাঁর সাথে আমাদের প্রথম বৈঠক হয়। এই বৈঠকে আলোচনার প্রকৃতিই শেখ হাসিনা স্বদেশেতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের বলেন, আল থেকে প্রচার জালাতে হবে যে, এই জিয়া সেই জিয়া নয়।

অর্থাৎ বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক মেজর জিয়াউর রহমান নয়। শেখ হাসিনা হিটলারের তথ্য উপদেশে গোবিন্দেন্দ্র-এর বিউরি অনুসারে বলেন, জোমরা যদি ভাগভাগে প্রচার করতে পারে, এই জিয়া স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া নয়, তাহলে নেতবে একদিন মানুষ এটাই বিশ্বাস করবে।

আমাদের মাঝ থেকে একজন প্রশ্ন করলো, তাহলে এই জিয়াকে কোন্ জিয়া বলবো?

শেখ হাসিনা বললেন, স্তম্ভ করার সবকিছু নেই, ওয়ু বলবে এই জিয়া যেই জিয়া নয়।

এই কথা শুনে আমরা সবাই বিবৃত হলাম এবং নিজেদের মধ্যে বিস্ময় ও হৃদয়হাসি করলাম। কিন্তু আমরা কেউ কোন দিন শেখ হাসিনার এ শিলা "এই জিয়া সেই জিয়া নয়" প্রচার করলাম না।

## রাষ্ট্রপতি জিয়া বত্যা

'৮১ সালের ২৩শে এবং ২৪শে মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি, এল, সির তিন তলায় নেতিনার কক্ষে '৭১' ও '৭২-এর যোদ্ধাদের এবং সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের গোপন ও প্রকৃত বৈঠক করে। এই বৈঠকে কর্নেল শওকত আলী (বর্তমানে আওয়ামী লীগের এম, পি, আগরতলা সড়কস্থ মানলায় আওয়ামী)



মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান বীর উত্তমকে হত্যার পরিকল্পনা এবং হত্যাকাশীন ও হত্যা পরবর্তী সময়ে করণীয় সম্পর্কে অবহিত করেন। কর্নেল শওকত আলী বলেন, জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে গেলে চট্টগ্রামের জি. ও. সি নেতর জেনারেল মজুমদার বীর উত্তম-এর নেতৃত্বে জিয়াকে হত্যা করা হবে এবং এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে নভানেট্রী শেখ হাসিনা অবহিত আছেন। সভানেত্রী আমাদেরকে এই হত্যাকাণ্ডে সহায়তা ও ভূমিকা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা মাত্র কয়েক দিন হলো দেশে এসেছেন, এর মধ্যেই তিনি এমন একটি নির্দেশ কিভাবে নিতে পারেন? প্রশ্ন করা হলে কর্নেল শওকত আলী বলেন, শেখ হাসিনা দেশের বাইরে (ভারত) থাকতেই এ বিষয়ে অবহিত আছেন। কর্নেল শওকত আলী জিয়া হত্যাকাণ্ডে ও হত্যা পরবর্তী সময়ে আমাদের করণীয় সম্পর্কে বলেন যে, হত্যাকাণ্ডের সময় আমাদের চট্টগ্রাম ও ঢাকায় থাকতে হবে। আমাদের যারা চট্টগ্রাম থাকবে তাদের দায়িত্ব হবে জেনারেল মজুমদার-এর কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে ঢাকায় চলে আসা এবং ঢাকায় যারা থাকবে তাদের দায়িত্ব হবে চট্টগ্রাম থেকে আসা অস্ত্র নিয়ে ঢাকায় রেডিও টেলিভিশনসহ অন্যান্য ভক্তবৃন্দপূর্ণ স্থানে নিষ্কাশন প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের মধ্যে একজনকে তবে নাগান এই হত্যাকাণ্ড হতে পারে প্রশ্ন করায় কর্নেল শওকত বলেন, এখন থেকে যে কোন সময় হতে পারে। যখনই জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে যাবেন তখনই তাকে হত্যা করা হবে। কর্নেল শওকত আরো বলেন, জিয়া হত্যা সংগঠন পর্যন্ত সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ. এম. এরশাদসহ অন্যান্য জেনারেলগণ এবং রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান-এর শর্ত রেজিমেন্টেও কর্নেল মাহবুবুর রহমান অফিসারের নেতা জেনারেল মজুমদার সাথে থাকবেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে জিয়া হত্যা সংগঠিত হয়ে যাবে সেই মুহূর্ত থেকে এটা বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং বন্ধু বন্ধ হবে। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে থাকবে পাকিস্তান প্রত্যাগস্ত (রিপ্রেজেন্ট) অফিসার ও জোয়ানসহ ঢাকায় জেনারেলগণ। অন্যদিকে জেনারেল মজুমদার নেতৃত্বে থাকবে চট্টগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসার ও জোয়ানরা। জিয়া হত্যার পর জেনারেল এরশাদের আনুগত্যশীল সেনাবাহিনী এবং জেনারেল মজুমদারের আনুগত্যশীল সেনাবাহিনীর লড়াই হবে, যুদ্ধ হবে। এই যুদ্ধে উভয় ঐশ্ব্যেরই ক্ষতি হবে এবং একটি ঐশ্ব্যকে পরাজিত ও ধ্বংস করে অপর ঐশ্ব্যটি বিজয়ী হলেও বুঝেই দুর্বল থাকবে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা ঐ বিজয়ী দুর্বল ঐশ্ব্যকে আক্রমণ করে পরাজিত করবো। এই হচ্ছে আমাদের হত্যা ও হত্যা পরবর্তী করণীয়।

এই ভক্তবৃন্দ গোপন বৈঠকে ওয়াশিংটন-এ সামরিক অফিসারসহ কর্নেল গাম্ভার, মেজর নাসির, ক্যান্টন হাফিজ এবং আরো কয়েকজন সনস



সহ গ্রাম সত্তর পঁচাত্তর জন মোকাদ্দা উপস্থিত ছিল। বৈঠকে আমাদেরকে প্রথমত ৩টি গ্রুপে ভাগ করা হয়। একটি গ্রুপকে চট্টগ্রাম যোরে জেনারেল মজুমদার কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে আনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ত্রিশ-পঁয়ত্ৰিশ মনসোবর দ্বিতীয় গ্রুপকে সাতা বৈশ বকর করে জিয়া বিক্রোদী মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছানো ও যে কোন মুহুর্তে যে কোন পরনের এ্যাকশনে যাকার জন্য প্ররোচিত করতে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাকি সবাইকে তৃতীয় গ্রুপ হিসেবে চমিশ মনটা প্ররোচিত করে ঢাকায় রাখা হয়।

মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম পৌঁছলে, জেনারেল মজুমদার বেড়বে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের কিছু সংখ্যক সেনা অফিসার অধ্যুযান করে ওতশে নে মতুবে চট্টগ্রাম সাকিট হাউসে অতি সহজে, বলা যায় বিনা বাধায় মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যা করতে পারলেও সেনাবাহিনীর সাধারণ জোমান ও জনগণ এই হত্যাকার প্রত্যাখান করে।

জেনারেল মজুমদার বীর উত্তম এর আনুগত্যশীল অফিসারগণ চট্টগ্রাম বেতার ও টেলিভিশন দখলে ও নিয়ন্ত্রণে রাখে। এদিকে ঢাকায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ, জেনারেল মীর শওকত বীর উত্তম, জেনারেল রহমানসহ সকল অফিসার ও জোয়ানেরা জেনারেল মজুমদার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

জেনারেল মজুমদারকে মোকাবেলা করার জন্য সুদীপ্তা ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের জি ও সি ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসানকে এক ব্রিগেড সৈন্যসহ চট্টগ্রামের নিকে পাঠান হয়। ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসান চট্টগ্রাম সড়কের ততপুর ব্রিজের ঢাকা পাড়ে অবস্থান নেয়। এবং ততপুর ব্রিজের চট্টগ্রাম পাড়ে ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসানকে মোকাবেলা করার জন্য জেনারেল মজুমদার প্রতি আনুগত্যশীল ক্যান্টন মোস্তা মোহাম্মদ তার সৈন্যসহ অবস্থান নেয়। অন্য দিকে ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার প্রতিবাদে এবং জেনারেল মজুমদার বিরুদ্ধে জনগণ ব্যাপক বিকোত্ত, মিছিল, মিটিং সমাবেশ করলেও উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার জিয়া হত্যার সংবাদ শোনামাত্র গ্রাপডরে ঢাকা সন্নিবিষ্ট সামরিক হাসপাতালে (বি. এম. এইচ)-এ “রোগি সিহিয়াস কারো সাথে দেখা হবে না” ঘোষণা দিয়ে ভর্তি হন। পরে জিয়াউর রহমানের প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান এবং ঘোষণাঘোষণা মন্ত্রী আব্দুল আলীম সি. এম. এইচ-এ গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি সাত্তারকে বলেন, সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদ বলেছেন আপনি এখন রাষ্ট্রপতি।

অতি উত্তরে উপ-রাষ্ট্রপতি সাত্তার বলেন, আগে সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদকে আনেন।

ভারপর সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতার উপ-  
 রূপে পতি সাক্ষর অস্থায়ী রূপে পতি হন। নৃশাত সেনাবাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে  
 তত্পর প্রিন্সে পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থান নিলেও এবং ভাইয়ে ভাইয়ে  
 রক্তপাতের ও জীবননাশের অবস্থা সৃষ্টি হলেও কার্যকর জেনারেল মজুর চট্টগ্রাম  
 ক্যান্টনমেন্টের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। ফলে আমাদেরকে আর নরবরাদ্দ  
 দেওয়াও কোন প্রশ্নই ওঠে না। সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিক জেনারেলের  
 মুক্তিযোদ্ধা রূপে পতি জিয়াউর রহমান হত্যার সমর্থন করে না, এবং জি ও সি  
 জেনারেল মজুরের প্রতি আনুগত্য পরোক্ষভাবে অস্বীকার করে। জেনারেল  
 মজুরের পক্ষে তত্পর প্রিন্সে আসা ক্যান্টন দোস্ত মোহাম্মদ এর সৈন্যরা, প্রীত্যে  
 অপর পারে প্রিন্সেজিয়ার বাহাদুরুল হাসানের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে  
 অস্বীকার করে। ননকমিশন অফিসার এবং সিপাহিরা ক্যান্টন দোস্ত মোহাম্মদকে  
 নবাসরি পরিকার বলে দেয়, জেনারেল মজুর প্রিন্সেজিট ঘিরাকে হত্যা করেছে।  
 এখন জেনারেল মজুর নিয়ে প্রিন্সেজিট হবে। আমরা সুবেদার, বাবিলদার,  
 সিপাহিরা যা আছে তাই থাকবে। আমরা নিজেদের নিজেদের জীবন নিব না।  
 আপনারা অফিসারেরা অফিসারেরা যুদ্ধ করেন। আমরা যুদ্ধ করবো না।

তখন ক্যান্টন দোস্ত মোহাম্মদ অবস্থা বেশতিক সেনা প্রিন্সেজিয়ার বাহাদুরুল  
 হাসানের কাছে আত্মসমর্পনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং আত্মসমর্পন করে। জেনারেল  
 মজুর বীর উত্তম চট্টগ্রাম বেতার ও টেলিভিশনে ভাষণ দিতে এবং সাংবাদিক,  
 গণমান্য ব্যক্তি ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আলোচনা করতে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে  
 এলে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট তার সম্পূর্ণ হস্তগত হয়ে যায়। সেনাবাহিনীর  
 বিশেষত নন কমিশন এবং জেনারেলের মুক্তিযোদ্ধা রূপে পতি জিয়াউর রহমানের  
 প্রতি এতই আনুগত্যশীল ছিল যে, সুযোগ পাতলা মাত্র মুহুর্তের মধ্যেই তারা  
 জেনারেল মজুর বীর উত্তম এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে জেনারেল মজুর ও  
 তার প্রতি আনুগত্যশীল অফিসারেরা আর ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যেতে ভো  
 পারেইনি বরং পালিয়ে যেতেও পারেনি। পালিয়ে যাওয়ার সময় নৃশাত অস্থায়ী  
 রূপে পতি আহুদ সাক্ষর সরকারের প্রতি আনুগত্যশীল কিন্তু প্রকৃত অর্থে  
 মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের প্রতি আনুগত্যশীল সৈন্যদের আক্রমণে মজুর  
 সমর্থিত করেকজন অফিসার হতাহত হলেও মেজর পালেদ ও মেজর হুজাকফর  
 পালিয়ে ভারত সীমান্তের দিকে না গিয়ে ঢাকা আসতে সমর্থ হয় এবং কর্বেল  
 শওকত আলীর সেলটাবে (আশ্রয়ে) থাকে। অন্যদিকে জেনারেল মজুর বীর  
 উত্তমসহ তার আরো করেকজন অনুগামী অফিসার জিয়া সৈনিকদের হাতে  
 হেজার হলে, জিয়াউর রহমান হত্যার নিরাপদ দূরত্ব থেকে জড়িত তৎকালীন  
 সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ প্রত্যেককৃত জেনারেল মজুরকে

সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করান। জেনারেল এরশাদ দ্বিগুণ হত্যার আশ নব্বুইটা ঘাতে  
 একশ না হয়ে পড়ে সেই জন্য জেনারেল মণ্ডুর বীর উত্তমকে প্রেরণ হত্যার  
 সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করান।

জেনারেল মণ্ডুর আশ্রয়দেয় ভয়ে দ্বিগুণ হত্যার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা হলে  
 আশ্রয়দেয় সাক্ষীরা সাক্ষ্য করে এসে মেজর খালেদ ও মেজর মুজাফ্ফরকে  
 রাজশাহী শীমান্ত নিয়ে ভারতের মুর্শিদাবাদ পৌঁছে দেয়। মুক্তিযোদ্ধা রট্রিপতি  
 জিয়াউর রহমান হত্যার অভিযোগ এবং প্রেরণকৃত জেনারেল মণ্ডুরের শাসী বাবজান  
 মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারের পোশাক সামরিক আনকড (কোর্ট মার্শাল) এ  
 বিচার শুরু হলে কর্নেল শওকতের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা সংগঠিত পরিষদ মেজর  
 জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন পরিষদ এবং মুক্তিযুদ্ধের তেপুটি নেটের  
 কমান্ডার লেফটেনেন্ট কাজী মুকজ্জামানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন এই তিনটি  
 মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন এই বিচারের বিরুদ্ধে এবং প্রেরণকৃত মুক্তিযোদ্ধা সামরিক  
 অফিসারদের মুক্তির দাবীতে আন্দোলনের ডাক দেয়। উল্লেখিত তিনটি  
 মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন ঢাকার বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ ইত্যাদি কর্মসূচি চালিয়ে  
 যেতে থাকে এবং এই সকল কর্মসূচীতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক  
 দলসমূহের সমর্থন ও অংশগ্রহণের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। কিন্তু  
 একদমাত্র আশুর আশ্রয় হত্যা অন্য কোন রাজনৈতিক নেতাকে এই সময় পাওয়া  
 যায়নি। মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারদের মুক্তির জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের আন্দোলন  
 নব্বুও মুক্তিযোদ্ধা রট্রিপতি জিয়াউর রহমান হত্যার অভিযোগে সামরিক  
 আদালতের গোপন বিচারে ব্যবহৃত মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারের মনসিতে  
 দুত্বাভিত্তক কার্যকর হওয়া। এদিকে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ. এম.  
 এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী রট্রিপতি আফস সাতার নতুন  
 রট্রিপতি নির্বাচন দোকলা করেন এবং তিনি নিজে প্রার্থী হন।

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনা অস্থায়ী রট্রিপতি বিচারপতি  
 আফস সাতারের বিপরীতে ডঃ কামাল হোসেনকে রট্রিপতি প্রার্থী করে নির্বাচনে  
 অংশগ্রহণ করেও নির্বাচনের জারি পিছানোর দাবী করতে থাকেন। কিন্তু  
 সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদ সমর্থিত বিচারপতি সাতার সরকার আওয়ামী লীগের  
 নির্বাচন পিছানোর দাবী অগ্রাহ্য করে। '৮১ সালের এই রট্রিপতি নির্বাচনে  
 বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নব্বুইতে বেলি সংঘাত ব্যক্তি রট্রিপতি প্রার্থী হলে  
 সরকারী ঘোষণা সংস্থা এন. এস. আই (দ্যাশনাল নিউজিউরিটি ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড  
 জার্ডিফিকেশন অথরিটি) এর কর্মকর্তারা রট্রিপতি প্রার্থীদের মোটা অংকের  
 খুঁজিয়ে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করায়। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা  
 যে কোন একজন রট্রিপতি প্রার্থীকে হত্যা করে তাদের নির্বাচন পিছানোর দাবী

স্বাভাবায়িত করার যোগ্য নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, এক গ্রাধী খুন হলে নির্বাচনী আইন অনুযায়ী ঐ নির্বাচন তিন মাসের জন্য স্থগিত হয়ে যাবে। গ্রাধী হত্যার শেষ হাসিনার যোগ্য নির্দেশ স্বাভাবায়িত না হওয়ায় এবং সাক্ষার সবকণ্ঠ আওয়ামী লীগের নির্বাচন শিথিলের দাবি মেনে না নেওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় এবং সেই নির্বাচনে সেনাবাহিনী সমর্থিত বি. এন. সি. গ্রাধী বৃদ্ধ বিচারপতি আব্দুল সাত্তার বিপুল ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ গ্রাধী ডাঃ আমাল হোসেনকে পরাজিত করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

বিচারপতি সাত্তার রাষ্ট্রপতি হলেও দুলত ক্ষমতা থেকে যায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের হাতে। জেনারেল এরশাদ যখন ফেডারে খুশি সেইভাবেই রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে পরিত্যক্তা করতে থাকেন। প্রকৃত অর্থে ক্ষমতাবেন ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুল সাত্তার হয়ে যান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদের নাচের শুল্ক।

## নেদানন ট্রেনিং

১৯৭৩ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করার পর যারা কানের নিমিত্তী (বালা নিমিত্তী)র সঙ্গে মিলে ঐ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মুক্ত করেছিল, তাদের ক্ষমাকল্পন ১৯৮২ইং সালের জানুয়ারী মাসের এখন সভ্যত্বে ধানমন্ডি ৩২ মাঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (ঢাকা সেনানিবাস) দখল করার একটা প্রস্তাব ও পরিকল্পনা জানালে শেখ হাসিনা উক্ত প্রস্তাব ও পরিকল্পনা সামনে গ্রহণ করেন। পরিকল্পনাটা থাকে এই রকম যে, রাজনৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমাধ্যম এবং কমিটের পঠিন তিরিশ হাজার যুবককে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে মৃত্যুর জন্য প্ররোচিত করে, নির্দিষ্ট একটি দিনে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে কমান্ডো হামলা করে দখলে নিয়ে নেওয়া। আর ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট দখল করে নেওয়া মানেই সাপোর্টসের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে ফেলা। শেখ হাসিনা সর্বশক্তি দিয়ে এই পরিকল্পনা স্বাভাবায়িত করার নির্দেশ দিলেন এবং তার নিজের (শেখ হাসিনার) পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা এবং নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন।

তক হলো ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট দখল করার জন্য রাজনৈতিক কর্মী তৈরি করা এবং সাথে সাথে এই কর্মীদের কোথায় সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় সেই স্থান খুঁজে বের করা। কর্মী সংগ্রহের জন্য সারা দেশে গোপনে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শুরু হলো। এই কর্মীদের বন-মানসিকতা ও ব্যাল-ধারনা এবং ব্যক্তিগত ওগাবনী প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হলো। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বড় ধরনের একটা কর্মী বাহিনী তৈরি করা গেল। এই কর্মী বাহিনীর মধ্যে থেকে



তাত্ত্বিক শিক্ষা দিয়ে বাছাই করে একটি ব্যাচ তৈরি করা হলো সামরিক শিক্ষার জন্য। অর্থাৎ মিলেটারী (আর্মি) ট্রেনিং-এর জন্য প্রথম ব্যাচ তৈরি করা হলো। কিন্তু সমস্যা হলো সামরিক শিক্ষা দেওয়ার জায়গা এবং অগ্র কেম্পায় পাওয়া যাচ্ছে? তাত্ত্বিক শিক্ষা দেওয়া ছাড়া সহস্র সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া অসম্ভব নয়। সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন একটি নিরাপদ মুক্ত এলাকা। যে এলাকায় প্রশিক্ষণার্থীরা নিরাপদে অগ্র চালনার মাধ্যমে অস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করবে। '৭১' নাগে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা ভারতীয় এলাকা নিরাপদে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করেছিলাম। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। যার ফলস্বরূপ কয়েক আশে ভারত ভারত মাটি থেকে কালের সিঁদুরীত বাহিনীকে বাড়িয়ে দিয়েছে। সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের মাটি ব্যবহারের কোনই সম্ভাবনা নেই। বাংলাদেশের মুক্তকণ এবং হিমট্রাটও সামরিক শিক্ষার জন্য মোটেই নিরাপদ নয়। আন্তর্জাতিক সুনিয়াম আমাদের কোন কিছু নেই। আকাশনিয়ন্ত্রণ কটর সৌরভাসীনের নিয়ন্ত্রণে। শেনালেও আমাদের কোন জায়গা নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) এর কোনই সাড়া শব্দ নেই। এমনত অবস্থায় চিন্তা করতে করতে লেফটেন্যান্ট এবং পি এল ও (পেসিটাইন লিবারেশন অরগানাইজেশন) এর কথা বিবেচনায় এনে বেল। শোপন যোগাযোগ করা হলো পি, এল, ওর ঢাকা হু প্রতিনিধি আহমেদ এ, রাজেক এর সাথে। পি, এল, ওর ঢাকার তলশান এয়াসিতে পি, এল, ও প্রতিনিধি আহমেদ এ, রাজেকের সাথে যোগাযোগ করে কয়েক ঘণ্টা বৈঠক হলো। আহমেদ এ, রাজেককে বোলাবুলি করা হলো আমরা সামরিক প্রশিক্ষণ চাই বিনিময়ে তোমরা যা চাও আমরা দেব। আহমেদ এ, রাজেক অসম্ভাবিক সময় চাইলো।

আসপাসেক পর আহমেদ এ রাজেক এর সাথে আবার বৈঠক হলো। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো পি, এল, ও আমাদেরকে লেফটেন্যান্ট মাটিতে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে নিবে। বিনিময়ে আমাদেরকে পি, এল, ওর পক্ষে ইসরাইলীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আমরা সন্মত হলাম। আমাদের প্রথম ব্যাচ লেফটেন্যান্ট গেলো তাদের প্রশিক্ষণ নিয়ে ইসরাইলের বিরুদ্ধে পি, এল, ওর পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য নয়ানতী স্থপাঙ্কনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। প্রথম ব্যাচ যুদ্ধ করতে থাকবে, দ্বিতীয় ব্যাচ লেফটেন্যান্ট যাবে। দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষে ওয়াশিংটন নিয়ে যুদ্ধ করতে শুরু করলে প্রথম ব্যাচ বাংলাদেশে ফেরত দেবে। অর্থাৎ আমাদের একটি ব্যাচকে সব সময়ই পি, এল, ওর হাতে যুদ্ধ করতে হবে।

আমাদের বিমানে কটর লেফটেন্যান্ট নিয়ে যাওয়া এবং ঢাকার নিজে আসার দায় পি, এল, ও বহন করবে। আমাদের যাত্রা যুদ্ধ করতে তাদের পি, এল, ও বৈঠক দেবে।

সময়ে সময়ে সকল বিষয়ে বহুবলু শেখ মুজিব কন্যা জননেত্রী শেখ হানিফাকে জামানো হলো এবং তার পরামর্শ নেওয়া হলো। পি, এল, ওর সাথে নৈটকের দিকান্ত অনুযায়ী প্রথম ব্যাককে '৮২ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে লেভানন পার্টিয়ে নেওয়া হলো।

প্রথম ব্যাচ সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে ইসরাইল সীমান্তে গিয়ে পি, এল, ওর পাশে বৃদ্ধ করতে লাগলো। এদিকে দ্বিতীয় ব্যাচ লেবানন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। এমন সময় ইসরাইল আক্রমণ করে লেবাননই দখল করে নিল। আনাদের সকল যোদ্ধা ইসরাইলীদের হাতে বন্দি হলো। আনাদের সব পরিকল্পনা ও কর্মসূচী ভেঙে পেল। আমাদের যোদ্ধাদের বা-বাপা আত্মীয়স্বজন সবাই তারা কাটি তরু করলো। মুজিব কন্যা শেখ হানিফা বেমাধুস সব ছুলে গেলেন। নিশেফ নীরব থাকলেন। আমাদের ছেলোদের ব্যাপারে কোনদিন আর কোন কথা বললেন না। অতঃপর অতি কঠোর পাকিস্তান রেকর্ডস-এর মাধ্যমে ইসরাইলের হাতে বন্দি আনাদের যোদ্ধাদের দেশে ফিরিয়ে আনা হলো।

## এরশাদকে ক্ষমতা গ্রহণের আমন্ত্রণ

এদিকে 'আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বহুবলু কন্যা শেখ হানিফা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ, এম এরশাদকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পূর্ণাঙ্গ আমন্ত্রণ জানানো থাকেন।

জননেত্রী শেখ হানিফা জনগণের পক্ষ থেকে জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে সর্বশক্তির সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দিতে থাকেন। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ও সরকার উৎসাহিত করে সামরিক বাহিনীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার ব্যাপারে জেনারেল এরশাদ এবং বহুবলু কন্যা শেখ হানিফার চার-পাঁচ দফা গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

অতঃপর জেনারেল এরশাদ সামরিক অভ্যুত্থানের ইতিহাসে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ক্ষমতা দখলের অনেক আগেই ঢাকা সেনানিবাসে সনোদ পত্রের সম্পাদকের বৈঠক থেকে সামরিক অভ্যুত্থানের ঘোষণা দেন।

'৮২ সালের মার্চের ২৪ তারিখ জেনারেল এরশাদ কিনা বাধ্যতাবিনা বাক্যে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুল নাজরকে রাষ্ট্রপতি ভবন বঙ্গভবন থেকে গুলি খস্কা দিয়ে বের করে দেন-একই পক্ষের দিন আবার ফলার ধরে নিয়ে এসে রেডিও টেলিভিশনে নিজের ঘোষণা ও তার সরকারের দুর্নীতি স্বত্বনষ্টীতি ইত্যাদি কারণে সেস্বার সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে তিনি (রাষ্ট্রপতি নাজর) বিদায় নিলেন এ মর্মে জাখণ নিতে বাধ্য করে। অশিতিঃপর বৃদ্ধ অর্থনৈতিক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুল নাজর প্রাপ্তকরে কাপুকদের মতো দিতবে বিশেষে প্রাণ নিয়ে বিদায় নিলেন। সেনাবাহিনী প্রধান

শেখ জেঃ জেঃ মোঃ এরশাদ দেশে সামরিক আইন জাতি করলেন এবং তিনি স্বয়ং হলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও বিচারপতি এ, এক, এম, হাসানউল্লা চৌধুরীকে করলেন কমডাফিহীন নামমাত্র রাষ্ট্রপতি। শেখ হাসিনার গোপন আদৃত্রয়ে ৩৬ সহযোগিতায় জেনারেল এরশাদ সর্বময় কমতার মালিক হয়ে জগদ্বন্দ্বল পাখবের নাম জনগণের বুকে ঢেপে বসলো।

## ১৬শ মধ্য খেতাবী হাত হত্যা

বহর না ঘুরতেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এরশাদ আর বহুবহু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার গোপন আতাততর মাঝে গোপন বিরোধ সৃষ্টি হলো। ১৯৮৩ সালের জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে শেখ হাসিনার সান্নী ডঃ ওয়াশেম আলী নিয়ার মহাশয়িহু আপনিক শক্তি কমিশনের সর্বস্বামী বানতবনে শেখ হাসিনা বলেন, শেখ জেঃ এরশাদ হাতের মুঠোয় আর থাকতে চাচ্ছে না। আমার হাতের মুঠো থেকে খাটাসটা ক্রমশ বেরিয়ে যাচ্ছে। তাকে হাতের মুঠোয় পোক করে আটকে রাখা সরকার।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এরশাদকে হাতের মুঠোয় রাখার জন্য শেখ হাসিনা নামকন ওয়াশে কুয়া এক ছাত্র আন্দোলনের পরিকল্পনা হাজির করে বলেন, এই ছাত্র আন্দোলনে অবশ্যই ছাত্র নিহত হতে হবে। যে কবেই ছোক ছাত্র আন্দোলনের নামে ছাত্র হত্যা হতেই হবে।

ছাত্র হত্যা হলে ছাত্র আন্দোলন চালা হবে। আর ছাত্র আন্দোলন চালা থাকলেই কেনল সি, এম, এস, এ জেনারেল এরশাদকে হাতের মুঠোয় শক্ত ভাবে রাখা যাবে। শেখ হাসিনা ছাত্র আন্দোলনের নামে ছাত্র হত্যার কঠিন নির্দেশ ও পরিকল্পনা দিলেন। কোন আতাততরী বা অজাত বাতকের হাতে ছাত্র হত্যা হলে কাজ হবে না। ছাত্র হত্যা হতে হবে সামরিক শাসক এরশাদের মিলেটারী অথবা পুলিশের হাতে।

বহুবহু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, টাকস মা-ই লাওক, এটা করতেই হবে। কিভাবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা যায় সবাই এ নিয়ে খুব ব্যস্ত এবং চিন্তিত।

যোগাযোগ হলো প্যাক্স মিলেটারী ট্রুপস আর পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার (সিনিয়র এস, সি) হাকিমুর রহমান লকবের সঙ্গে। এই হাকিমুর রহমান লকব পুলিশের অফিসার হয়েও দীর্ঘদিন যাবত এম, এস, আই (ন্যাশনাল সিভিউরিটি ইন্টিগ্রেটেড না রট্রীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা) এর ডেপুটি ডাইরেক্টর পদে ঘাপটি মেয়ে বসে ছিলেন। এরশাদ কমতার এসেই হাকিমুর রহমান লকবকে এই বসে এম, এস, আই থেকে বোটিয়ে বিদায় করেছেন যে, তুমি পুলিশের লোক হয়ে

এখানে কি কর? যাত্রা পুলিশের গোপালগড়ে রাতারা চোর ধর। বড়লই এন এস আই-এর তেপুটি জাইনেকটারের লস থেকে হাকিজুর রহমান লকরকে সোজা আর্ম পুলিশের তৎকালীন হেডকোয়ার্টার ১৪নং মিরপুরে কোম্পানী কমান্ডার পদে বদলী করে পাঠিয়ে দেয়। এই কারণে আর্ম পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার (পুলিশের সিনিয়র এস. পি.) হাকিজুর রহমান লকর জেনারেল এরশাদ ও তার সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে খুবই চট্টা ও বৈরী ছিলেন। এর উপর ছিল নগদ অর্থের টোপ। এরশাদের প্রতি জঘন্যর ক্ষেপা ও বিরোধভাজন এবং নগদ অর্থের টোপ দুইয়ে মিলে, ছাত্র আন্দোলনের নামে ছাত্র হত্যার প্রস্তাব আসা জাত মসে মসে হাকিজুর রহমান লকর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এন, এস, আই-এর মূলত কাজ হচ্ছে কারা নরকারের বিরুদ্ধাচারণ করে তাদের শিষ্ট বা ভালিকা তৈরি করে সরকারকে নরকরাই করা। এবং নরকারের পতন হলে, মসে মসে পতন হয়ে যাওয়া নরকারের আমলে তৈরি করা সমস্ত নথি-পত্র পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলে নতুন সাদা ফাইল নিয়ে নতুন সরকারের কাছে হাঞ্জির হওয়া।

৩০শে মে '৮১ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হলে এন, এস, আই-এর কর্মকর্তাগণ জিয়া বা বি, এন, পি. সরকারের আমলে তৈরি করা সমস্ত নথি-পত্র পুড়িয়ে ফেলতে যায়। কিন্তু ওই মুহূর্তে নথি-পত্রে অস্বিসংযোগ করতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে উপরত্রেপতি বিচারপতি সাত্তার অস্থায়ী রত্নপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। অর্থাৎ বি, এন, পি. সরকারই টিকে যায়। ফলে এন, এস, আই কর্মকর্তাগণ নথি-পত্র পুড়িয়ে না ফেলে আবার তা সংগ্রহশালায় হস্ত করে ফেলে রাখেন। উপ-রত্নপতি সাত্তার অস্থায়ী রত্নপতি হলেও মূলত ক্ষমতা চলে যায় সেনাবাহিনী প্রধান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের হাতে। সেই সুবাদে জেনারেল এরশাদ বিচারপতি সাত্তারকে অস্থায়ী রত্নপতি পদে রেখে এন, এস, আই-এর নথি-পত্রগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নেবে। এন, এস, আই-এর নথিপত্রে জিয়াউর রহমান বা বি, এন, পি. সরকারের বিরুদ্ধাচারণকারীদের ভালিকার জেনারেল এরশাদ-এর নামও ছিল। ফলে জেনারেল এরশাদ ক্ষতায় এসেই প্রথমেই এন, এস, আই থেকে হাকিজুর রহমান লকরদের খেটিয়ে বিদায় করে। আর সেই কারণেই এবং নগদ অর্থের বিনিময়ে হাকিজুর রহমান লকর গং জেনারেল এরশাদ ও তার সামরিক শাসনের পতনের যে কোন প্রস্তাব বা গজিয়ার সাক্ষি হন।

আর্ম পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার হাকিজুর রহমান লকরের সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের নামে ছাত্র হত্যার নীলনক্সা চূড়ান্ত হয়। নীল নক্সা অনুযায়ী যে কোন প্রকারে কোন বকমে ছাত্রদের একটা মিছিল বাংলা একাডেমির দক্ষিণে, কার্জন হলের উত্তরে শিত একাডেমির পশ্চিমে সোয়েল চকুর পর্যন্ত নিয়ে আসলেই হবে। বাকি কাজ আর্ম পুলিশ-সেরে ফেলবে। অর্থাৎ আমাদের দায়িত্ব ছাত্রদের একটা



মিছিল দোয়েল চত্বর পর্যন্ত নিয়ে আসা, তারপর সেই মিছিলের উপর তলি চালিয়ে ছাত্র হত্যার দায়িত্ব আর পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার হাফিজুর রহমান লকরের। এই নীলনগা অনুযায়ী মিছিল নিয়ে আসার প্রথমিক দায়িত্ব পড়ে জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের জি-এস কানোয়ায়া বাহিনীর সদস্য নিরঞ্জন সরকার দাকু, সাধন সরকার, হাদব, বিদ্যুৎ, শ্যামল, শ্রমুখ এর উপর।

জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে একটা মিছিল করার প্রত্যাবর্তন নিয়ে ছাত্রনেতা কজুর রহমান, বাহাদুল মজনুন চুয়, ডাঃ মোরতিকা মহিউদ্দিন জালাল, ষ, ই আব্বাস, ডাক্তার তলি আক্তারজামান, জি এস জিয়াউররহমান, ফারুক, আনোয়ার, মিলন, জালাল শ্রমুখ ছাত্র নেতাদের সাথে আলোচনা করা হলে সকলেই মিছিলের পক্ষে মত দেন।

ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের পঞ্চমই মিছিলের তারিখ নির্ধারণ হলো এবং মিছিল শিফা ভবন পর্যন্ত যাওয়াও সিদ্ধান্ত হলো। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কথা ভবন থেকে ছাত্র মিছিল শুরু হলো। এদিকে শিব একাডেমীর কাছে আর্ম পুলিশ নিয়ে মিছিলে তলি করে ছাত্র হত্যার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে হাফিজুর রহমান লকর চাকক পানির ন্যায় অশেষতা করতে থাকলো।

কিন্তু কিছুতেই মিছিলকে কলা ভবনের আশপাশেই বাইরে নেওয়া গেল না। অধিকাংশ ছাত্রনেতা মিছিল নিয়ে এদিকে যেতে হুখে অস্বীকার না করলেও, কার্যত মিছিল নিয়ে কেউ কলা ভবনের বাইরে গেল না। ফলে নীলনগা ভেঙে যাওয়ায় আমরা উদ্বেজিত হয়ে ছাত্রনেতাদের সাহিত্য করলাম এবং কোন কোন ছাত্রনেতাকে শারীরিক ভাবে আঘাতও করলাম। আঘাত ছাত্র মিছিলের মতুন তারিখ নির্ধারিত হলো।

আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩, ১লা কালভন ছাত্র মিছিল হবে এবং মিছিল শিফা ভবন অতিক্রমে যাওয়াও সিদ্ধান্ত হলো।

১২ই ফেব্রুয়ারী '৮৩, সকাল ৮টায় ১৪নং মীরপুর আর্ম পুলিশের হেড কোয়ার্টারে এন, এস, আই-এর সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা পুলিশের নিয়মিত এস, পি আর্ম পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার হাফিজুর রহমান লকরকে আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী ছাত্র মিছিলের হুঁড়াত কর্মসূচী অবহিত করা হলো এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারী রাত আটটায় হাফিজুর রহমান লকর-এর মীরপুর দুই নম্বরের বাসায় আগরীকাল ১৪ই ফেব্রুয়ারী সকাল দশটায় সে কোন কিছুর নিয়মিত ছাত্র মিছিল শিব একাডেমী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার কর্মসূচী সিদ্ধান্ত করা হলো এবং নগদ অর্থ প্রদান করা হলে তিনিও (হাফিজুর রহমান লকর) ছাত্র হত্যার জন্য প্রস্তুত বলে হুঁড়াতভাবে জানান।

রাত এগারোটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের এ্যাসেমবলী বিডিং-এ জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক '৭৫-এর কানোয়ায়া বাহিনীর সদস্য

ছাত্রনেতা নিরঞ্জন সরকার বাবুর ভ্রমে সর্বশেষ গোপাল বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছাত্রনেতা নিরঞ্জন সরকার বাবু, মোবারক হোসেন সেলিম, ভাস্কর মহিলা সম্পাদিকা নাহিন আমিন খান, সাধন সরকার, ফারুক, নিদ্রাং প্রমুখকে আগামীকাল ১লা ফাল্গুন সোমবারে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ সকালের ছাত্র মিছিল ও ছাত্র হত্যা স্মরণে বিতারিত জানানো ও আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, ছাত্রনেতা ফকরুর রহমান, বাহাদুর মজলুম হুদুসই প্রগতিশীল ছাত্র নেতা ও নেতৃত্বান্বীত কর্মীরা কোন অবস্থাতেই আনবিক শক্তি কমিশনের পরে দায়ে মিছিল না থাকে সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে।

আজ ১লা ফাল্গুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩। ফুল ফুটক আর নাই ফুটক আর বসন্ত। শুভুর রাজ্য বসন্তের এই সমীরণে আজ সবাই উদ্বেলিত। বাঙালি বর্মণীরা লাল পেড়ে হলুদ শাড়ি পরে জোর হতে না হতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে বসন্তকে অবগাহন করতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া ও নান্দুরাহার হলের ছাত্রীরা খুব জোর থেকেই লাল পেড়ে বাসন্তি রঙের শাড়ি পরে বসন্ত উৎসবে মেতে উঠেছে। বসন্ত উৎসব মুখ্য বিশ্ববিদ্যালয়। লাল পাড় হলুদ বর্ণের শাড়ি পরে কোন কোন ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ছেড়ে মনের মানুষের সাথে বসন্ত উৎসব করতে দূর-দুরান্তে চলে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার লাল পেড়ে হলুদ শাড়ির সমারোহ। আজি এ বসন্ত ..... সবাই বসন্তের দোলায় ঢুলছে। কেউ জানে না একটু পরে কি ঘটতে যাবে। কে নিহত হতে যাবে। কোন্ রেহমতী মাকতার বুক খালি যাবে। কোন শিতা নষ্টান হারা যাবে। বেলা দশটার দিকে কলাভবনের সামনে অপরাহ্নের বাংলার পদদিশে মিছিলের উদ্দেশ্যে ছাত্ররা জমায়েত হতে শুরু করে। একটি মটর সাইকেল ধনমন্ডি ৩২ নম্বরে শেখ হাসিনা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং আর্ম পুলিশের হাফিজুর রহমান লক্কর এর সার্বে সার্বজনিক যোগাযোগ বন্ধা করে যাবে। মটর সাইকেলটি দ্রুত গতিতে ৩২ নম্বরে শেখ হাসিনা ও শিতা একাডেমীর পূর্ব পাশে অবস্থানরত আর্ম পুলিশের কোম্পানী জমাকার হাফিজুর রহমান লক্করের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানিয়ে যাবে। বেলা এগারোটা নাগাদ ছাত্র মিছিল শুরু হলো।

যেদর ছাত্রনেতা ও কর্মীদের আনবিক শক্তি কমিশনের পরে মিছিলে আর না থাকতে জানিয়ে নেওয়ার কথা তাদেরকে তা জানিয়ে নেওয়া হলো।

সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা মতো মিছিলসহ সব কিছুই ঠিকঠাক চলতে লাগলো। ছাত্র মিছিল আনবিক শক্তি কমিশন পর্যন্ত এগিয়ে গেলে কিছু ছাত্রনেতা ও কর্মীরা মিছিলের সিদ্ধান্ত থেকে সরে পড়লো। মিছিল এগিয়ে গেল বাংলা একাডেমী ছেড়ে আরো সামনে দক্ষিণের দোস্তল চত্বরের দিকে। একেবারে দোয়েল চত্বরের কাছে

এবং মিছিলে যেই মোড়েল চত্বর পিছনে ফেলে পূর্ব দিকে ঘুরে নীড়ালো সঙ্গে সঙ্গে আগে থেকে ওং পেতে থাকা হাফিজুর রহমান লকরের আর্ম পুলিশের তলি, ওরফে ওরফে, টান টান: দুহুর্তের মধ্যে দুটিয়ে গড়ালো কয়েকজন ছাত্র।

মটর সাইকেলটি দ্রুত ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারে গিয়ে শেষ হাসিনাকে ওলির সংবাদ দিয়ে আবার ছুটে চললো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ইতিমধ্যে ছাত্ররা হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে ওলিবিধ ছাত্রদের নিয়ে এসেছে, ওলিবিধ ছাত্রদের মধ্যে জরুরী ও জাকের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে পৃথিবী ছেড়ে পরকালে চলে গেছে। জরুরী ও জাকের সাফার কোল খালি হয়েছে। শূন্য হয়েছে পিতার বুক। নীল-নকশা বাস্তবায়িত হওয়ায় ছাত্রদের সংবাদটি নিয়ে মটর সাইকেলটি চলে গেল ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারে। দুজন ছাত্র হত্যার সফলতার সংবাদটি শেষ হাসিনাকে দিয়ে মটর সাইকেলটি ফিরে এলো বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। গেলে থেকে ১লা ফাল্গুনের বনস্তের উৎসব। ছাত্ররা তাদের নিহত সখী আফর ও জরুরীর লাশ কলা ভবনের অপরাধের বাণেশ পদদেশে ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমে নিয়ে এসেছে। বিকাল তিনটার জ্ঞানাজ্ঞা ও শোক সভায় কর্মসূচীটা ৩২ নাম্বারে গিলে, দুপুর ২টা নাগাদ বহুবন্ধু কন্যা শেষ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনালী আনেন এবং তার (শেষ হাসিনার) দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া নিহত ছাত্রদের লাশ দেখে ক্রমশঃ নিয়ে চলে মোজার ভাব করতে করতে কোন কর্মসূচী না নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগ করেন। শোকে প্রিয়মান ছাত্র-ছাত্রীরা ঘটনাক্রমে সমবেত হয়ে থাকে এবং ১লা ফাল্গুনে বনস্তের গোখার লাগ পেড়ে বাসন্তি রঙ-এর শাড়ি পরে প্রত্যেকে ক্যাম্পাসের বাইরে যাওয়া হোকো ও সামসুদাহার হলের ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিরে এসে ছাত্র হত্যার ঘটনায় শোকে বিহবল হয়ে ঘটনাক্রমে শোকসভার সমবেত হয়।

শেষ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগ করে দেয়েই সাময়িক আইন প্রশাসক জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে কোন প্রপ আন্দোলনের কর্মসূচী না দেওয়ার নিয়মে এরশাদের কাছ থেকে কতগুলো গোপন সখী আদায় করে নেন। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলনের কর্মসূচী দেওয়া হবে না এই মর্মে শেষ হাসিনার কাছ থেকে নিশ্চয়তা ও আশ্বাস পাওয়ার পর জেনারেল এরশাদ সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় চতুরদিক থেকে নজিরবিহীন পুলিশি ও মিলিটারী হামলা চালায়। পুলিশের চতুরদিক থেকে সাঁড়াশি হামলার মুখে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ঘটনাক্রমে অনুপ্রাণিত জ্ঞানাজ্ঞা ও শোক সভায় সমবেত ছাত্র-ছাত্রীরা নিগবিনিক জানশুনা হয়ে নৌকাতে থাকে। কিন্তু যেদিকেই নৌকা যেদিকেই পুলিশের ও আর্মির বেধরক মার। নিমেষের মধ্যেই ঘটনাক্রমে ছাত্র হত্যার বেডেল ছুঁতা পড়ে থাকা ছাত্র কোন মানুষের চিহ্ন থাকে না।



জাকব ও জয়নালের লাশ দুটি অস্তিত্ব কষ্টে ছাত্ররা ধরাধরি করে সূর্যসেন হলে নিয়ে যায় এবং সূর্যসেন হলের গেটের ভেতর থেকে ডালা লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়। হলের কক্ষের ভেতরে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী, আর হলের আধিনায়ক সাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু পুলিশ আর সেনাধর্মী। মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ আর আর্মি হলের গেট ভেঙ্গে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করবে। অবস্থা ব্যতিক্রম দেখে মটর সাইকেল আরোহী সূর্যসেন হলের মোড়লা থেকে এক লাফ নিয়ে পড়লো হলের আধিনায়ক। তার অননি শকুনের দল যেননি ভরা গরু ঘিরে বরে যায় তেমনি পুলিশের দল মটর সাইকেল আরোহীকে ঘিরে পেটাতো লাগলো। এরই মধ্যে মটর সাইকেল আরোহী প্রাণপণ বেগে হটে চললো সূর্যসেন হলের কাউন্টারী জার্ডানের দিকে। মটর সাইকেল আরোহী সৌভাগ্যে আগে আগে, পিছনে গিছনে শকুনের স্ককের দ্বারা সৌভাগ্যে, জাম পিটাতো পুলিশ ও আর্মি। পরি কি মরি করে এক লাফে সূর্যসেন হলের প্রাচীর উপরে কাউন্টার আর কলানির বাস্তব ঘিরে পড়লো মটর সাইকেল আরোহী। সেখান থেকে ধানমন্ডি ৩২ মাঝারে গিয়ে শেখ হাসিনাকে না পেয়ে আনবিক শক্তি কমিশনের পরিচালক শেখ হাসিনার বানী তঃ রয়াজেন মিমার মহাশয়ি সরকারী বাসভবনে গিয়ে শেখ হাসিনার কলোবো জীপ পাওয়া গেলেও শেখ হাসিনাকে পাওয়া গেল না। শেখ হাসিনার স্ত্রি এবং বিশ্বাসী দায়ুর্গি রমাকান্তর কাছ থেকে জানা গেল তিনি (শেখ হাসিনা) কাউন্টারে গায়ে না নিয়ে অপরিস্টিত একটি প্রাইভেট কারে-এ করে অপরিস্টিত একমাত্র চালক আরোহীর কাছে বোরকা পরে অজ্ঞাত স্থানে গিয়েছেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো হলের গেট ও দরজা ভেঙ্গে পুলিশ এবং মিলেটারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মচারী এবং ছাত্রদের বেদরক খারপিট ও প্রোডার করে সারাবাক খোলা আকাশের নিচে বসিয়ে রাখে এবং নিহত ছাত্র জাকব ও জয়নালের লাশ নিয়ে যায়। বলসাহল্য, এ সময় (১৯৮৩ সালে) বেগম খালেদা জিয়া এবং তার দল বি. এন. পি-র সাংগঠনিক কোন অস্তিত্ব ছিল না। ফলে বেগম খালেদা জিয়া ছাত্র হত্যার পর বিশ্ববিদ্যালয়েও আসেননি। সাময়িক ঐক্যচার জেনারেল এরশাদ এবং তার সাময়িক আইনেও দিকছে চির সংঘামের ঐতিহ্যবাহী সহজ সরল প্রাণ এদেশের ছাত্র সমাজের প্রথম আন্দোলন, প্রথম বিদ্রোহ এবং আত্মদান। রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বার্থতা এবং শেখ হাসিনার পাতানো আপোষকারীতার কারণে সম্পূর্ণ স্বার্থতায় পর্যবসিত হয়। বৃথা হয়ে যায় জাকব ও জয়নালের আত্মদান। সাময়িক ঐক্যচার জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ নিশ্চিতে, নির্ধিয়ে, নির্ভাবনায় ক্ষমতায় বসে থাকে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবে ছাত্র সমাজ দিশেহারা হয়ে নেতিয়ে যায়। এদেশের আন্দোলন সংগ্রাম-এর মূল চালিকা শক্তি আন্তরামী দীপ এবং তার নেত্রী বন্দবস্ত কন্যা শেখ হাসিনাকে মারনেক করে দোর্দণ্ড প্রত্যাপে চলতে থাকে এরশাদের সাময়িক শাসন।



## সেলিম ও দেলোয়ার হত্য

বহর ফুলে এলো ১৯৮৪ সাল। আবার ফিরে এলে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের মাল, ফেব্রুয়ারী মাস। আগরামী লীগ সভানেত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নতুন বছরের নির্দেশ, এরশাদের বিরুদ্ধে আবারো ছাত্র আন্দোলন করতে হবে।

৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ সাল। ধামরাড়ি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে বিকাল ৪টার বসলো এক কল্লভার বৈঠক। বৈঠকে নেত্রী যে কোন মর্মেই হোক ছাত্র আন্দোলন করার কঠোর নির্দেশ দিলেন। শুধু হলো আবার ছাত্র হত্যার নতুন পরিকল্পনা। একদিকে চলতে লাগলো ছাত্র হত্যাকাণ্ডী পুলিশ অফিসার হাফিজুর রহমান লকরদের ভাড়া করার কাজ। অন্যদিকে চলতে লাগলো সাধারণ ছাত্রদের ফেপিংয়ে ফুলে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করার কাজ।

শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে পুরই দ্রুত ছাত্র হত্যাকাণ্ডী পুলিশ অফিসারদের ভাড়া করার কাজ সম্পূর্ণ হলো। কিন্তু ছাত্রদের আন্দোলন করার জন্য সংগঠিত করা সম্ভব হলো না। নানাভাবে বহু রকম চেষ্টা ওচরিত করেও ছাত্রদের আন্দোলনে শরীক করা গেল না।

গেটটা ছাত্র সমাজই এরশাদের বিরোধী। কিন্তু আন্দোলনের প্রাণে, আন্দোলনের নেতৃত্বের এগ্রে ছাত্র সমাজ শেখ হাসিনা এবং আগরামী লীগকে বিশ্বাস করতো না। বেগম জিয়া এবং বি, এন, পি-র তখনো তেমন কোন অস্তিত্ব অনুভব করা যায়নি। দিন গড়িয়ে যায়, কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের তেমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এরিকে ছাত্র হত্যাকাণ্ডী আর্ম পুলিশেরা '৮৩র মধ্য ফেব্রুয়ারীতে সংগঠিত ছাত্র হত্যার অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও কর্মসূচী হাতে নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এবং গত মধ্য ফেব্রুয়ারীর ন্যায় একটা ছাত্র মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আসার জন্য বাতবাত তাগাদা দিচ্ছে। তাগাদা দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। দিন যায় কিন্তু আন্দোলনের কোন খবর নেই। এক পর্যায়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা অর্ধেকা হয়ে ভোমালের বাবা কিছুই হবে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

অনেক চেষ্টা করেও স'পাতেক ছাত্রের একটা মিছিল নিয়ে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আসতে পারলাম না। ফলে গত '৮৩র মধ্য ফেব্রুয়ারীর ন্যায় ছাত্র হত্যার সম্ভব না হওয়ায় ছাত্র হত্যার মরণ পাটানো হলো।

আর্ম পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার পুলিশের লিনিডর এস,পি, হাফিজুর রহমান লকর ছাত্র হত্যার পরিকল্পনার আর্ম পুলিশের পরিবারে রাষ্ট্র পুলিশকে সম্পৃক্ত করে এবং নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক হয় যে, ২০/৫০ জনের একটি মিছিল কোন রকমে যে কোন দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন দিক দিয়ে বাইরে

নিচে এলোই রায়ট পুলিশ (যে পুলিশ ২৪ ঘণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়েই থাকে) ছাত্র হত্যা পরিকল্পনা সফল করে দেবে। সাধারণ ছাত্র ভেদে দুবের কথা ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরাই মিছিলে আসতে চায় না।

এদিকে নেত্রীত কড়া নির্দেশ ছাত্রলীগের একটা বড় মিছিল নিয়ে হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যেতে হবে, নইলে ভোমনাদের দারিদ্র্য থেকে বিদায় নিতে হবে। ২৮শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস-এর বাইরে বাগদার সিঙ্কান্ড হলো এবং যথার্থীতি এই সিঙ্কান্ড জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে জানান হলো, শেখ হাসিনার মাধ্যমে এই সংবাদ আফিজুর রহমান লক্ষ্যের মারফত রায়ট পুলিশের দায়কদের জানানো হলো।

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪, ইং ৩০/৪০ জন ছাত্রের একটা মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগ করে চান্দখারপুল হয়ে ফুলবাড়িয়া বাল ট্রাড-এর দিকে দ্রুত যেতে থাকলো। এই মিছিলের পেছনে পেছনে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রায়ট পুলিশের একটি লরি আসতে লাগলো।

বুঝা গেল এইবার সামনে থেকে ছাত্র হত্যা করা হবে না। হত্যা করা হবে মিছিলের পেছন থেকে। যারা এই পরিকল্পনা অমহিত তারা যতটা সম্ভব মিছিলের সামনে থাকতে লাগলো। মোটামুটি মিছিলের অনেকেই জানে পেছন থেকে মিছিলে আক্রমণ করা হবে। রায়ট পুলিশের লরি লেকেই এই আক্রমণ করা হবে। তবে রায়ট পুলিশের লড়ি থেকে গুলি করা হবে, না অন্যকোন ভাবে আক্রমণ করা হবে এটা কেউ জানতো না। তবন বিকেল পাঁচটা, ফুল হাট মিছিলটি নিম্নতরী পার হয়ে ফুলবাড়িয়া আসতেই চুকাব সঙ্গে সঙ্গেই রায়ট পুলিশ তাদের লরিটি বিদ্যুৎ গতিতে মিছিলের উপর তুলে দিল। মিছিলের পেছন দিকে থাকা বেশির ভূর্তের মধ্যে পুলিশের লরির ঢাকায় পিষ্ট হয়ে গেল। বাকি সবাই রাস্তার দুই দিকে ছিটকে পড়ে প্রাণে বাঁচলেও দেলোয়ার সোভা দৌড়াতে লাগলো। প্রাণভয়ে দেলোয়ার দৌড়ায় আগে, দেলোয়ারের গাশে বধ করতে পেছনে দ্রুত ছুটেছে রায়ট পুলিশের লরি।

মিনিট দু'তের-এর মধ্যেই দেলোয়ারের দেহ ঢাকায় পিমে রাস্তার সাথে মিশিয়ে দেয় পুলিশের লরি। দেলোয়ারের দেহ এমন ভাবে রাস্তার সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এটা যে দেলোয়ারের দেহ তা বুঝতো দুবের কথা, এটা যে একটা মানুষের দেহ তাই বুঝা যাচ্ছে না। আর পেছনে পিচ জলা রাস্তার সাথে যেতলে মিশে আছে বেশির ভূর্তের দেহ।

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে সংবাদের জন্য অধির আগ্রহে উৎসুক হয়ে বসে থাকা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী, সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে রায়ট পুলিশের ঢাকায় পিষ্ট হয়ে সেলিম এবং দেলোয়ারের নিহত হওয়ার সংবাদটি পৌঁছল মটর সাইকেল আরোহী।

হাজরীগেঁহের দুইজন নেতাকে নিহত হওয়ার সংবাদটি শুনে শেখ হাসিনা পুশকিত হয়ে আনন্দিত হয়ে বলে উঠলেন, স্যাবান।

তারপর পাড়ির ড্রাইভার জামালকে বললেন, জামাল গাড়ি লাগায়ও আমি বাইরে যাবো।

মটর সাইকেল আরোহী সঙ্গে যেতে চাইলে নেত্রী বললেন, তোমরা এক কাজ করো, আগামীকাল সকালে ৩২শে বঙ্গবন্ধু আস। আজ বঙ্গবন্ধু চলে যাও।

পরদিন সকালে ৩২শে গিয়ে নেত্রীকে না পেয়ে মটর সাইকেল আরোহী সোজা হাজরীগী চলে গিয়ে ড্রাইভার জামাল এবং পাকিস্তানী জীপ নেতাকে পেয়ে নিশ্চিত হলো নেত্রী এখানেই আছেন। কিন্তু মটর গিয়ে নেত্রীকে না পেয়ে বাড়ি চলে আসার পরে কয়েক ঘণ্টা পরে নেত্রী অজ্ঞাত শত্রু আর চালকের সঙ্গে অজ্ঞাত স্থানে পড়েছেন অনেক জোরে।

দুপুর ১টার দিকে গিয়ে এসে নেত্রী খাওয়া না করা করে নোজা চলে এসেছেন খানমন্ডি ৩২শে বঙ্গবন্ধু ভবনে। হাজরীগেঁহের বেশ কিছু নেত্রী বিমান তিনটিয় খানমন্ডি ৩২ নাম্বারে বঙ্গবন্ধু ভবনে এসে সভানেত্রী শেখ হাসিনার কাছে হাজরীগেঁহ নেত্রী সেলিম ও সেলোভারকে পুলিশের কারের চাকায় শিট করে নির্ধন ও শিটর-ভাবে হত্যা করার প্রতিবাদে সামরিক একলাফক হৈরাচারী, এতশাদের বিরুদ্ধে তাঁর আবেগলম করার কর্মসূচী চাইলে সভানেত্রী শেখ হাসিনা এই বলে হাজরীগেঁহের নাস্তানা সেম সে, আমাদের মূল শত্রু জিয়াউর রহমান এবং তার দল বি, এন, পি। জিয়া তো শেষ। জেও এতশান বি, এন, পির কাছ থেকে মাত্র কিছু দিন হলো ভয়ভা দখল করেছে। আমাদের এখন প্রধান কাজ বি, এন, পিকে চিরভরে শেষ করে দেওয়া। এই মুহুর্তে আমরা জেনারেল এতশাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যাব না। আমাদের মূল শত্রু বি, এন, পি। এটা মনে রাখতে হবে। হাজরীগেঁহের সেলিম ও সেলোভারের হত্যার জন্য আবেগ আপ্ত হলো শেখ হাসিনা বলেন, আবেগপ্রবণ হয়ে লাভ নেই। সময় হলেই এদের পরিবারকে পুশিয়ে দেওয়া হবে।

হাজরীগেঁহের কোন রকম কর্মসূচী ছাড়াই তার জন্মে বঙ্গবন্ধু ভবন জ্ঞাপন করলো।

## দেশদ্রোহী সেনা বাহিনী

৩রা মে ১৯৮৪-এর এক পরন্ত বিকালে খানমন্ডি ৩২শে বঙ্গবন্ধু ভবনে বলে গর করছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সহ অচ্যক জন। গর গর ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনী জনস উঠলো। জনস উঠলো ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কথা।

জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সম্পর্কে বললেন, এটা একটা সেনাবাহিনী হলো? এটা একটা বর্রর, নরপিতাশ, উল্লু, গোড়ী, বেয়ানব

বাহিনী। এই বাহিনীর অনুগত্য নেই, শৃংখলা নেই, মানবিকতা নেই, মানাশনা নেই, নেই দেশপ্রেম। এটা একটা সেশদ্রোহী অসভ্য হায়েনার বাহিনী। তোমরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কথা বল। সাত্তা বিশেষ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হতে। এক জর, বহু, সজ, বিনটী এবং অনুগত্যবীল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মানবিকতা বোধের কোন ছলনাই চলে না। কি অসম্ভব সভ্য আর মনু তারা।

পঁচিশে মার্চ রাতে তারা (পাকিস্তান আর্মি) এসে, এসে আকাশকে (বহুবলু শেখ মুজিব) সেলুট করলো, মাকে সেলুট করলো, আমাকেও সেলুট করলো। সেলুট করে তারা বলল, সাত আমরা এসেছি শুধু আপনাদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। অন্য কোন কিছুই জন্য নয়। আপনারা বখশ খুশি, যেখানে খুশি যেতে পারবেন। যে কেউ আপনাদের এখানে আশ্রয় পারবে। আমরা শুধু আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবো। আপনারা কহিবে গেলে আপনাদের নিরাপত্তার জন্য আমরা আপনাদের সঙ্গে যাবো। কেউ আপনাদের এখানে এলে আমরা তাকে কানভাবে তত্ত্বাবধি করে অরণ্যে ঢুকতে দিব। এসবই করা হবে আপনাদের নিরাপত্তার জন্য। সত্যিই পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যা করেছে তা সম্পূর্ণ আমাদের নিরাপত্তার জন্যই করেছে। ২৬শে মার্চ দুপুরে আকাশকে (শেখ মুজিব) বখশ পাকিস্তানী আর্মিরা নিয়ে যায়, তখন জেনারেল টিক্কা খান নিজেকে এসে আকাশকে ও মাকে সেলুট দিয়ে, আনবের সাথে দাঁড়িয়ে বিলয়ের সাথে আকাশকে (শেখ মুজিবকে) বলে, সাত আপনাকে পেনিডেই ইয়াহিয়া খান আনোচনার জন্য নিয়ে যেতে বসেছেন। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনাকে নেওয়ার জন্য বিশেষ বিমান তৈরি (পেশিয়াল ফ্লাইট বোজি) আপনি তৈরি হয়ে নেন এবং আপনি ইচ্ছে করলে মাদ্রাস (বেগম মুজিব) সহ যে কাউকে সঙ্গে নিতে পারেন। আকাশ মার সঙ্গে আলোচনা করে একাই গেলেন। পাকিস্তান আর্মি বতদিন ভিউটি করেছে এসেই প্রথমেই সেলুট দিয়েছে।

ওগু তাই নয়, আমার দাবীর সামান্য জুর হয়েছিল পাকিস্তানীরা হেলিকপ্টার করে টুপিগাড়া থেকে দাবীকে ঢাকা এনে দি, জি হানপাতালে ডিকিৎসা করিয়েছে। জর (শেখ হাসিনার ছেলে) তখন পেটে, আমাকে প্রতি সত্বাহে সি, এম, এইচ (সম্মিলিত সামরিক হানপাতাল) নিয়ে ঢেক আপ করলো। জর হওয়ার একমাস আগে আমাকে সি, এম, এইচ-এ ভর্তি করিয়েছে। '৭১ সালে জর জর হওয়ার পর পাকিস্তান আর্মিরা খুশিতে মিষ্টি বাটোয়ারা করেছে। এবং জর হওয়ার সমস্ত খরচ পাকিস্তানীরাই বহন করেছে। আমরা যেখানে খুশি যেতাম। পাকিস্তানীরা দুই জীপ করে আমাদের সাথে যেতো। নিরাপত্তার জন্য পাহারা দিত।

আর বাংলাদেশের আর্মিরা আনোয়ারের দল, অমানুষের দল এই অমানুষ আনোয়ারেরা আমার বাবা-মা, জুই সবাইকে মেরেছে—এদের মেন পারেন হয়।



## মসজিদ সরিয়ে ফেলুন

১৯৮৫ সালের শুরু থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আরার ছাত্র আন্দোলনের জন্য নতুন করে ভূমি দিতে থাকলেন। বহু চাপাচাপি, ধমকা ধমকি এবং ভূমি দিতে দেওয়া সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু আন্দোলনের বিপুলবিস্মৃতি হলো না তখন তিনি বলেন যে সালের আকাঙ্ক্ষা তার জনজীবন এবং পিতার বাড়ি টুঙ্গিপাড়ায় চলে গেলেন। এবং বেশ কিছুদিন টুঙ্গিপাড়ায় থাকলেন। এরই মধ্যে একদিন শেখ বাড়ি (বঙ্গবন্ধু হাসিনার নিজের বাড়ির) কিছু দুতর্কীয় টুঙ্গিপাড়া গ্রামের ২০/৩০ জন মুরব্বী এসে শেখ হাসিনার অংশের একটি নারিকেল গাছ খাড়া শেখ বাড়ির অন্য শরীফের জায়গায় নির্মিত মসজিদটি প্রতিস্থাপন করে স্থানীয় সেই নারিকেল গাছটি কেটে ফেলার প্রস্তাব করলে, শেখ হাসিনা সরাসরি বলে দেন জানার নারিকেল গাছ কাটা হবে না। সরাসরি বলে মসজিদ সরিয়ে ফেলেন। তখন সকল মুরব্বী পত্রিতা কুতুহলে পাঠে মসজিদ সরানো নিয়েই আছে বলে মসজিদের নেতারা ও স্থান থেকে খালি শেখ হাসিনার জায়গায় অবস্থিত নারিকেল গাছটি কেটে ফেলার জন্য ব্যয় করে অতুল্য হিন্দু করতে থাকে। তখন শেখ হাসিনা বলেন, এই মসজিদ বন্ধ করে দেন। আমি আরো বড় মসজিদ বানিয়ে দেব।

মুরব্বীরা বলেন, একটি মসজিদ হলেই নারিকেল গাছটি মসজিদের পায়ে এবং ছাদে লাগতে থাকে। এইভাবে চললে মসজিদের স্থান এবং নেতারা অচিরেই ভেঙে যাবে।

শেখ হাসিনা বলেন, ভেঙে যায় দাঁক, ভাঙে আঁক কিছু যায় আসে না। আপনারা লক্ষ বছর কান্নাকাটি করলেও নারিকেল গাছ কাটবে না।

## ৮৬ নির্বাচন

১৯৮৬ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর স্থানীয় নেতা সৈয়দ ও সৈয়দার নিহত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যাত্রাপর নাই চেষ্টা করেও আর ছাত্র আন্দোলন করতে পারলেন না। ইত্যাবলয়ে সাময়িক বৈঠকের জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ পাকিস্তানকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে নিজের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায়। যদিও এরই মধ্যে নিহতের নিষ্পত্তি বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বি, এন, সি, উল্লেখযোগ্য একক রাজনৈতিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলো।

এরশাদ তার ক্ষমতাকে নিরুৎসাহ করেই ১৯৮৬কে সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা ও প্রস্তাব দেন। এরশাদের প্রস্তাবিত সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা, না করার বিষয় নিয়ে দেশের রাজনৈতিক মহলে ও নেতাদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা-আলোচনা শুরু হলে বেগম খালেদা জিয়া এবং তার দল বি, এন, সির পক্ষ থেকে এরশাদের নির্বাচনী ফাঁদে পা না দিয়ে এরশাদ হঠাৎ আন্দোলন করার প্রস্তাব দেয়।

তখন জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে তলশানের অনেক ব্যবসায়ী এসে, আই, চৌধুরী (সিরাহুল ইসলাম চৌধুরী)র তলশানের দানায় তৎকালীন ডি, জি, ডি-এফ, আই (ডাইরেক্টর জেনারেল স্যব ডিফেন্স কোর্স ইন্সটিটিউট) প্রিণ্টিয়ার সাহাবুদুল হাসানের সাথে গোপন বৈঠক হয়। প্রিণ্টিয়ার সাহাবুদুল হাসান জেনারেল এরশাদের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগতভাবে শেখ হাসিনাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অনুরোধ করেন এবং নির্বাচনী সকল ব্যয়ভার বহন করার প্রতিশ্রুতি দিলে শেখ হাসিনা আত্মসম্মানের অংশ হিসেবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার পক্ষে মত দেন। এই পরিস্থিতিতে দেশের স্বাধিপতি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিশেষত কমিউনিষ্ট পার্টির প্রয়াস নাথাকলে সম্পাদক কমরেড করহান-এর স্বচরিত্র বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার মতস্বার্থকা এই কৌশলে কমিটে আসা হয় যে, নির্বাচনে শুধু মাত্র দুই নেত্রী (খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা) হুড়ো আর কেউ হুড়াবে না। অর্থাৎ স্বাধিপতি নেত্রীবৃন্দ বেগম জিয়াকে এটা বুঝাতে সমর্থ হয় যে, বেগম জিয়া এবং শেখ হাসিনা দু'জনে দেড়'শ দেড়'শ তিন'শ আসনে নির্বাচনে মাঁড়াবেন, আর ব্যক্তি সবাই মিলে দুই নেত্রীকে তিনশ আসনে জিতিয়ে দিবেন। তারপরে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে। এবং ভাঙে করে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে বিবেক এবং অনৈক্য সৃষ্টি হবে না।

বেগম খালেদা জিয়া এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রয়াসে দুই নেত্রী ১৫০+১৫০ = ৩০০ আসনের নির্বাচনের প্রস্তাবে সাদা সেন এবং শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া মুখোমুখি সংক্ষিপ্ত বৈঠক করেন। কিন্তু তলশানের ব্যবসায়ী এস, আই, চৌধুরীর মাধ্যমে দুই নেত্রীর এই গোপন নির্বাচনী কৌশলের কথা এরশাদের কাছে পৌঁছে যায়। এবং এরশাদ রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি করে যে, এক ব্যক্তি পাঁচের অধিক বা বেশি আসনে নির্বাচনে মাঁড়াতে পারবে না।

কলে দুই নেত্রীর দেড়'শ দেড়'শ তিন'শ আসনে নির্বাচন করার কৌশল ভুল হয়ে যায়। তখন বেগম জিয়া এরশাদের নির্বাচনী ফাঁদে পা না দিয়ে এরশাদ পতনের আন্দোলনের পুরোনো অবস্থানে চলে যান। এদিকে তলশানের এস, আই চৌধুরীর ব্যক্তিতে ডি, জি, ডি, এফ, আই প্রিণ্টিয়ার সাহাবুদুল হাসানের সাথে শেখ হাসিনার আবার বৈঠক হয়। এবং সেই বৈঠকে দাবি করা হয় নির্বাচনী ব্যয় হিসেবে আগে যে পরিমান অর্থ ঘরা হয়েছে, এখন তদ্রূপ তিনগুণ অর্থ দিতে হবে। ডি, জি, ডি, এফ, আই, প্রিণ্টিয়ার সাহাবুদুল হাসান এক ঘণ্টার সময় চেয়ে চলে যান। এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা খানমতি ও২ দাফরে বঙ্গবন্ধু করনে চলে আসেন। দলী দুই পর লঙ্কার নিকে ব্যবসায়ী

এস, আই, চৌধুরী দুইটি মাইক্রোবাস সঙ্গে নিয়ে ৩২ নাম্বারে এসে হাজির। এস, আই, চৌধুরী আর শেখ হাসিনার মধ্যে এক-দেড় মিনিট কথা, তারপরই হুতুম হলো ভাড়াভাড়ি মাইক্রোবাস থেকে বস্ত্রভঙ্গি নামিয়ে আনো। সঙ্গে সঙ্গে মাইক্রোবাস থেকে দুখ দেলাই করা মোট নয়টি নতুন বস্ত্র নামিয়ে বস্ত্রবস্ত্র ভবনের নিচতলার লাইব্রেরী আর বেতকমের মাঝে যে মাইটার বাথরুম সেই বাথরুমে রাখা হলো।

এরপর শেখ হাসিনা আদেশ করলেন-আর্থোডিক সন্মেলন-এর আয়োজন করতে এবং ডঃ কামাল হোসেনসহ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের ৩২ নাম্বারে বস্ত্রবস্ত্র ভবনে জরুরী ভিত্তিতে আসতে বলার জন্য।

ডঃ কামাল হোসেনসহ যে সকল নেতাদের টেলিফোনে পাওয়া গেল তাদের অনতিবিলম্বে বস্ত্রবস্ত্র ভবনে আসতে বলা হলো, বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে টেলিফোনের মাধ্যমে এবং লম্বীয়ে গিয়ে জরুরী সাংবাদিক সন্মেলনের সংবাদ জানান হলো। সাংবাদিক সন্মেলনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাংবাদিকদের কিছু জানানো সম্ভব হলো না। শুধু বলা হলো জরুরী এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সন্মেলন। আশ্রয়ে সচিব কথা বলতে কি, সাংবাদিক সন্মেলনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ডঃ কামাল হোসেনসহ কোন নেতাই কিছুই জানেন না। মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানেন মূলত চার ব্যক্তি (১) শেখ হাসিনা (২) ব্যবসায়ী এস, আই, চৌধুরী (৩) ডি, জি, ডি, এক, আই প্রিভেটিভার মাহমুদুল হান্নান এবং (৪) প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সেনাপাহিনী প্রধান রত্নপতি জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ।

অধিক দ্রুত হওয়া সত্ত্বেও বহু সংখ্যক সাংবাদিক এসে উপস্থিত হলো। ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারে বস্ত্রবস্ত্র ভবনে।

শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ নেতাদের এরশাদের নির্বাচনে যাওয়ার (অংশ গ্রহণ করার) সিদ্ধান্ত জানালেন। নেতারা বললেন, নির্বাচনে যাব চিক আছে, কিন্তু কবদিন আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি; তারপর সিদ্ধান্ত নেই।

শেখ হাসিনা বললেন, আমাদের সময় নেই, ভাড়াভাড়ি করতে হবে। কাকেনা ফিফা এবং তার সভা বি, এন, শিকে জাং মেয়ে নির্বাচনে যেতে হবে-কাজেই এটা নিয়ে এক আলোচনার সভাকার নেই। বাইরে সাংবাদিকরা বসে আছে, এখনই নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দিতে হবে। বসেই সভাসভি সাংবাদিকদের মাঝে এসে উপস্থিত হলেন এবং নির্বাচনে যাওয়ার (অংশগ্রহণ করার) ঘোষণা দিলেন। তার পরদিন ছয় ফুট লম্বা তিন ফুট চওড়া পাঁচ তলা (পাঁচ তাক) একটি টিলের অয়ারড্রাক আনা হলো এবং যে বাথরুমে দেলাই করা

বস্ত্রভাণ্ডে আছে সেখানে রাখা হলো। তারপর একে একে বস্ত্রাভাণ্ডা হতে লাগলো। আর বস্ত্রের ভিতরে থাকা পাঁচ শত টাকার নতুন স্ফটিকভাণ্ডা ঐ হিসের অভ্যন্তর ভ্রূক (আলমারী)-এ সাজিয়ে রাখা হলো। সব টাকা অভ্যন্তর ভ্রূকে না ধরায় স্ফটিক টাকার অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হলো।

হুক হলো ১৯৮৬-এর সংসদ নির্বাচনী প্রতিষ্ঠা। দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হলো। এক ভাগ শেখ হাসিনা নেতৃত্বে জেএরশাদের থাকানো নির্বাচনে জড়িয়ে পড়লো। আরেক ভাগ বেগম খালেদা জিয়ার আহ্বানে এরশাদ পতন ও থাকানো নির্বাচন বর্জন ও ঠেকানোর চেষ্টায় হুক হলো। শেখ হাসিনা সর্বশক্তি দিয়ে আগুয়ানী লীগ কর্মীদের নির্বাচনে জড়িয়ে পড়ার জোরদার আহ্বান জানানো। তিনি বললেন, এই নির্বাচনের মাধ্যমেই আগুয়ানী লীগকে পূর্বরাত্তর ক্ষমতায় নিতে হবে এবং সামরিক শাসক এরশাদকে বিনাশ করতে হবে।

শেখ হাসিনার আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণ এগিয়ে না এলেও আগুয়ানী লীগের কর্মী এবং সমর্থকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলো।

আগুয়ানী লীগের কর্মী এবং সমর্থকরা সাত্তা বেশেই একটা নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি করে তুললো। ঐ সময়ই ফিলিপাইনে সামরিক একনায়ক জেনারেল মার্কেস-এর বিরুদ্ধে সিহত জননেত্রী মিঃ একুইনোর বিদ্রোহী হিসেন কোরাজন একুইনো প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। সাত্তা বিশ্ব ফিলিপাইনের নিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক এমনি মুহূর্তে বাংলাদেশেও সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ফিলিপাইনের মতোই প্রায় দুই আকর্ষণ করে আছে।

শেখ-এ বাংলা নগরে নানিক মিটা এডিনিউ-এ আগুয়ানী লীগের শেখ নির্বাচনী জনসভা। বিশাল নির্বাচনী জনসভা। এর মাত্র দুই দিন আগে ফিলিপাইনে নির্বাচন হয়ে গেছে। সামরিক একনায়ক জেনারেল মার্কেস নির্বাচনের ফলাফল পাণ্টে দিয়ে নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে। অপর দিকে হিসেন কোরাজন একুইনো ঐ ফলাফল প্রত্যাহান করে নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করেছেন। হিসেন কোরাজন একুইনোর সঙ্গে ফিলিপাইনের জনগণ রাজ্য নেমেছে। আর সেই জনগণকে সমি্রে সেওয়ার জন্য একনায়ক মার্কেস-এর পক্ষে সেনাবাহিনী টায় দিয়ে রাস্তার বেগিয়ে এসেছে। একদিকে জনগনের বিরুদ্ধে স্তম্ভদিকে সামরিক স্ফটিক টায়। ফিলিপাইনের অবস্থা গত দুই দিন থেকে বুঝে উঠে। জনগণও বিরুদ্ধে স্ফটিক হওয়ার জন্য জেনারেল মার্কেসের কার্ফু ভেঙ্গে রাস্তার বেগিয়ে এসেছে। আর সেই জনগণের দিকে তাক করে টায় দিয়ে ধরে আসছে সেনাবাহিনী। ফিলিপাইনের দিকে সাত্তা পৃথিবীর সৃষ্টি স্বত্বানি গড়ীর বাংলাদেশের জনগণের সৃষ্টি তায় চাইকে অনেক বেশি গড়ীর।



ফিলিপাইনের মতো বাংলাদেশের প্রায় একই ঘটনা, একই অবস্থা। জনগণ বনাম সামরিক বাহিনী। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বনাম সামরিক একনায়ক।

বাংলাদেশের জনগণ সজাগ ও তাঁক দুটি রেবেছে ফিলিপাইনের শেষ পরিণতির দিকে। ফিলিপাইনের উত্তাপ বাংলাদেশের জনগণের অনুভূতিতে লাগছে। এমনি দুহুর্ন্তে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের শেষ নির্বাচনী বিশাল জনসভা চলাছে। ইহাং মফের নেতার বক্তৃতা বহু করে মাইকে শোষণ করা হলো ফিলিপাইনের একনায়ক জেনারেল মার্কেস দেশ (ফিলিপাইন) থেকে পালিয়ে গিয়েছে। মোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ প্রতিতে জনতা উল্লাসে ছেটে পড়লো। মনে হলো যেন বাংলাদেশ থেকে জেনারেল এরশাদ পালিয়ে গেছে এবং শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেছেন। মফের নেতারা একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করলেন।

এ ফেন পথের নিশা পাওয়া গেল। বাংলাদেশের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। দুই দিন পর বাংলাদেশে নির্বাচন হলো। জেনারেল এরশাদ জেনারেল মার্কেসের ন্যায় মিডিয়া কু করে কল্যাণ পালিজে দিয়ে নিজের দল জাতীয় পার্টিতে বিদ্রোহী ঘোষণা করলো। অপর দিকে শেখ হাসিনা ঐ ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে ফিলিপাইনের মিলেন কোরাজন একুনের মতো নিজেকে বিদ্রোহী ঘোষণা করলেন। জেনারেল এরশাদ পার্লামেন্টে অধিবেশন ডাকলো শেখ হাসিনাও পার্লামেন্ট অধিবেশন ডাকলেন। জেনারেল এরশাদের পার্লামেন্ট অধিবেশন ঢক হলো পার্লামেন্ট ছাড়িয়ে। শেখ হাসিনার পার্লামেন্ট অধিবেশন ঢক হলো পার্লামেন্টের সিঁড়িতে। এইভাবে কয়েক দিন চলতে লাগলো। একদিন লক্ষ্যের পর জলশায়ের ব্যবসায়ী এস, আই, চৌধুরী ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বসবস্তু ভবনে তিনটি মাইক্রোবাস নিয়ে এসেন। আগে থেকে অপেক্ষায় থাকা বহুবস্তু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দৌড়ে এসেন। এবং এস, আই, চৌধুরীকে নিয়ে বহুবস্তু ভবনের লাইব্রেরীতে বসিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেরিয়ে এসে মাইক্রোবাস থেকে দ্রুত ছাত্রের বস্তা তুলে আসের জায়গায় নামিয়ে রাখতে বহুবস্তু। যথার্থিতি যথাতুলো নামিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা হলো। এবার বস্তা হলো তেরটি। নেত্রীকে বস্তা নামানো শেষ হয়েছে জানানো হলো। নেত্রী মাইক্রোবাসের সঙ্গে আশা বহুবস্তু ভবনের বাইরে থাকা সাদা পোষাকের অগ্রধারী ব্যক্তিদের তা আশ্রয়ানোর কথা বললে এস, আই, চৌধুরী আপত্তি করে এখনই চলে যেতে হবে বলে তখনই বিদায় নিলেন। নেত্রী তাকে মাইক্রোবাস এ তুলে নিয়ে ফিরে এসেন।

অনুমান করা গেল নির্বাচনে যাওয়ার আগে নয় বস্তায় দশ কোটি টাকা ছিল। আর এখন তের বস্তায় পনের কোটি টাকা। বাংলাদেশের জনগণের আশা ছিল,

আকাল্লা ছিল জননেত্রী শেখ হাসিনা কিলিগাইনের মিসেস কোমলজন একুইসের নাতী আপোষদীন থাকবেন, জনগণকে রাস্তায় পেরিয়ে আসার আহ্বান জানাবেন। জনগণ রাস্তায় বেড়িয়ে আসবে, সামরিক একনায়ক এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে। এরশাদ জনগণ-এর বিশেষ সেনাবাহিনী এবং ট্যাঙ্ক নামাবে। জনতার প্রতিরোধের মুখে সেনাবাহিনী এবং ট্যাঙ্ক অকার্যকর হবে, সামরিক হেরাচাচর এরশাদ দেশ থেকে পালিয়ে যাবে। কিন্তু না, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা জনতার সমস্ত আশা আকাল্লা জলাঞ্জলী দিয়ে নীরবে নিঃশব্দে ছুপিনারে হেরাচাচরী জেনারেল এরশাদের পার্লামেন্টে যোগ দিচ্ছেন এবং এরশাদের পার্লামেন্টেও বিরোধী দলের নেত্রী হলেন। দেশ থেকে সামরিক শাসন এবং সমর নায়ক হেরাচাচরী এরশাদ তো গেলই না বরং '৮৬-এর নির্বাচনের পাতানো বেলায় সামরিক একনায়ক জেনারেল এরশাদ পূর্বের চাইতে আরো শক্তিশালী রূপে জগন্মল পাথরের ন্যায় জনগণের ঘাড়ে চেপে কসলো।

## এত বড় মাঠ

এরশাদের পার্লামেন্টেও বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার নিশান পেট্রোল জীপের এক পাশে জাতীয় পতাকা অন্য পাশে দলীয় (আওয়ামী লীগ) পতাকা লাগিয়ে তার (শেখ হাসিনার) নিজ জন্মভূমি এবং পিত্রালয় টুঙ্গিগাড়ায় এলেন। পরদিন সকাল বেলা গ্রামের এক জুনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষকরা তাঁদের স্কুল পরিদর্শনের জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এক বিকেলে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা উক্ত স্কুল পরিদর্শনে যান। গ্রামের পথ, মাটির পথ। সেই পথে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যান। মাইল খানেক যাত্রার পর দেখা গেল স্কুল। একটি মাঠ তার ডিন দিকে লম্বা তিনটি বড় টিলের ঘর। তিনটি ঘরের দু'টিই অর্ধেকের বেশি ভেঙ্গে পড়ে আছে। একটি ভাল আছে। এই ভাল ঘরটি বেশি দিন হয়নি ভেঁরি হয়েছে। আর ডান্স দু'টি ঘর জ্বরাজীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। কেউ নেই দেখার তা বোঝাই যাবে। দূর থেকে দেখা যাবে এবং শোনা যাবে স্কুলের মাঠে পাঁচ সাত'শ শিব, কিশোর এবং বালক লাইন দিয়ে নাঁড়িয়ে আছে এবং প্রোগ্রাম দিচ্ছে, জয় শেখ হাসিনা। জয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। বলতে গেলে এদের কারো গায়েই জামা নেই। মাঝে মাঝে কেউ কেউ আছে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। অর্থাৎ গায়ের আঙ্গা তো নেই-ই, শরনের পাউণ্ড নেই। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হতেই লাইনে নাঁড়িয়ে আছে। আর তীব্র কঠে প্রোগ্রাম দিচ্ছে, জয় শেখ হাসিনা, জয় জাতীয় পিতা শেখ মুজিব।

ভেঙ্গে পড়ে থাকা স্কুল ঘর। আর সেই স্কুল মাঠেই নাঁড়িয়ে আছে পাঁচ সাত'শ বস্ত্রহীন শিব, কিশোর আর বালকের দল। এই হচ্ছে শেখ হাসিনার ও

শেখ হাসিনার শিক্ষার জন্য তুমিই চেছো। শিক্ষালয় নিরাক্ত, গায়ে হস্ত নেই, এরা রিনে রিনে আসছে বড় হলে আর গায়ে কোথায়? দেখে যা শিউরে উঠলো। হঠাৎ মনে হলো, আমাদের মাঝে তো বঙ্গবন্ধু কন্যা এরশাদের বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আছেন। দেখি তিনি কি বলেন।

মাঠের এক কোণায় একটি জীর্ণ টেবিল, একটি চেয়ার আর একটি মাইক লাগানো আছে। বিরোধী দলীয় নেত্রী ধীরে ধীরে এই টেবিলের সামনে এলেন, কিন্তু চেয়ারে বসলেন না। সরাসরি মাইকে বক্তব্য শুরু করলেন। না, তিনি ভাষা বিধাতা শিক্ষালয়ের কথা বললেন না, বললেন না বঙ্গবন্ধুর বঙ্গবীমতার কথা, বললেন না অবিদ্যাতের জন্য সংশ্লেষ্ট কথা। অ্যা, বয়, শিক্ষা এসব তিনি কিছুই বললেন না। তিনি বললেন, এত বড় মাঠ। এত বড় মাঠের কথা শহরের ছেলেরা তো চিন্তাই করতে পারে না। মাঠ করে গাছ লাগিয়ে দিবেন। অনেক গাছ লাগাবেন।

নেত্রীর সফর সঙ্গীদের মধ্য থেকে একজন বললেন, শেয়ারে গাছ লাগাবেন। ছেলেরা খেতে পারবে।

সহে সহে বিরোধী দলীয় নেত্রী বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ পেছারা গাছ লাগাবেন। এই ছেলেরা খেতে পারবে। অরুণের নেত্রী সিনে এসেন আর নিজ বাড়িতে।

সাময়িক এক নায়ক জেনারেল এরশাদ একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান। জননেত্রী শেখ হাসিনা তার (এরশাদের) হারান ইয়াল পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় নেত্রী। অপর দিকে বৃহৎ বেগম খালেদা জিয়া আপোদহীন অনাক্ষয় মিত্রের কাত সংগঠন বি, এন, পিকে শক্ত জিহের উপর হাঁড় করিয়ে একক আন্দোলনের চেঁচায় কত।

জনগণের কাছে ধীরে ধীরে বেগম খালেদা জিয়া আপোদহীন নেত্রী হিসেবে ঠাঁই শোভে তুল করেছেন এবং মাঝে মাঝে জাঙ্গোলনের কর্মসূচী দেওয়ার আরম্ভ করেছেন। বেগম জিয়ার আন্দোলনের কর্মসূচীর সঙ্গে ভাল মিলিয়ে শেখ হাসিনাও কৌশলে কর্মসূচী দিয়ে যাচ্ছেন।

## আন্দোলন আন্দোলন বিজা

ইরাকার জেনারেল এরশাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে দেখে, বেগম খালেদা জিয়া একক আন্দোলন করতে কলিকত ফল আসবে না ভেবে, মটির মাইকেল আয়োজী আন্দোলনের অস্তিত্বের বিষয়ে প্রশ্ন করলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জবাব দেন “আমি (শেখ হাসিনা) আমি ম্যাকামের (খালেদা জিয়া) পিছনে পিছনে। ম্যাকাম (খালেদা জিয়া) যে কর্মসূচী দেবে, আমিও (শেখ হাসিনা) সেই কর্মসূচী দেব। যাতে মনে হয় আমি (শেখ হাসিনা)

এ আন্দোলনে আছি। আন্দোলন সফর করে জেলাসহ গ্রামে আওয়ামী লীগ কর্মীদের বসিষ্ঠ ভূমিকার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে জনসেন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন আওয়ামী লীগ কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তারা যেন আন্দোলন আন্দোলন খেলা করে কিন্তু আন্দোলন যেন না করে। অর্থাৎ আন্দোলনের সাথে থেকে আন্দোলনের নিষ্ঠা ছুঁই দায়তে হবে। মাতামতে (খালেদা জিয়া) ব্যর্থ করে খাওে বসিয়ে দিতে হবে, আর ঘাওে প্রকনীতির নাম না দেয়। জনগণ এবং আওয়ামী লীগের মাঠ কর্মীরা এরশাদ পতনের আন্দোলনের জন্য এতই উদ্যম যে, আন্দোলন গ্রামে বসবদ্ধ কন্যা জনসেন্ত্রী শেখ হাসিনার শরই নির্দেশ দ্বারা সত্ত্বেও তারা (আওয়ামী লীগ কর্মীরা) আন্দোলনে বসিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকে। যখন আওয়ামী লীগের কর্মীদের কাছে জনসেন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্দোলন না করার গোপন নির্দেশ পৌঁছানো হলো, তখন আওয়ামী লীগ কর্মীরা জনসেন্ত্রী শেখ হাসিনার নুখ থেকে সজানবী এই নির্দেশ তদতে চাইলো। কিন্তু বসবদ্ধ কন্যা শেখ হাসিনার পক্ষে সরাপরি এই নির্দেশ দেওয়া সহ্য হলো না।

ফলে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে থাকলেন বেধম খালেদা জিয়া আর জীবন দিতে থাকলো নূর হোসেনবহ আওয়ামী লীগ কর্মীরা।

## হিমাশির পার্লামেন্ট ভেদে দেওয়া

১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর ঢাকায় আওয়ামী যুবলীগ কর্মী নূর হোসেন কুকে "বৈরাগ্যক নিশাত থাক, আর দিঠে গলতত্ত্ব মুক্তি থাক" লিখে বিকোক্ত বিহিন করার নবর পুলিশের তলিতে মিহত হলে সেনী এবং বিনেশী বিশেষ করে বহিঃনিবন্ধের প্রচার মাধ্যমে আ তলাও করে প্রচার করে।

ফলে সামরিক একলায়ক হোলেন বোহাফন এরশাদ নুখই অসত্ত্ব এই প্রগাথিত হন। আওয়ামী লীগের কর্মীদের আন্দোলনে বসিষ্ঠ ভূমিকা থাকায় এরশাদ মনে করেন (ভুল বুঝেন) যে, শেখ হাসিনা তলে তলে কর্মীদের তার (এরশাদ) বিরুদ্ধে সেলিয়ে দিয়েছেন। তিনি (এরশাদ) এই বলে মন্তব্য করেন যে, আমার খাণে আমার গরবে, আমার আমার সাথে থাকারী। শেখ হাসিনা থাকারী করবে, আমার সাথে বৈদমানি করবে নাফরমানী করবে। আমিই (এরশাদ) শেখ হাসিনাকে বিরোধী নবীর নেত্রী মণিরে মণির মর্যাদা দিয়েছি; মণির চাইতে বেশি সুযোগ জুঝি। দেশ চালকা থেকে শুরু করে সব কিছুতেই আমাভাগী করছি। আর তলে তলে আমার (এরশাদ) সাথে থাকারী নাফরমানী। আমি (এরশাদ) আর শেখ হাসিনাকে কোন ভাগ দেব না, বিরোধী নলের নেত্রীও রাখবো না। জনসেন্ত্রী বহরজ কন্যা বিরোধী নবীর নেত্রী শেখ হাসিনা দাবদারী এস, আই চৌধুরী এবং ডি, জি, ডি, এক, আই মাহমুদুল হাসানের মাধ্যমে এরশাদকে আন্দোলনে তার (শেখ হাসিনার) অনাধহ, অনিষ্ঠা,



এবং আন্দোলনের নামে আন্দোলনের নামে সম্পৃক্ত থেকে শিহ্ন থেকে ছুরি মেতে আন্দোলনকে উত্থল করে দেওয়ার চেষ্টার বিষয়টা অনেক বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এরশাদ নাছুরবান্দা। তার এক কথা, আন্দোলনের নামে শিহ্ন থেকে আন্দোলনকে ছুরি মারতে হবে না। আন্দোলনের বিরুদ্ধে আমাদের (এরশাদকে) প্রকাশ্যে সরাসরি সমর্থন দিতে হবে। নইলে আমি (এরশাদ) পার্লামেন্টেও রাখব না, শেষ হাসিনাকেও বিরোধী দলীয় নেত্রী রাখবো না। বিরোধী দলীয় নেত্রী থাকতে হবে এবং মন্ত্রীর মর্যাদানূহ অন্যান্য সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা পেতে হবে আমাকে (এরশাদ) কোন প্রকার স্বাধিকার না করে ঢালাও ভাবে সমর্থন করতে হবে।

শেখ হাসিনা কৌশলগত স্বরূপে প্রকাশ্যে সরাসরি জালাউজ্জামে জেনারেল এরশাদকে সমর্থন করতে অসম্মতা প্রকাশ করলে অবশেষে এরশাদ ১৯৮৮ সালে মাত্র দুই বছর আগে গড়া তার (এরশাদের) মীল সন্ত্রাস পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়। এবং নতুন করে বিরোধীরা তার (এরশাদ) মীল সন্ত্রাস পার্লামেন্ট নির্বাচন দিয়ে জালাউজ্জামে আ স ম রব (খর্তমানে শেখ হাসিনার মন্ত্রী) কে পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা বানান।

## এরশাদ পতন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার

জনতা বৈরতায়ী এরশাদে বিরোধী আন্দোলনে সর্বোচ্চ ক্রোধ বীজ্যের গর্ভস্থ হয় এবং বেগম জিরা ভেতরে ভেতরে জনতার নামে আন্দোলন নেত্রী গ্রহণ প্রতিষ্ঠিত হন। অবস্থা বেগতিক দেখে শেখ হাসিনার বেগম বালেদা জিয়ার আন্দোলনের সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়া কোন পত্যান্তর থাকে না। আগে থেকেই আওয়ামী লীগের মাই কর্মীরা এরশাদ হঠাৎ আন্দোলনে তাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা বজায় রেখেছে। এখন শেখ হাসিনা বাধ্য হয়ে আন্দোলনে আন্দোলন আন্দোলন আরো বেগবান হয়েছে।

জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং দেশনেত্রী বালেদা জিরা দুই নেত্রীর আন্দোলন সঙ্গরে বৈঠক হলো। আন্দোলন আরো ক্রমে উঠলো। দুর্বীর পক্ষ আন্দোলন চপতে থাকলো। বৈরতায়ী লাংকিত একমাত্রক জেনারেল এরশাদ কার্য জারি করলো, সেনাবাহিনীকে জনগণের বিপক্ষে দাঙার নামলো। কিন্তু জনগণকে সমানো গেল না। জনগণ উৎসাহ দূর একা গড়ে জেনারেল এরশাদের কার্য ভাঙ্গলো, সেনা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ শুরু করলো। সারা দেশে পুলিশের মতো আন্দোলনের স্বাক্ষর ছড়িয়ে পড়লো। ছাত্র যুবক আর জনতার আন্দোলনের মুখে বিশ্ব বেহায়া বৈরতায়ী এরশাদের সকল কুটকৌশল আর শক্তি পরাস্ত হতে থাকলো।

জেনারেল এরশাদ ছাত্রনেতাদের ক্রয় করার জন্য দত কোটি টাকা বরচ করলো এবং জেলখানা থেকে দাবী অপরাধীদের ছাড়িয়ে এনে কোটি কোটি টাকা

আর অল্প দিনে আন্দোলন সমাপনের ব্যবস্থা করলো। এই দাবী অপরাধীরাই ১৯৯০ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর পূর্ব দক্ষিণ কোণায় দূর থেকে গুলি করে জাঃ মিলনকে হত্যা করলো। জাঃ মিলন নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাঃ জনতার আন্দোলন নাবানলের রূপ নিল। আন্দোলন নতুন হোক নিল। চিক যেমন ১৯৬৯-এ আঙ্গান হত্যার পর হয়েছিল। অনিদিষ্ট কালের হত্যা, অনিদিষ্ট কালের কার্যকূতে দেশের সমস্ত কিছু অচল। চলছিল শুধু পিকেটিং মিছিল টিয়ার গ্যাস আর গুলি।

## এরশাদ পতনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা

সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ অফিসারগণ সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল নূরুদ্দিন খান (বর্তমানে শেখ হাসিনা সরকারের মন্ত্রী)কে সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ অফিসারদের একটি গোপন বৈঠক করতে বাধ্য করলো এবং সেই বৈঠকে প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদকে আর সমর্থন না করার সিদ্ধান্ত হয়। সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল নূরুদ্দিন খানকে বৈঠকের এই সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট এরশাদকে জানিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিলে তিনি (সেনাপ্রধান নূরুদ্দিন খান) এই দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করলে নবম জিভিশনের (সাকার ক্যান্টনমেন্টের) জি, ও, সি মেজর জেনারেল আব্দুল আলীম (বর্তমানে আওয়ামী লীগের এর শি, বেড জিনেট লোমাইটির চেয়ারম্যান) বৈঠকের এই সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট এরশাদকে জানিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেন। এবং বৈঠক থেকে সোজা ঢাকা সেনাকবনে গিয়ে প্রেসিডেন্ট এরশাদকে সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ অফিসারদের বৈঠকে ডাকে (এরশাদকে) আর সমর্থন না করার সিদ্ধান্তের কথা শি জানিয়ে দেন।

তখন কৈব্রতাবী হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সম্পূর্ণ ভেঙ্গে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে এবং তারপরই পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য প্রথমে উপরত্নপতি ব্যারিটার মওদুদ আহমেদ পদত্যাগ করেন এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ উপরত্নপতি হন। তারপর রত্নপতি জেনারেল এরশাদ উপরত্নপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের কাছে পদত্যাগ করলে উপরত্নপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ অস্থায়ী রত্নপতি হন। এবং তাঁর নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদের নির্বাচন দেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম দেশের সবকয়টি রাজনৈতিক দল স্বাধীন, মুক্ত এবং সোচ্চার স্বতন্ত্রভাবে রত্নপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ-এর নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া জ্ঞাত এবং জোরদার ভাবে এগিয়ে চলাছে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল দল প্রার্থী মনোনয়ন হুজুত

করেছে। দেশের জনগণও এই প্রকার মুক্ত স্বাধীন এবং নিরাপেক্ষভাবে আমায় ভোট আনি বির যাকে বুনি ভাকে দেয়ার দৃঢ় মনোজ্ঞান নিয়ে আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সাল ভোট দেবার স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধান্ত নেয়। সারা দেশে চলছে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারাভিযান। পোষ্টার আর দেয়ার লিখনে ভরে গেছে সমস্ত জায়গা। বিরা-হাতি চলছে মিছিল মিটিং। আওয়ামী লীগ এবং বি, এন, শি মূলত এই দুইটি মতের মধ্যে তীব্র নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। বি, এন, শি এবং আওয়ামী লীগ এই দুটি দলের কোষায় কে জেতে কে হারে বলা কঠিন। এটাই মনে এক সামান্যিক নমুনাতে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলছেন বি, এন, শি দলটির বেশি নিচি পাতে না। অর্থাৎ বি, এন, শি ভিনশ (৩০০) আসনের মধ্যে দলটি (১০) আসনে বিজয়ী হবে এবং দুইশত নব্বই টি (২৯০) আসনে পরাজিত হবে বলে শেখ হাসিনা বলছেন।

চুল-কলোজ, অফিস-আলানত, ঘরে-বাইরে, মাঠে-মাঠে সর্বত্র নির্বাচনী আলোচনা আর প্রচারণা। এক কথায় নির্বাচনী প্রচারণা এখন ভূমি। আর ১০ই ফেব্রুয়ারী। দশমভি ৩২ মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ভবনের একটি কক্ষে বঙ্গবন্ধু বৈঠক বসলো। নামের ২৭শে ফেব্রুয়ারী নির্বাচন। এই নির্বাচন উপলক্ষেই আমকের বৈঠক। এই বৈঠকের আলোচনার মতর সাইকেল আরোহী হুতি দিয়ে বুঝিয়ে বলল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবে না। আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হবে এবং জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তাকার দুইটি আসনেই পরাজিত হবেন।

বৈঠকে উপস্থিত রনিউল আলম চৌধুরী (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পি এন মোকাদ্দির চৌধুরী) ক্ষিত হয়ে বলছেন, মিয়া আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবে না বলে কি? আওয়ামী লীগ তো ক্ষমতায় যেয়েই আছে। ঐ যে পাশের ঘরে বসে আছে হোম সেক্রেটারী, সংস্থাপন সচিব, পররাষ্ট্র সচিব। অন্য পাশের ঘরে বসে আছে পুলিশের আই জি। একটু আগে এসেছিল সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মুহাম্মদ বাব। তারপরও বসেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবে না। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হবে না।

মতর সাইকেল আরোহী বলে সেক্রেটারীরা (সচিবগণ) যতই বসে থাকুক, পুলিশ প্রধান, সেনাপ্রধান যতই সালাম দিয়ে যাক ২৭শে ফেব্রুয়ারী নির্বাচনে জিতে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আওয়ার সম্বলনা বুঝই কম।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্রম্ব ঘরে বলেন, তুমি এখনই বের হয়ে যাও। আর আসবে না।

বের হয়ে যেতে যেতে মতর সাইকেল আরোহী বলে নেত্রী, আপনি বের করে দিলে আমি যেখানে যেতে স্বাধা তবে না বললাম আর ক'দিন পরেই জা আপনিও বুঝবেন।

১৯৯১-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুধু বালাজানেশের নির্বাচনী ইতিহাসে নয়, উপ-মহাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে এক নব্বিরবিধীন দূর্ব্যস্ত স্থাপন করে বর শাস্ত্রী নির্বিশেষে জনগণ হাসতে হাসতে নিঃশেষের ভোটগণিতের প্রয়োগ করলো। ভোট গণনায় দেখা গেল আওয়ামী লীগ পরাজিত হলো। ঢাকার দুই আসনেই জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিপুল ভোটে ব্যক্তিগতভাবে পরাজিত হলেন। বেগম খালেদা জিয়া এবং আর মশ বি, এন, সি নির্বাচনে বিজয়ী হলেন। জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাহ্বান করে বললেন, ভোটে ভুল করেছি হয়েছে, আর নুস্রা তারুপির মাধ্যমেই আমাকে পরাজিত করা হয়েছে। আমি এই ফলাফল মানিনা এবং বেগম জিয়া সহকারে গঠন করলে আমি এক নিমিটও খালেদা জিয়াকে মুক্ত থাকতে দেব না।

## পদত্যাগ নাটক

হঠাৎ জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণা করলেন তিনি (শেখ হাসিনা) আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। সংশ্লিষ্ট সকল মহলে এই পদত্যাগের ঘটনা আলোড়ন সৃষ্টি করলো। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা তো হতবাক: হতবাক কেন্দ্রীয় অফিস নির্বাহীরা। বলা নেই, কক্যা নেই, দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করলেন তিনি পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু তিনি (শেখ হাসিনা) পদত্যাগ করলেন কার কাছে? কোথায় তার (শেখ হাসিনার) পদত্যাগ পত্র? দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কোন কেন্দ্রীয় নির্বাহীও কাছে সভানেত্রীর পদত্যাগ পত্র নেই। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মিটিং-এ ও তিনি পদত্যাগ করলেন না। তাহলে তিনি পদত্যাগ করলেন কোথায় এবং কার কাছে? তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণাই বা করলেন কিভাবে? সভানেত্রী শেখ হাসিনার এই পদত্যাগের বিষয় নিয়ে দলের ভেতরে ও বাইরে চলছে জল্পনা কল্পনা। কেউ বলছেন না তিনি (শেখ হাসিনা) পদত্যাগ করেননি। কেউ বলছেন, না তিনি (শেখ হাসিনা) দ্বয়ং পদত্যাগ করেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

এনিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার পদত্যাগ প্রত্যাহ্বান করার দাবীতে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীদের ব্যাপক মিছিল মিটিং এবং আয়রণ অবশন করার নির্দেশ দেন। কিন্তু জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা সভানেত্রী শেখ হাসিনার এই নির্দেশে যুবলীগ ছাত্রলীগের কর্মীরা ভেদমন শাড়া না দিলে এবং পত্রপত্রিকা পদত্যাগ নাটক নিয়ে হুই চই বক করলে, দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা দলের সাধারণ সম্পাদিকা সাজেদা চৌধুরীকে (বর্তমানে শেখ হাসিনার মন্ত্রীসভার বন ও পরিবেশ মন্ত্রী) সভানেত্রীর পদত্যাগ পত্র ছিঁড়ে ফেলছেন বলে ঘোষণা দেওয়ার জন্য আরশন দাই অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সাজেদা চৌধুরী



জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর (সাজেনা চৌধুরী) কাছে পদত্যাগ পত্র দিলে তিনি তা ছিড়ে ফেলছেন বলে ঘোষণা দেন। এবং পদত্যাগ নাটকের অবসান ঘটান।

মুঠর সাইকেল আরোহী পুনরায় ফিরে এলে জননেত্রী বহুবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সম্মুখে তার (শেখ হাসিনার) ব্যক্তিগত পরামর্শকের দায়িত্ব ও মর্যাদা পুনরায় ফিরিয়ে দেন। মুঠর সাইকেল আরোহী জননেত্রী বহুবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে সদ্য সমাপ্ত নির্বাচন সম্পর্কে এবং নতুন সরকার সম্পর্কে আর কোন কঠোর উক্তি না করে বৈদ্য যত্নে অপেক্ষা করার পরামর্শ দেয়।

## সামান্য বিনিময়ে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের হলে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হাজী মকবুল হোসেন (বর্তমানে আওয়ামী লীগের ধানমন্ডি মোহাম্মদপুর থানা এম, বি, এবং মোহাম্মদপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি) কে তিরিশ (৩০) লক্ষ টাকা বিনিময়ে আওয়ামী লীগের দল থেকে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী করেন। অন্যদিকে এরশাদ এবং তার দল জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হাছনার চৌধুরী রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হন। বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হাজী মকবুলকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করে রাখলে তার (শেখ হাসিনার) এবং তার দল আওয়ামী লীগের ভাবমূর্ত্তি ক্ষুণ্ণ হবে; ঐতিহ্য নষ্ট হবে ইত্যাদি বুদ্ধিতে সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হাছনার চৌধুরীকে সম্মিলিত বিরোধী দলীয় প্রার্থী করার পরামর্শ দিলে এক পর্যায়ে তিনি (শেখ হাসিনা) রাজি হন। এবং বিচারপতি বদরুল হাছনার চৌধুরীকে ধানমন্ডি ব্রিটিশ লাকারে বহুবন্ধু কন্যা থেকে এনে অলাপ-অলোচনা শেষে, জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিচারপতি বদরুল হাছনার চৌধুরীকে জাহাজে ইসলামী বাংলাদেশের আমির মুক্ অপরার্থী ৭১-এর ব্যক্তিগত অধ্যাপক খেলাফত জামেদর সঙ্গে লেবা করে নোয়া দিবে আসার জন্য বলেন।

এদিকে হাজী মকবুল হোসেনকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থীতা প্রত্যাহার করার অন্য বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিলেন হাজী মকবুল প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে গড়িমসি শুরু করে। এক পর্যায়ে হাজী মকবুল হোসেন বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে লেভা তার তিরিশ লক্ষ টাকা ফেরত না পেলে রাষ্ট্রপতি প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে অস্বীকৃতি জানায়।

তখন জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ধানমন্ডি ব্রিটিশ লাকারে বহুবন্ধু কন্যা লোক দিয়ে হাজী মকবুল হোসেনকে থেকে (প্রায় ধরে এনে) এনে প্রথমে ঘরকে জিজ্ঞাসা করেন তার (মকবুল) হাতো মোকেত পক্ষে

আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও কি না? তাও পর বলেন, আমি (শেখ হাসিনা) আপনার সঙ্গে লোককে আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করে নিরল সম্মানের ও মর্যাদার অধিকারী করেছি। এটা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? জাহাঙ্গীর নির্ভরম্ভে জো জিতবেনই না। রাষ্ট্রপতি তো হতেই পারবেন না। এখন সম্মানের সাথে সুপচাপ সঙ্গে পড়ুন।

হাজী নকরুল আমিন আমজা করতে থাকলো নকরুল কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, আপনি যা করেছেন, যা নিয়েছেন ভবিষ্যতে আমি তা মনে রাখবো এবং পুণিয়ে দিব। এই নিয়ে আর উত্তরাদ করতে ভবিষ্যতে পোয়াবেন না। বিশেষত পদত্যাগ করে আমার প্রতি আশুপতা দেখান। অতঃপর আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী নকরুল হোসেন ভবিষ্যতের আশাহ প্রার্থীতা প্রত্যাখ্যান করে জননেত্রী নকরুল কন্যা শেখ হাসিনার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

## জাহানারা ইমাম ও শেখ হাসিনা

বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং শেখ হাসিনা বিরোধী দলীয় নেত্রী। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার মাঝে সংযোগিতা সম্প্রীতি দুজনের কথা বহু বৈরীতা এবং হিংসা অস্তিত্বে চোখে আরো উত্তে হলো।

এই সুযোগে অধীনতা বিরোধী মৌলবাদী রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলামী তাদের নেপথ্যের মূল নেতা মুহু অপরাধী খাতক গোলাম আমজতে জামাতে ইসলামীর আহিব (প্রধান) বাণায়। এর প্রতিবাদে এবং মুহু অপরাধী খাতক গোলাম আমজদসহ সকল মুহু অপরাধীর বিচারের দাবীতে ১৯৯২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী শহীদ জননী জাহানারা ইমাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রাজ্যবর্জন ও '৭১-এর খাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি নামে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলেন এবং আন্দোলন শুরু করেন। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই নতুন সংগঠনের আন্দোলন কর্মসূচীতে জনগণ ব্যাপক সাড়া দিলো। নতুন প্রজন্ম শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ও কর্মসূচীতে দারুণ উৎসাহ ও আস্থা নিয়ে অংশগ্রহণ করতে থাকলে বহুবহু কন্যা বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তিনি (শেখ হাসিনা) কেবলই বলতে থাকেন জাহানারা ইমাম নতুন দোকান বুলেছে। নতুন ব্যবসা ধরেছে, নেত্রী হতে চায়, জননেত্রী হতে চায়। ব্যবসার জাচণা পায় না, মুক্তিযুদ্ধের নাম নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে।

মটর সাইকেল আরোহী বলবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বলে, নেত্রী একি বলেছেন আপনি? সন্দেহ জাতি জানে জাহানারা ইমাম শহীদ জননী। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে তাঁর (জাহানারা ইমাম) ছেলে রুমি শহীদ হয়েছে। তিনি শহীদ জননী। আর আপনি একি বলছেন?

বলবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা উত্তেজিত হয়ে বলেন, ভাখ ভোমরা শহীদ জননী। ও কিসের শহীদ জননী। ওর ছেলে রুমি লুটপাট করতে যেয়ে নিজেনের ভলিফেই মারা গেছে। ওর স্বামী '৭১ সালে যুদ্ধের সময় আর্মিদের সাপ্লাই করতো।

মটর সাইকেল আরোহী বলে, একি বলেছেন নেত্রী। এমন কথা জননমকে বললে হিতে বিপরীত হবে।

বলবন্ধু কন্যা বলেন, এই জন্যই তো দমনবন্ধ করে চুপ করে আছি। এবং ভোমাদের বলে রাখছি, তোমরা এগুলো বাইরে বলবে। ওরা (জাহানারা ইমাম) মানমতি বক্তিশের রাজ্যে চুকতেই ডান দিকের কোণায় প্রথম ২য় তলা বাড়িতে থাকতো। আমাদের বাড়ির (খানমতি বক্তিশের বলবন্ধু ভবনের) পূর্ব দিকের প্রথম বাড়িটার থাকতো। জাহানারা ইমামদেরও পাকিস্তানী আর্মির পাহারা দিয়ে রাখতো। জাহানারা ইমামের জামাই (স্বামী) পাকিস্তানী আর্মিদের সাপ্লাই করতো। ঐ সময় প্রচুর টাকা পচসা কামিয়েছে ওরা। আর এখন এসেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করতে। আসলে এ (জাহানারা ইমাম) এসেছে আমার নেতৃত্ব দখল করতে। আমি নির্বচনে হেরেছি এই মুহোণে তলে তলে বাংলাদেশ জিয়ার সাথে সাইন করে জননেত্রী হওয়ার পরিকল্পনা আছে জাহানারা ইমাম। আর তাই গোলাম আযমের বিচার, মুক্ত অপরোধীদের বিচার, মুক্তি যুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ইত্যাদি নানা কথার আড়ালে নেত্রী হওয়ার খাচ্ছেন আছে। ভোমরা এর থেকে সাবধান থাকবে এবং আমাদের সকল কর্মীদের সাবধান থাকবে। কেউ যেন জাহানারা ইমামের ধ্বংস না পড়ে।

মটর সাইকেল আরোহীর প্রশ্ন, নেত্রী (শেখ হাসিনা) আপনি কি জাহানারা ইমামের স্বাক্ষর, দাখাল নির্মূল কমিটিতে কর্মসূচীতে যাবেন না?

বলবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার জবাব দেন, সে আমি যাই বা না যাই ভোমরা যাবে না। আর আগামী মীশের কোন কর্মীকে যেতে দেবে না। বুঝ না, আমার তো ইচ্ছে না থাকলেও অনেক আচরণ্য বেতে হয়। জাহানারা ইমামের মুক্তিযুদ্ধের নামে দেওয়া কর্মসূচীতে হয়তো আমি (শেখ হাসিনা) কৌশলগত কারণে যাব। কিন্তু ভোমরা যাবে না।

## গোলাম আযম ও শেখ হাসিনা বৈঠক

শহীদ জননী জাহানারা ইমাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ব্যক্তব্যক্তন ও '৭১-এর খাতক নাগাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বায়িকা হিসেবে খাতক গোলাম আযমসহ মুক্তিগরাধীদের বিচারের জন্য গণআদালত গঠন করেন।

১৯৯২ সালের ২৪শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের সভাপতিত্বে গণ-আদালত খাতক হুজু অপরাধী গোলাম আযমকে ১০টি অভিযোগে ফাঁসির রায় দেয়। গণ-আদালতের দেওয়া গোলাম আযমের ফাঁসির এই রায় কার্যকরী করার জন্য শহীদ জননী জাহানারা ইমাম সরকারের কাছে আহ্বান জানালে এবং গণ-আদালতে এই রায় কার্যকর করার দাবীতে আন্দোলনের কর্মসূচী দিলে মুক্তিগরাধী খাতক গোলাম আযম শেখ হেলাল উদ্দিন (শেখ হেলাল উদ্দিন বহুবক্ত শেখ মুজিবের একমাত্র আপন ভাই শেখ নাসেরের বড় ছেলে শেখ হাসিনার আপন চাচাভো ভাই। বর্তমানে রাণের হাটের মোস্তাফ হাট ও ফকিরের হাট নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগের এমপি) এর ইমিরা রোডের বাসায় বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী বহুবক্ত কন্যা শেখ হাসিনার সাথে গোপন বৈঠকে বসে। এই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয় খাতক গোলাম আযম ও তার দল জামাতে ইসলামী (জামাত) আর বি, এন, পি,র লেজুরবৃত্তি না করে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে সর্বোত্তমভাবে সমর্থন ও সাহায্য সহযোগীতা করবে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সাথে মিলে খালেদা জিয়া ও বি, এন, পি সরকার পতনের আন্দোলন করবে। বিনিময়ে জননেত্রী বহুবক্ত কন্যা শেখ হাসিনা মুক্তিগরাধী খাতক গোলাম আযমের ফাঁসি কার্যকর করার দাবীতে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গড়ে উঠা গণ-আন্দোলন এবং গণ আদালত রসায় ও রানচাল করার দায়িত্ব নেন। সেই থেকে খাতক গোলাম আযম আর বহুবক্ত কন্যা শেখ হাসিনার সাথে গড়ে ওঠে গোপন নিষিদ্ধ ঐক্য ও সম্পর্ক।

## ১৯৯২-এর হিন্দু-মুসলিম রায়ট

১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সার্কের চেয়ারম্যান। সার্কেট্র সাতটি রাষ্ট্রের শীর্ষ সচিবলন ঢাকায়। সাত রাষ্ট্রের শীর্ষ সচিবলনের নিমন্ত্রণ হুান নির্ধারণ করা হয়েছে। সার্কেট্র চেয়ারপার্সন হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া শীর্ষ সচিবলন উদ্বোধন করবেন। শীর্ষ সচিবলন উপলক্ষে কোন কোন রাষ্ট্রের সরকার প্রধানগণ আনতেও বক্ত করবেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসীম রাও এখনও ঢাকায় পৌছননি। একই মধো ভারতে বঙ্গবী রসজিৎকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা হিন্দু-মুসলিম রায়ট শুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলীয় নেত্রী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বহুবক্ত কন্যা শেখ হাসিনা জরুরী ডিরিতে মটর সাইকেল আরোহীকে ডাকলেন। মটর



সাইকেল আরোহী ২৯নং সিট্টা রোডে নিজস্ব দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার  
দ্বারা উপস্থিত হলে বাবুটি বিরোধ নেতৃত্বে এসে শব্দ দেয় যে, আমরা (শেখ  
হাসিনা) আপনাকে এখনই খানমন্ডি বস্ত্রিশে বন্দবস্ত করবো যেতে বলেছেন।

মটর সাইকেল আরোহী বস্ত্রিশে পৌছলে সঙ্গে সঙ্গে জননেত্রী শেখ হাসিনা  
তারক বন্দবস্ত করবার সাইকেলী ক্রমে ভেঁকে বলেন, সারা দেশে হিন্দু মুসলিম  
বায়ট (নাশ্রুনাশিক দায়) লাগিয়ে দাও।

মটর সাইকেল আরোহী বলে, এটা ঠিক হবে না।

নেত্রী বলেন, ঠিক-বেঠিক তোমার জবাবও হবে না, বায়ট লাগাতে বলেছি,  
তুমি লাগাও।

মটর সাইকেল আরোহী বলে, আপনি এটা বলেন কি? আমি আরো সাত-  
দশ শতাব্দী করে পাড়ার মহাশয় মুফক্কদের নিকট করে যোগেছি যাতে করে  
হিন্দুদের উপর কোন প্রকার আক্রমণ না হয়। আর আপনি বলছেন বায়ট লাগিয়ে  
দিতে:

নেত্রী বলেন, হ্যাঁ আমি বলছি, তুমি বায়ট লাগাও।

মটর সাইকেল আরোহী বলে, না নেত্রী, এটা ঠিকিফিলস কাফ।

নেত্রী রাগান্বিত হয়ে বলেন, আর মোশার সন্তি ফিতি। আমি যা বলছি তাই  
করো। আমি তোমাদের নেত্রী না তুমি আমার নেত্রী? আমাকে যদি নেত্রী মানো  
তাইলে আমি যা বলবো তাই করতে হবে।

মটর সাইকেল আরোহী বলে, আপনিই তো আমাদের নেত্রী, আপনি যা  
বলবেন তাই তো গিরোধার্য। তবে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করলে হিন্দুরা আর  
এদেশে থাকবে না। সবাই চলে যাবে। আর এই হিন্দুরা তো আমাদেরই ষোড়।  
আমাদেরই রিয়ার্ড জোটার।

নেত্রী বলেন, আর, যাবে কোথায়? যাবার আয়না নেই। তুমি বায়ট লাগাও।

মটর সাইকেল আরোহী বলে, হিন্দুরা আরও দশ গণে ভারত থেকে যে  
মুসলমান আসলে সে মুসলমানের সবাই হবে ধানের শীষ, মানে বি, এম, সি।  
এটা কি ভেবে দেখেছেন নেত্রী?

নেত্রী বলেন, আরে যোকা সার্ক সন্ডেলন পড় করতে হবে না। কয়েক দিন  
পরেই সার্ক সন্ডেলন। খালেনা জিয়া সার্ক সন্ডেলন উল্লোখন করবে। ইতিমধ্যে  
প্রাইমমিনিষ্টার নরসীমা সার্ক এখনও আসে মাই। এই-ই সুযোগ, এমনই রাষ্ট্র  
পরিষদে দিলে সার্ক সন্ডেলন পড় হয়ে যাবে। তাছাড়া জাহানারা ইমাম যেভাবে  
জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তাকেও তো সাইজ করতে হবে। জাহানারা ইমাম আমার  
নেতৃত্বের প্রতি হুমকি। যেভাবে সে দিনকে দিন শক্তিবুদ্ধির ধারক-বাহক হয়ে  
যাচ্ছে তা ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে (জাহানারা ইমাম) আর ছাড়  
নেওয়ার মাত্র না, এই সুযোগ। এই সুযোগেই জাহানারা ইমামকে জনগণ থেকে  
বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। এক ডিলে দুই পাণি। সার্ক সন্ডেলন পড়, জাহানারা

ইমাম সাইজ। তুমি রামট লাগাও। হিন্দুদের উপর হামলা কর। এদেশের সকল হিন্দুরাই এখন জাহানারা ইমামের পিছনে চলে গেছে।

ঢাকার রায়ট বা হিন্দু-মুসলমান বাসা লাগানোর ন্যায়িত্ব নেওয়া হলে মটর সাইকেল আরোহীকে এবং নিম্নোক্ত হল ২৯ মিটার মোত বিরোধী দলের নেত্রী বাসার এবং ধানমন্ডি বস্ত্রিশ মহলে বসবস্তু কবনের টেলিফোন ব্যবহার না করে বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনার ডায়ালগে ডাটা বসবস্তু ট্রাফিক মহলটির শেখ জামিলুর রহমানের বাসার টেলিফোন থেকে ঢাকার রাইডের জেলা-লোকে হিন্দু মুসলমান রায়ট লাগানোর নির্দেশ দেওয়া হবে। বাসেনা জিয়া সরকার হাতে বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনা কর্তৃক রায়ট লাগানের পরিস্থিতি টের না পায় সেই জন্য এই সতর্কতা।

বিরোধী দলীয় নেত্রী বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনার পরিস্থিতি ও নিম্নোক্ত অনুযায়ী প্রকৃত পরিস্থিতি হিন্দু মুসলমান রায়ট লাগানের জন্য সারা ঢাকা শহরের সকল ওজা বসবস্তু এবং সম্মানীয় হাতে নগন পাঠ (৫) লক্ষ টাকা ধুলে দেওয়া হলো। বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনার কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার জন্য এখনই বাওয়া হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলের পূর্ব পাশে অবস্থিত শিববাড়ী মন্দিরে। সেখানে দেখা গেল লুটেরা আর সুযোগ সন্ধানীদের জটকা। এই জটকাধারী লুটেরা সুযোগ সন্ধানীদের হাতে সঙ্গেপনে একাধিক একশত (১০০) টাকার কড়কড়ে নোট কীয়ে নিয়েই বলা হলো, আরতে মুসলমানদের খুল করা হচ্ছে, মুসলমান নারীদের ইচ্ছা আর মন সম্পন্ন লুট করে দেওয়া হচ্ছে। আর আমরা বাংলাদেশের মুসলমানরা দুর্গতাপ চেয়ে চেয়ে দেখছি, তনছি। যান শুরু করেন, নেন, লুট করে নেন।

সকাল সঙ্গে সঙ্গেই সুযোগ সন্ধানী লুটেরা হই হই করে মহা উৎসবে শিববাড়ী মন্দিরে লুটপাট শুরু করে দিল। সেখানে থেকে চলে আসা হলো ঢাকাখরী মন্দিরে। এখানেও উৎসুক সুযোগ সন্ধানী লুটেরার জটকা। এখানেও নগন টাকা আর একই ক্যাডার বক্তৃতা এবং ঢাকেশ্বরী মন্দির লুট। এরপর এল রামকৃষ্ণ মিশন। নগন অর্থ আর বক্তৃতায় কাজ হলো। রামকৃষ্ণ মিশন এ লুটপাট শুরু হলো। তারপর যাওয়া হলো পুরান ঢাকার ভাতি বাজার, শাখারিপাট, বালোবাজার, মালাকাটোলা, মিলবারাক, গুলাই বাড়ী, নাটিকা, টিকাটুলি, ইনলামপুর ইত্যাদি আয়তায়। কিন্তু যা, এটা পুরোনো ঢাকা, এখানে সবাই পরিচিত। এখানে কর্তৃত্ব করা যাবে না। এখানে শুধু ঢাকার উপর দিলে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বিভিন্ন মহান সন্ধানীও নেশা-খোর প্রকৃতি প্রভৃতি টাকা দেওয়া হলো। টাকার কথা কললো। পুরাতন ঢাকায় হিন্দুদের সোকাশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাড়ীঘরে লুটপাট আরম্ভ হলো।

দলী জিন/মারেক পরে ধানমন্ডি বস্ত্রিশ মাঝারে বসবস্তু কবনে বিরোধী দলীয় নেত্রী বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনাকে সারা ঢাকা শহরে হিন্দু মুসলিম লাঞ্ছনাময়িক দাঙ্গা বা রায়ট লাগিয়ে দেওয়ার সকল সংকল্প দিলে তিনি বেজায় খুশিতে আত্মপ্ত হয়ে

বলে ওঠেন, এই ভো কাজের ছেলে। তুমি না হলে কি ছা? তাই ভো আমি তোমাকে খুঁজি। শানদের নির্বাচনে তোমাকে আমি মোকসেদপুর থেকে (গোপালগঞ্জের মোকসেদপুর কাশিজনী আসন) এম. পি. বানার।

সারা দেশে হিন্দু-মুসলমান ছায়াট তরু হলো। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রায়ও ঢাকা এলেন না। মার্ক সংগঠন পড় হলো।

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৯২ সাল, বৃহস্পতিবার, যাত্রক দালাল নির্মূল কমিটির নেত্রী শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ডাকে গণআন্দোলিত কর্তৃক ঘোষিত দুদ্ধাপত্রী গোলাম আযমের ফাঁসির রায় কার্যকর করার দাবীতে মানব-বন্ধন কর্মসূচীতে হিন্দু সম্প্রদায় যোগদান করলো না।

আজ শুধুমাত্র দিন আগে নটে মাওয়া হিন্দু-মুসলমান ছায়াটের কারণে দুদ্ধাপত্রী যাত্রক গোলাম আযমের ফাঁসির দাবীতে মানব-বন্ধন কর্মসূচীতে হিন্দু সম্প্রদায় যোগদান করবে না, এটা ছায় নিশ্চিত ছিল। আর সেই কারণেই যাত্রক দালাল নির্মূল ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন কমিটির নেত্রী শহীদ জননী জাহানারা ইমাম আগে থেকেই আমরা দ্বারা মুক্তিযোদ্ধা আন্দোলের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করে বড়-বাহুব, পরিবার পরিজন নিয়ে ১৩ই ডিসেম্বর-এই মানব বন্ধন কর্মসূচীতে যোগদান করার আহবান জানান, একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শহীদ জননী আহবান শোনা না গিয়ে পারিনি।

তাহাড়া হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দালাল নৃশি জামাকে মর্মে মর্মে আনাড় করছিল। ও জনাই বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে না জানিয়ে তারার একমাত্র শিও কন্যা বর্ণিতা ও প্রিয়তমা স্ত্রী মনোকে সঙ্গে নিয়ে মানব-বন্ধন কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করি। মানব-বন্ধন কর্মসূচীর পনের দিন ১১ই ডিসেম্বর ১৯৯২ সাল তেবার সৈনিক ভোবের কাগজ ও সৈনিক আত্মকের কাগজ-এই প্রথম পাতার বড় করে আমাদের (আমি, আমার কন্যা এবং আমার স্ত্রীর) ছবি ছেপে গিও নিউজ করে।

ভোবের কাগজ ও আত্মকের কাগজের এই ছবি দেখে ছন্দনেত্রী বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ভীষণ রেবে মান এবং টেলিফোনের মাধ্যমে আমাকে অকস্মী তলব করেন।

সকাল গণটা মাগাল ২৯ মিটেই রেবে-এ বিদ্রোহী সন্দীত নেত্রী শেখ হাসিনার দালতবনে পৌঁছে কঠোর সিদ্ধি নিয়ে সোভালার ব্যালকনিতে উঠে দেখি বহুবন্ধু কন্যা গমীর হয়ে বেস্তের চেয়ারে বসে আছেন। আনাকে দেখেই ভোবের কাগজ ও আত্মকের কাগজ পত্রিকা দু'টি আমার দিকে হুঁড়ে মেবে উত্তেজিত হয়ে বসলেন, এই তোমাদের বিশ্বাস। মুখে এক কথা আর কাজে আর এক।

পত্রিকা দু'টি হাতে নিলাম এবং এই প্রথম সপরিবারে পত্রিকায় নিজেদের ছবি দেখে বুকে কেলগাম খটনা অনেক ব্যাপার। আজ কথালে অনেক দ্বাদ্যনি আছে।





বহুবদ্ধ কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বলতে লাগলেন, নেতৃত্বের প্রতি এই তোমানের আস্থা, এই বিশ্বাস, এই আনুগত্য। যেখানে আমি নিয়ে জাহানারা ইমানের কর্মসূচীতে তোমানের অংশ গ্রহণ করতে নিবেদন করেছি এবং অন্য কর্মীরা যাতে অংশ গ্রহণ করতে না পারে তার চারিদিক তোমাকে দিয়েছি, সেখানে তুমি নিজেই কোন জার্সলে খট খাট নিয়ে হাজির হলে? একমিকে থাক। জাহানারা পছন্দ হয়, জাহানারা ইমামকে দিয়েই থাক। আমার দিকে আর এসো না।

আমি হুপ করে অবস্থি এখন কি বলা যায়, মাথায় একটা মুক্তি এসে। ঘরে ঘরে বললাম, নেত্রী আমি কিছু বলতে চাই।

তুমি আবার কি বলবে, তোমার আবার কি বলার আছে? বল।

নেত্রী, আমরা তো আসলে মেয়ে (স্বর্ণভাষ) জুতা কেনার জন্য একিচ্ছেই রোজ মাঝিলাম। কিন্তু আপনার নির্দেশ পালন করার জন্য একটা আগে আগেই বেড়িয়ে ছিলাম। এবং প্রেক্ষাগার এসে অস্তিত্ব ত্রিশ কক্ষকে কানে কানে জাহানারা ইমামের এই কর্মসূচীতে যোগ না দেওয়ার আপনার নির্দেশ আনিয়া বিদায় করেছি। কিন্তু কটো সাংবাদিকদের বজর থেকে বাচতে পারলাম না। তারা নাছোড়খানা, কটো না তুলে ছাড়লেই না। আসলে এটা মানব-বহন কর্মসূচির কটো না। কৃত্রিমভাবে তোলা এই ছবি। মাত্র কয়েক দিন আগে রাইট হয়ে গেল। মৌলবাদীরাও নজির, দেশের এই উত্তম পরিচিতি আমি খট খাট নিয়ে জাহানারা ইমামের মানব-বহন কর্মসূচীতে দান? আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমরা শুধু আপনার নির্দেশ পালন করার জন্যই এই ভুক্তি নিয়ে সেখানে গিয়েছি।

তোমরা তো এই বকমই কাজ করবা, হিতে নিপন্ন করবা, তোমাদের নিয়ে যদি একটুও নিশ্চিত থাক যায়। শুধু এইবার চেল্য, যবাই পত্রিকার ছবিতে দেখবে শেখ হাসিনার নিজস্ব লোকেই জাহানারা ইমামের কর্মসূচীতে। এখন আর কাকে নিবেদন করবা না মাগয়ার জন্য। তোমাদের নিয়ে আমার হত জালা।

## ফেরি আটকিয়ে ফেলে রাখা

জননেত্রী বহুবদ্ধ কন্যা শেখ হাসিনা তার সরকারী বাসভবন ২৯ বিটো রোডে দুপুরের খাওয়া খেতে খেতে বললেন, বেশ কিছুদিন হলো টুপি পাড়া যাই না। চল আগামী কাল টুপি পাড়ার যাই। আই ডব্লিউ টি এ (অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন) কে বিশেষ (স্পেশিয়াল) ফেরী রাখার নির্দেশ নিয়ে দাও।

নেত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হলো কোন পথে যাত্রা হবে? আবিটা নিয়ে না মাগয়া নিয়ে?

বহুবন্ধু কন্যা বললেন, অগ্নিচিহ্ন দিয়ে অনেক ঘুরা হয়, অনেক নৈরীও হয়। আর মাওয়া নিয়ে পথ কম। সময়ও কম লাগে। মাওয়া নিয়েই যাব। মাওয়ায় তিন ঘাটে (অর্থাৎ ধলেশ্বর নদীর দুই ঘাটে দুইটি এবং পলা নদীর ঘাটে একটি) তিনটি স্পেশাল (বিশেষ) ফেরী রাখার নির্দেশ আই ভবুট্টি টিএ কে দিয়ে দাও। স্পেশিয়াল জলেন হলো: ডেক থেকে যতক্ষণ বসবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ফেরী পার না হবেন ডাক্তরও পর্যন্ত ফেরীগুলো গাড়ীর পড়াকা লাগিয়ে ঘাটের পাশে বাড়িয়ে থাকবে। এই স্পেশাল হয়ে থাকা ফেরীগুলোতে কোন যানবাহন এবং মানুষ পার করা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা পার না হবেন। ফলে প্রচণ্ড মাম জট এবং নদী পারাপারের মানুষ কষ্ট হবেন। দক্ষিণে পর দক্ষিণ এমন কি সারাদিন পর্যন্ত মানুষ এবং যানবাহন ফেরীতে নদী পারাপারের জন্য ঘাটে বসে থাকবে। জনসাধারণের এই সীমাহীন দুর্ভোগের কথা ভেবেই বসবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বলা হলো নেত্রী, মাওয়া রোডে তিনটি ফেরী বিশেষ করে ধলেশ্বরী নদীর দুই ঘাটে দুইটি ফেরী স্পেশাল করে রেখে দিলে এই সাতার প্রচণ্ড যানজট হবে। মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ হবে। তার চেয়ে অগ্নিচিহ্ন দিয়ে একটি ফেরী পার হতে হয়, আমরা অগ্নিচিহ্ন দিয়ে আই।

উত্তরে বসবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, যানজট হবে দুর্ভোগ হবে আই বলে কি আমি পথ চলা ছেড়ে দিই? অগ্নি মাওয়া নিয়েই যাব। ভূমি আই ভবুট্টি টিকে তিনটি ফেরী স্পেশাল করার নির্দেশ দাও। যে কথা নেই কাজ। টেলিকোমে আই ভবুট্টি টি একে মাওয়া ঘাটে তিনটি ফেরী স্পেশাল করার নির্দেশ দেওয়া হলো। সাতক মিটৌ রোড থেকে বিনায় নিয়ে আসার সময় জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বললেন, নেত্রী, আমার বাসা থেকে বুড়িগঙ্গা (মেত্রী মেতু) খ্রীজ অর্থাৎ মাওয়া রোড তার পাঁচ মিনিটের দূরত্ব আমি মিটৌ বোজের উল্টে। সাতার না এসে বুড়িগঙ্গা খ্রীজ থেকে আপনার সাথে একত্রিত হতে চাই।

নেত্রী বললেন, না উল্টে আসবে কেন, ভূমি বুড়িগঙ্গা খ্রীজ থেকেই একত্রিত হয়ো। আর সঙ্গে ছানাকে (বরনা মানে আমার ছী) নিয়ে নিও।

সিক আছে নেত্রী।

বলে বিদায় নিলাম।

পরদিন সকাল সাতটার আনাদের বাড়িতে করে ছী। ময়না আর কন্যা স্বর্ণপত্রাকে সঙ্গে নিয়ে অওয়ানা হলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বুড়িগঙ্গা খ্রীজে পৌঁছে বসবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার অপেক্ষায় বইলো। জননেত্রী শেখ হাসিনার সকাল সাতটার রওয়ানা হওয়ার কথা এবং অবশ্যই সাতক সাতটা আটটার মধ্যে বুড়িগঙ্গা খ্রীজে পৌঁছান কথা। সাতক আটটা পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা খ্রীজে অপেক্ষা করে নেত্রী না আসার ধলেশ্বর ফেরী ঘাটে অপেক্ষা

কবরো চিহ্না করে চলে এলো। ধলেশ্বরের প্রথম ফেরী ঘাটে এসে দেখি জাতীয় পতাকা টাঙ্গিয়ে একটি ফেরী-ঘাটের পাশে বহুবকু কন্যা অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে পুলিশ বাহিনীর একটি দল। আর ফেরীঘাটে অলরেডি বান্ধুট ওক হয়ে গেছে। ঘাটের দু'টি ফেরীও বন্ধো একটি স্পেশাল হয়ে আছে। অবশিষ্টটি বান্ধাবান পার করে ফলাতে পারছে না। সেখা দশটা বেজে গেল। অথচ বিদ্রোহী দলীয় নেত্রী শেষ হাসিনা আসছেন না; তবে কি কর্মসূচীর কোন পরিবর্তন হলো? পুলিশ বাহিনীর অফিসারের কাছে জিজ্ঞাস করলাম। পুলিশ অফিসার বললো, আমরা তো বিদ্রোহী দলীয় নেত্রী এই পথে যাবেন সেই ভিউটিতেই আছি।

এক পর আমি প্রথম ফেরী ঘাট পার হয়ে দ্বিতীয় ফেরী ঘাটে এসে দেখলাম এখানেও একটি ফেরী জাতীয় পতাকা টাঙ্গিয়ে স্পেশাল হয়ে বহুবকু কন্যা শেষ হাসিনার অপেক্ষা করছে। আর পারাপারের অপেক্ষার থাকা মানুষের লীনাহীন দুর্ভোগ জন্ম হয়ে গেছে। ধলেশ্বরের দ্বিতীয় ফেরীও বেলা বাড়েটা মাঝামাঝি হয়ে এলো। এবার এলাম মাঝরা ফেরী ঘাটে। এখানেও একটা সুন্দর বড় ফেরী সবুজ লাল জাতীয় পতাকা টাঙ্গিয়ে ঘাটের বাইরে অপেক্ষা করছে। পুলিশের একটি বিশেষ দলও এখানে অপেক্ষা করছে।

আমরা ত্রী মননাকে বললাম, একটা ফেরী এলেই আমরা পরা পার হয়ে ফরিদপুরের ভাঙ্গা ঘেয়ে অপেক্ষা করবো। কারণ দশা তো যায় না, বহুবকু কন্যা শেষ হাসিনা আবারা দ্বিধে চলে যেতে পারেন।

মননা বললো, দূর তা হয় না। এখানে তিন তিনটা ফেরী অপেক্ষা করছে, জায়গায় জায়গায় পুলিশ বাহিনী অপেক্ষা করছে। নেত্রী আরিচা দিয়ে চলে গেলে অবশ্যই একটা সংবাদ (ইনফরমেশন) দিতেন। যাতে করে টিম-৫ (শেখ হাসিনার) অপেক্ষায় থাকা ফেরী এবং পুলিশ স্পেশাল ভিউটি যেতে বাধ্য (কাজবিক) ভিউটিতে ফিরে যেতে।

একটা বড় ফেরী এলে, আমি ফেরীতে গাড়ি তুললাম। পরা পার হয়ে ফরিদপুরের জাঙ্গায় এসে অপেক্ষা করতে থাকলাম। আদ্য দলী খানেক অপেক্ষায় থাকার পর দেখলাম বহুবকু কন্যা শেষ হাসিনার জাতীয় পতাকাবাহি গাড়ি ফরিদপুরের দিক থেকে আসছে। অর্থাৎ জননেত্রী বিদ্রোহী দলীয় নেত্রী শেষ হাসিনা আরিচা দিয়ে এসেছেন। আমাদের দেখে জননেত্রী হাত নাড়ালেন। আমরা তার (শেখ হাসিনার) গাড়ির সহরের সাথে যোগ দিলাম। চলতে থাকলাম। গোশালগঞ্জ সার্কিট হাউসে বহুবকু কন্যার সন্ধ্যা এসে থাকলাম। জননেত্রী বিদ্রোহী দলীয় নেত্রী বহুবকু কন্যা শেষ হাসিনাকে বললাম, মাঝরা দিয়ে না এসে আরিচা দিয়ে এলেন?

তিনি বললেন, কে জানি বললো মাওয়া সান্তার কাপোর্টিং সুন্দর না, তাই  
আরিচা দিয়ে এলাম।

মাওয়া সান্তার তিন তিনটি কেরী অপেক্ষা করছে, পুলিশ অপেক্ষা করছে,  
একটা ইনফরমেশন তো পাঠাবেন! নেত্রী তার সাথে আনা ব্যক্তিদের বললেন,  
তোমরা ইনফরমেশন দেও নাই? উত্তরে কেউ কোন কথা বললেনা। আমি  
বললাম, হাজার হাজার মানুষ হুটাত্ত পর হুটী সান্তার হান্ধাটে নদী পারাপারের  
অপেক্ষায় কই করছে। বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা  
বললেন, সান্তায় বইসা থাকা এই তো? এ আর কি কষ্ট! তাছাড়া এটেশের  
জাইনদের (মানুষের) তো আর তেমন কাজকর্ম নেই। সান্তারই না হয় হুটাত্ত পর  
হুটী পার করে দিল এতে কি আর এমন, তুমি এ নিয়ে বেশি চিন্তা কইরো না।

অতঃপর সন্ধ্যার দিকে শেখ হাসিনার পিজালয় এবং বিতার কবর টুঙ্গিপাড়ায়  
গেলাম।

## শেখ হাসিনার গোলাম আবদুর রহ বৈঠক

৩০শে জানুয়ারী ১৯৯৪ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর মেয়র ও কমিশনার  
নির্বাচন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগ ঢাকা মহানগর  
আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ হানিফকে ঢাকার মেয়র পদে মনোনয়ন  
দিয়েছে।

হোড় জোরে নির্বাচনী প্রচারণা এগিয়ে চলছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ  
হাসিনা থেকে শুরু করে নলের সকল নেতা কর্মীই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের  
কাছে মেয়র পদে মাহ্ মার্কায় হানিফের জন্য ভোট চাইছে। অধিক দায় দর্শিত  
চলছে মিছিল এবং নির্বাচনী জনসভা। প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় গুলি গুলিকে চলেছে  
মেয়র কমিশনার নির্বাচনের কাজ। আওয়ামী লীগ, বি, এম, পি, জাতীয় পার্টি,  
জানাত, কমিউনিস্ট পার্টিসহ সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচনী কাজে জীবন ব্যস্ত।  
একাত্তর টানটান নির্বাচনী উত্তেজনা। নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি।  
২৫শে জানুয়ারী সন্ধ্যা বেলায় ধানমন্ডি ৮/এ রোডে বঙ্গবন্ধুর ডাচাতো ভাই শেখ  
হুফিজুর রহমান টোকনের আদায় (শেখ হাফিজুর রহমান টোকন বর্তমানে  
বঙ্গবন্ধু মাদ্রাসার মহাসচিব) '৭১-এর মুক্তাপরাধী জামাত নেতা মাতক গোলাম  
আবদুর সাথে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দ্বিতীয় দফা বৈঠক হয়। এই বৈঠকে  
মাতক গোলাম আবদুর মেয়র নির্বাচনে বি, এম, পি প্রার্থীকে সমর্থন না দেওয়ার  
আশ্বাস দিলে শেখ হাসিনাও রাজনীতিতে জামাতকে আত্মদান না করার আশ্বাস  
দেন।



## নির্বাচন বাতিলের দাবী

আজ ৩০শে জানুয়ারী ১৯৯৪। ঢাকায় প্রথম বারের মতো সত্যসহি জনগণের ভোট দেয়ার নির্বাচন চলছে। সকাল আটটা থেকে বিকাল পর্যন্ত ভোট দেয়া হয়। ভোট দেয়ার পরেই জননেত্রী শেখ হাসিনা ৯ নির্দেশ দিয়েছেন, আজ ৩০শে জানুয়ারী সকাল ৯ টায় ২৯ মিলিয়ন ভোটে তার বাসায় হাজির হওয়ার জন্য। নির্দেশ মোতাবেক নেত্রীর বাসায় সকাল ৯ টায় হাজির হয়েছি। বহুবলু কন্যা ঘুম থেকে উঠলেন, একসাথে লাভা করলেন। তার পর সকাল পৌনে সাতটায় তার (শেখ হাসিনার) লাভা হওয়ার বিশাল পে ট্রেনে গ্রীণ খাঙ্কিতে করে আনাদের সঙ্গে নিয়ে কেঁচিয়ে পড়লেন। বহুবলু কন্যা এ ঘন্টে গেলেন শের-এ-বাংলা নগরের রাজধানী হাই কুন্সে। তারপর গেলেন ৪ জনমতি ময়াজ হাই কুন্সে, এরপর গেলেন মানমতি বগিচে তার (শেখ হাসিনার) পিড়ার বাড়ি বহুবলু ভবনে। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চা পেয়ে নিজের ভোটের গ্রিপ নিয়ে চলে এলেন সিটি কলেজে ভোট দিতে। সিটি কলেজে ভোট দেওয়া শেষ করে, আরো কিছু ভোট কেন্দ্র ঘুরে বেলা এগারোটা নাগাদ ফিরে এলেন ২৯ মিলি়ো ভোটে তার সরকারী বাসভবনে। জননেত্রী শেখ হাসিনা মিলি়ো ভোটে বাসভবনে ফিরে আসার দশ পনের মিনিটের মধ্যে এলে উপস্থিত হলেন আওয়ামী লীগের বৃহৎ সম্পাদক (বর্তমানে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য) নওশাদ আব্দুল জলিল। জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আব্দুল জলিল বললেন, নেত্রী আসাদের অবস্থা ভাল না। আহুদ নির্বাচনে জিততে পারবে না। আমাদের শোকসের ভোট কেন্দ্র থেকে বের করে দিচ্ছে। আগুনকে তো আগুনেই বলেছি। আওয়ামী লীগ হলো হুতাল আর আন্দোলনের দল, নির্বাচনের দল না। আপনি আমাদের নির্বাচনে যান।

আব্দুল জলিলের কথা শেষ না হতেই এলে হাজির হলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক (বর্তমানে প্রেসিডিয়াম সদস্য) জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমানের পেছনে পেছনে এলেন প্রেসিডিয়াম সদস্য (বর্তমানে পানি সম্পদ মন্ত্রী) আব্দুল রাজ্জাকসহ অন্যান্য নেত্রীপুত্র।

একমাত্র আব্দুল রাজ্জাক ছাড়া সকল নেত্রীবৃন্দেই এক কথা, সেহেত নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হচ্ছে। আমাদের কর্মীদের ভোট কেন্দ্র থেকে বের করে দিচ্ছে। নির্বাচন বাতিলের দাবী করা হোক। আমোদন করা হোক ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুল রাজ্জাক বললেন, নির্বাচনে কারচুপি হচ্ছে, আমাদের কর্মীদের বের করে দেওয়া হচ্ছে, এটা কি আগুনকে কেউ ভোট কেন্দ্র নিয়ে লেবেলছেন?

নেতারা কেউ কোন উত্তর দিলেন না, কোন কথাও কেউ বললেন না, সবাই চুপ।

জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, এটা ঠিকরাত ভোট কেন্দ্রে গিয়ে দেখতে হয় নাকি? অথবা কোন ভোট কারচুপি করতেই। এ ধন না করলে একটি পদে করবে। কাজেই আমাদের নির্বাচন বাতিলের দাবী করতে হবে এবং এই ইনু নিয়ে হি, এনুপি সরকার পতন আন্দোলন করতে হবে। বাংলাদেশ জিয়া সরকারের পতন ঘটাতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে টেবিল টোলকোন সেই যে সেট দি হে উপস্থিত সকলে ওনতে পারেন) দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা স্বয়ং প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ফোন করলেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে না পেছায়, অন্য একজন নির্বাচন কমিশনারকে নির্বাচন বাতিল করার কথা বললে, নির্বাচন কমিশনার বিধেয়ের সাথে বন্দোবস্ত, ম্যাজাম নির্বাচন বাতিল করা হো নুয়েত কথা, কোন ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত করার মতোও কোন ইনফরমেশন এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে আসেনি।

অত্যাধিক জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, আমায় কাছে ইনফরমেশন আছে নির্বাচনে কারচুপি হচ্ছে। আমি বলছি—নির্বাচন বাতিল করেন।

নির্বাচন কমিশনার বললেন, ম্যাজাম আপনি কাইজলি বলেন, কোন কেন্দ্রে কারচুপি হচ্ছে, আমরা অবশ্যই তার ব্যবস্থা নিব।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা টীক ইলেকশন কমিশনারকে বললেন আমাকে ফোন করতে বলে কোন রেখে নিলেন। এর পর প্রায় প্রতি ষটময় ঘটায় নির্বাচন কমিশনে নির্বাচন বাতিল করার দাবী জানিয়ে ফোন করা শুরু হলো। বিকাল চারটা নাগাদ একবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচন বাতিলের দাবীর জবাবে বললেন, ম্যাজাম আমি ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। সাধান্য গোপোদোণের কারণে আমি কয়েকটি ভোটকেন্দ্রে ভোট স্থগিত করেছি।

শেখ হাসিনা পুনরায় নির্বাচন বাতিলের দাবী করলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ম্যাজাম আমি নির্বাচন কমিশনে বসে নেই। আমি সরাসরি কোট কেন্দ্রে গিয়ে নিজেই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যে কোন প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে আমি মোটেই দিহুনা হবো না।

হ্যাঁ, আপনি নির্বাচন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিন। আমি পরে আবার ফোন করবো বলেই জননেত্রী শেখ হাসিনা ফোন রেখে নিলেন। এরপর প্রায় পনের বার ফোন করেও প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পাওয়া গেলো না। কিন্তু রাত মশটার সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পাওয়া গেল। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ফোন করতেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা উচ্চ হয়ে বললেন, কি হলো, নির্বাচন বাতিলের ঘোষণা দিলেন না?

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বললেন, মাজাম আঘানের কাছে যে ফলাফল এসেছে, তাতে মেয়র পদে মাহ হার্কীয় মোহাম্মদ হানিক বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছে। এখন আমরা কি নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করবো?

শেখ হাসিনা বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ কি বলছেন? হ্যাঁ মাজাম, এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী মেয়র পদে মাহ হার্কীয় মোহাম্মদ হানিক বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছে এবং মোহাম্মদ হানিকের মেয়র হওয়া প্রায় নিশ্চিত। আমরা কি এই নির্বাচনী ফলাফল বাতিল করবো?

তাই নাকি, তাই নাকি, না না বাতিল করবেন কেন? আপনি খোয়াল রাখবেন নাতে এই ফলাফল উল্টে না যায়। আমি পরে আবার আপনার সাথে যোগাযোগ করব।

এরপর জননেত্রী শেখ হাসিনা টেলিফোন সেট বন্ধ করে উৎসাহিত সঙ্গসঙ্গে উদ্দেশ্য করে বললেন, তদন্তে তো হানিক নাকি মেয়র হয়ে যাচ্ছে। এখন তো আমাদের নির্বাচন বাতিলের নাকী করা ঠিক হবে না; কি বলেন?

জিহুর রহমান বললেন, সের্ষেন এইটা আবার কোন চান।

আবুর রাজ্জাক বললেন, নেত্রী নির্বাচন কমিশনে আমার একজন মনিয়র লোক আছে, আমি তার কাছে গেছে সঠিক বরং নিয়ে আসি।

সভানেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, তাই যান। আপনারা সবলেই যান, যার যেখানে লোক আছে সেখান থেকেই সঠিক বরংটা সংগ্রহ করুন।

রাত তখন সাড়ে আট, সবাই চলে গেল। একমাত্র আবুর রাজ্জাক ছাড়া আর কোন নেতাই রাতে আর ফিরে এলেন না। রাত দেড়টার দিকে আবুর রাজ্জাক সিটো গোড়ে এসে বললেন, সভানেত্রী ভোখার, হানিক তো মেয়র হয়ে গেছে। নির্বাচন কমিশন মেনি-মিসেনী সমস্ত মিউজ মিডিয়াতে হানিকের মেয়র হওয়ায় ফলাফল পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন হানিক বেসরকারীভাবে ঢাকার মেয়র। সভানেত্রীকে সংবাদটা দিতে হয়।

আপনি বলেন বলে উপরে গেলাম। সভানেত্রী শেখ হাসিনা ডিস এফিনার হিন্দি ফিল্ম দেখছিলেন, তাকে আবুর রাজ্জাকের আবার সংবাদ এবং হানিকের বেসরকারীভাবে মেয়র হওয়ার সংবাদ দিলে তিনি বলেন হানিকের অপাপ ভুল। আবুর রাজ্জাক দেখা করতে চায় জানালে, শেখ হাসিনা বলেন, দূর ছবিটা কমে উঠেছে এই সময় দেখাটেকা হবে না। তুমি বলে দাও আসি (শেখ হাসিনা) ঘুমিয়ে পড়েছি।

তথ্যসূ নেত্রী, বলে নিচে এসে আবুর রাজ্জাককে বলা হলো আপনি চলে যান, নেত্রী ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর আর উঠবেন না।

আব্দুল আজ্জাক চলে গেলে এরপর কোন এলো জেনিভিয়াম শনদ্যা (বর্তমানে পরগুট্টী নগরী) আব্দুল সামাদ আজাদ এর, সভানেত্রীকে লামান আজাদের যোনের কথা বলা হলে, তিনি ঐ একই কথা বলেন, নূর সিনেমাতো জন্মে উঠেছে, যণে দাও ঘুমিয়ে গেছি। এরপর থেকে যেই কোন করুক বলে নিবে ঘুমিয়ে গেছি।

এরপর থেকে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা যে ক্রমে বলে ছিল, এষ্টিনায় হিনি ছিল। সেখেন সেই ক্রম থেকেই হ্যাডসেট নিয়ে যেই কোন করছে তাকেই বলে দেওয়া হচ্ছে নেত্রী ঘুমিয়েছেন। এই নিয়ে আবার জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং ঊপস্থিত হিনি ফিল্ম দর্শকদের নানা হাস্যহাসির স্রোত পড়ে গেল।

## শেখ হাসিনা এবং হানিফ

পরদিন বিকাল বেলা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, তিনে, এত লোক আসে যায়, এত কুলের ভোড়া, কুলের মালা কিন্তু হানিফকে (নন্দা নবনির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ হানিফ) দেখছি না। এখন পর্যন্ত হানিফ একটা কোনও করলো না। ব্যাপারটা কি? ঠিক আছে তো, না ভাইগা টাইগা গেল। এই মেয়র হওয়ার লোভেই কিন্তু হানিফ হৈরাচরী জেনারেল এরশাদের কাঠীয়া পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। এরশাদের কাছে চাপ না পেয়ে হানিফ মেয়র হওয়ার জন্য আবার আমত্রে কাছে ফিরে এসেছে। আমি এক কোটি সাতত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ করে হানিফকে মেয়র করেছি। ভাতাভাড়ি খেঁজ বদর নাও। কোন কত এবং একজন হানিফের বাড়ি নিয়ে দেখ আসল ব্যাপার কি?

দল নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ হানিফের বাসার কোন কত বলা হলো, জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হানিফ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বললেন।

জবাবে মিসেস হানিফ বললেন, তিনি অসুস্থ এখন কথা বলতে পারবেন না।

সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে এই কথা বলার সাথে সাথে তিনি (শেখ হাসিনা) বললেন শিবুই হানিফের বাসার দাও, নের গিয়ে ঘটনা ব্যাখ্যাপ।

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে, মেয়র হানিফের বাড়ি ছুটে বাওয়া হলো। মেয়র হানিফ তখন মশ রোগে জন লোকের সঙ্গে বলে কথা বলছেন। সেখানেই শোনা গেল বিকেলে সালবাগের বি.এন.পি.র পরাজিত কমিশনার প্রার্থী আব্দুল আজিজ গুলি করে সাতজন লোককে হত্যা করেছে। জননেত্রী শেখ হাসিনা কথা বলতে চেয়েছেন বলার মেয়র হানিফ বললেন, নেত্রীকে আমার সালাম দিও, বলো আমার শরীফটা খুব ব্যাখ্যাপ, আমি কথা বলতে পারছি না। তবু লালবাগের খুনের জন্য আমি জনাদের সাথে কথা বলছি।



মেঘের ছানিকের বানা থেকে নোজা মিষ্টো বোড-এ এসে বসবস্তু কন্যাতে লালবাগের মি.এন.পি কমিশনার প্রার্থী অজিত কর্তৃক সাত জনকে খুন করার সংবাদ নিয়ে বসবস্তু কন্যা কুশিতে জিন্দেগী জিন্দেগী গান গাইতে থাকেন আর নাচতে থাকেন।

## কমালে প্রিন্সারিন

পরদিন সকালে লালবাগে নিহত সাত জনের লাশ ঢাক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে দেখতে যাওয়ার আগে বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনা বসতে থাকেন, আমার (শেখ হাসিনা) কমালে একটু প্রিন্সারিন মেখে নাও, ও যে নারিকরা সজিনদের সময় প্রিন্সারিন দিয়ে চোখের পানি বের করে কান্নার জ্বিন্দা করে। আমার কুমারের ও বসবস্তু প্রিন্সারিন লাগিয়ে নাও, যাতে আমি বেশ দেখে কমাল ধরতেই চোখের পানি এসে যায়।

একজন বসবস্তু প্রিন্সারিনের সরকার নাই, শুধু চোখের কুমাল ধরে বাখানেন তাতেই মনে হবে আপনি কাঁদছেন। আর আমরা ফটো সাংবাদিক (ফটো সাংবাদিক) জাইদের বলে দিই ছবিও নীচে আখি কাঁদছেন ক্যাপসন লাগিয়ে দিও।

হাসপাতালের মর্গে নিহত সাত জনের লাশ দেখে বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনা চোখে কুমাল ধরলে সঙ্গে সঙ্গে ফটো সাংবাদিকগণ অনখা ছবি তুললো। ছবি তুলে শেষে বসবস্তু কন্যা গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি চলতে শুরু করলো। তখনও বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনার চোখে কুমাল। গাড়ির ড্রাইভার জালাল বলল গাঙ্গা (শেখ হাসিনা) এখন কুমাল নামান ফটো সাংবাদিক নেই।

গাড়ির সকল আরোহী হেসে উঠলো। জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, ঠিক মতো দেখেছ তো, কোন ফটো সাংবাদিক নেই তো!

না নেই।

তাহলে আমি (শেখ হাসিনা) একজন কুমাল নামাই।

## আজ আমি বেশি বাব

২৯নং মিষ্টো রোডের বাসায় এনে বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, মফনা (মিসেস মতিফর বহমান রেজু) বাগুয়া-মাওয়া বেশি করে এনেছ তো? লাশ দেখে এনেছি, লাশ। আর আমি বেশি করে বাব।

তারপর তিনি জিন্দেগী জিন্দেগী গাইতে গাইতে, নাচতে লাগলেন। সত্যি সত্যিই তিনি (শেখ হাসিনা) অস্বাভাবিক বকনের বেশি খেলেন। এমনতেই তিনি (শেখ হাসিনা) বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে নিহতদের লাশ দেখে এসে স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি খেতেন। কিন্তু আজ খেলেন অস্বাভাবিকের চাইতেও অনেক বেশি।

## টাকার ভাগ দিতে হবে

টুঙ্গিগাড়ায় শেখ হাসিনার পিতা আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কবরে গিয়ে মেয়র মোহাম্মদ হানিফের আনুষ্ঠানিক শপথ নেওয়ার দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা হলো। ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী জম্মনেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফকে সঙ্গে নিয়ে টুঙ্গিগাড়ায় যাবেন এবং সেখানে বেসরকারীভাবে হানিফ মেয়র হিসেবে শপথ নেবেন। নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যা বেলা সন্ধ্যাই টুঙ্গিগাড়ায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু মেয়র হানিফ এলেন না। টুঙ্গিগাড়ায় যাওয়া হলো না। মেয়র হানিফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। তিনি কল করেন, তিনি অসুস্থ। এরপর আর মেয়র হানিফ শেখ হাসিনার কান্না, আওয়ামী লীগ জড়িস কোথাও এলেন না। আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়র পদে মোহাম্মদ হানিফ শপথ নিলেন। ঢাকার মেয়রের দায়িত্ব কার নিলেন। হুট দাইনের তেজ টেনিফেনে প্রতিদিন দুই একবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে কথা বলেন। প্রতিদিন না হলেও প্রায় প্রতিদিন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেন এবং যুক্তি পরামর্শ করে সিটি করপোরেশন পরিচালনা করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ নেত্রী কামী ও আওয়ামী লীগ অফিসের জিনীমান্যও আসেন না। বঙ্গবন্ধু কন্যা জম্মনেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা কপাল চাপড়ান আর বলতে থাকেন, নিমকহুসান, বেইমান, ওরে আমি এক কোটি লাভ ত্রিশ লাখ টাকা বরচ করে মেয়র করেছি। বেইমান নিমকহুসান।

যে আসে, মাকে পান ভাত আছেই তিনি (শেখ হাসিনা) এই কথা বলতে লাগলেন।

একজন বললো, ঠিক আছে হানিফ আই মেয়র হয়েছে, টাকা কান্না, টাকা খাবে, থাক, আমরা তো আর ভাগ চাই না! কিন্তু মলের কাজ করবে না কেন?

জবাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, কেন? একা টাকা খাবে কেন? আমাদের ভাগ দিতে হবে। শুধু এক কোটি সাক্ষি লাখ টাকা বরচ করে মেয়র হানিয়েছি। আমাদের হাত দিয়েই তো এই টাকা বরচ করেছি। হানিফ তো এক পতন্যও বরচ করে নাই। সব আমি বরচ করেছি। এখন হানিফ একা খাবে কেন? আমাদেরও ভাগ দিতে হবে। নইলে আমি শেখ হাসিনা একদিন না একদিন এর উনুল করে ছাড়ব।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কপা বললেন, কত শতবার ফোন করা হয়, মেয়র হানিফ ফোন ধরে না। আসতে বলা হয়, দেখা করতে বলা হয়। হানিফ আসে না, দেখা করে না। শোক পাঠালে মেয়র হানিফ বলে, যা যা, যেই জায়গায় আছিস সেই জায়গায় যা। কনকতায় যাওয়া লাগবে না। যে পর্যন্ত আগাইছিস এই বিরোধী দল পর্যন্তই থাক, আর কনকতায় যাওয়া লাগবে না। আমি তোমার সঙ্গে নাই।

## জাহানারা ইমাম মরছে আপদ গেছে

১৯৯৪ সালের ২৮শে অথবা ২৭শে জুন নতুনাবাজার যুক্তপ্রগতি আওয়ামী লীগের সভাপতি টেলিফোন করে ২৮শে জুন '৯৪ শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদ দিলে, জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জ্ঞানশেষ নাচতে থাকেন আর বলতে থাকেন মিষ্টি খাও, মিষ্টি। আমার একটা প্রতিদ্বন্দী সুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে। আব্বাস কাঁচাইছে। নেত্রী হতে চেয়েছিল। আমার জায়গা দখল করতে চেয়েছিল। জাহানারা ইমাম মরছে আপদ গেছে। বাঁচা গেছে। আমার জায়গা দখল করতে চেয়েছিল। তোমরা জান না, ইতিহাস হয়েছিল এজেলি 'ব' (ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা নাম 'ব') আমার পরিবর্তে জাহানারা ইমামকে নেতৃত্ব দিতে চেয়েছিল। যেটি মরছে, মিষ্টি খাও। কবিরাকে শরসা দেও।

এক কয়েকদিন পরে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের লাশ মার্কিন যুক্তপ্রগতি থেকে ত্রিখা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এসে, জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, চল, এয়ারপোর্টে যাই, আপনের লাশটা এনে কবরে ফেলি।

এরপর জননেত্রী শেখ হাসিনা তার পাল রকরের নিশান গের্ট্রোল জীপে করে বিমান বন্দর-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। যেতে যেতে বলতে লাগলেন, কেটি (জাহানারা ইমাম) আমারে জনগণ ছাড়াইছে (ছালিয়েছে)। ওর মরা মুখও দেখতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু না ঘেয়ে তো উপায় নেই। পরেটিও-এর (রাজনীতির) দাবসায় ইচ্ছে না থাকলেও করতে হয়।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিমান বন্দরের রানওয়ে পর্বত ঘেলেম টিকই, কিন্তু শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মাশের ধারে কাছেরে গেলেন না।

## শেখ হাসিনার ট্রেন ওলি

১৯৯৪ সালের ২২নভেম্বর বৃহস্পতিবার জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বিমানঘোষে যশোর হয়ে কুলনা এলেন। এবং বিকেলে শহীদ হাদিস পার্কের জননভাষা ভাষণ দিলেন। রাতে নেত্রীর গাড়ীতো ভাই শেখ নাসেরের বড় ছেলে শেখ হেলালের বাড়িতে খেলেন এবং থাকলেন। পরদিন ২৩শে নভেম্বর শুক্রবার সকাল নয়টার সময় উত্তর বাংলার উদ্দেশ্যে ট্রেন যাত্রা শুরু করলেন। বেশ বড় ট্রেন। অনেক সাধারণ যাত্রী আছে ট্রেনে, সাধারণ যাত্রীরা জানে না বা বুঝতে পারছে না, শেখ হাসিনার রেলপথে সজা করতে করতে যাওয়া এই ট্রেন কবে কখন গন্তব্যে পৌছবে। ঠিক সকাল নয়টার ট্রেন ছাড়লো। প্রতিটি স্টেশনেই ট্রেন থামিয়ে সজা করা শুরু হলো। ট্রেন থেকে নেমে জনসভা আয়োজনের নির্দিষ্ট জায়গায় থেয়ে বক্তৃতা দিয়ে আবার ট্রেনে সিলে



আনতে পৌঁছে এক ঘন্টা থেকে একঘন্টা সময়ে লাগতে লাগলো। এইভাবে প্রতিটা রেলস্টেশনে গড়ে প্রায় একঘন্টা সময় যায় হতে থাকলো। দিন পেরিয়ে রাত হয়ে গেল। বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে ঢাকা থেকে নিয়ে আসা প্রায় ত্রিশজনকেও বেশি সাংবাদিক (বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ভ্রাতার সাংবাদিক) এই ট্রেনে রয়েছে। ট্রেনের শেষের দিকে একটি তি, তি, আই, পি স্পেশাল কামরা বা কমপার্টমেন্ট এ (বগীচে) জননেত্রী বহুবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। এ কমপার্টমেন্ট-এর সামনে এবং পেছনে ঢাকা থেকে নিয়ে আসা বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নিরাপত্তার নিয়োজিত স্পেশাল (এসসি) ক্রাক পুলিশের বায়ো জন সফল্য। তারপরের কমপার্টমেন্টে সাংবাদিকগণ। এরপর সবগুলো কমপার্টমেন্ট বা বগীচলোতে সাধারণ যাত্রী। ট্রেনের এই অপ্রত্যাশিত দীর্ঘ বিলম্বে সাধারণ যাত্রী দাবী-পূরণ আর শিকনের আহিমধুসুনম জরুরী। ছয় ঘন্টার মাত্রা পথ চক্ৰিণ ঘন্টাও না ফুটানোর ফলে অনেক আগেই পানিনহ ট্রেনের সকল ধারার ফুটিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেলে সাধারণ যাত্রীদের কষ্ট আর দুর্ভোগ সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছে।

তদুপরি-সুখান্ত শিকনের কান্না আর আহাজারীতে অনেক সাধারণ যাত্রীই পাতিবার পরিজন নিয়ে গভীরে আগের ট্রেন থেকে নেমে পালিয়ে যায়। জননেত্রী শেখ হাসিনা তার সফর সঙ্গী এবং সাংবাদিকদের অন্য প্রায় প্রতিটি রেলস্টেশন থেকেই অকুরত বাবার এবং বিতর্ক পানির (মিনারেল ওয়াটারের) পর্যাও বোতল সরবরাহ করা হতে থাকে।

সাংবাদিক জননেত্রী শেখ হাসিনা গার কুড়িটির মতো রেলস্টেশন জনসভায় ভাগ দেন। কোথায় কোথায় রেলস্টেশন ছাড়াই উৎসব জনতা ট্রেন থানাসে দেখানোও তিনি বর্জতা করেন। প্রতিটি জনসভাতেই ঢাকা থেকে আসা সাংবাদিকরা উপস্থিত হয়ে বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বর্জতা লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। এবং শেখ হাসিনাও সাংবাদিকদের নজরে রাখেন। কিন্তু রাতের অন্ধকারে বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের আর নজরে রাখতে পারেননি। এদিকে শেখ হাসিনা ব্যর ব্যর একই বর্জতা দেওয়ায় সাংবাদিকদের তা স্মরণ হয়ে যাওয়াতে অনেক সাংবাদিকই রাতের অন্ধকারে ট্রেন থেকে নেমে শেখ হাসিনার বর্জতা লিপিবদ্ধ করতে যায়নি।

রাত তখন এগারোটা গভর মিনিট। বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বহনকারী ট্রেন সিংহরাণি রেলস্টেশন পৌঁছায় কিন্তু সমস্ত ব্যক্তি রয়েছে। এমন সময় বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, এত টাকা পরস্রা খরচ করে জামাই আনর করে ঢাকা থেকে যে সাংবাদিকদের (সাংবাদিক) এনেছি তারা কি সব ফুমাচ্ছে? জনসভার এতো লোক হচ্ছে, আমি এতো বর্জতা করছি, সাংবাদিকদের



(সাংবাদিক) মহনের পড়ছেন না তো। তোমরা একটি সাংবাদিকদের (সাংবাদিক) ঘুম ভাঙ্গিয়ে আমায় (শেখ হাসিনার) জনসভায় পাঠাও যাতে পত্রপত্রিকায় ভাল নিউজ হয়।

বহুবলু কন্যা শেখ হাসিনার বেতনভুক্ত বাগ বহনকারী মনন মোহন দাস (যার নামে শেখ হাসিনার লাল বক্তৃতা মিশান প্রেক্ষাগৃহ ভীণ গাড়িটি রেজিস্ট্রেশন করা) বলল, ভাইকা ঘুম ভাঙ্গান লাগবে না। পিতুল দিয়ে দুই রাউন্ড গুলি কইরা নিলেই সাংবাদিকগণো ঘুম কই গাইব, সব সাকাইয়া ট্রেন গাইকা নিচে পইড়া গাইব।

আমারিফিনেরও অসীম পাওয়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে বহুবলু কন্যা শেখ হাসিনা তার বাবার মুসাজো ভাইয়ের ছেলে বাহুউদ্দিন নাসিমকে (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ. বি. এস) বললেন, দে দুই রাউন্ড গুলি করে।

যার উপস্থিত অন্যদের বললেন, তোমরা আমাকে (শেখ হাসিনাকে) হত্যার জন্য ট্রেন-এ গুলি করা হয়েছে বলে সাংবাদিকদের (সাংবাদিক) যাতে প্রচার করে দেবে। ট্রেন ইন্সুরেন্স প্রাটকর্মে ফোকাস করেক বিনির্দি জায়ে বাহুউদ্দিন নাসিম ট্রেনের জানালা দিয়ে সাংবাদিকদের কমপার্টমেন্টে ঢাকা করে পিতুল দিয়ে তিন (৩) রাউন্ড গুলি ছুড়লো। গুলির শব্দ শুনে বহুবলু কন্যা শেখ হাসিনার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত স্পেশাল ব্রাঙ্কের পুলিশেরাও পাঁচ ছয় রাউন্ড গুলি করে। এই সবট গুলির আওয়াজ শুনে পাটনার কমপার্টমেন্টে থাকা সাংবাদিকরা ভয়ে ট্রেনের ভেতরে গড়াগড়ি শুরু করে। এবং আমরা পরিকল্পনা মতো সাংবাদিকদের কমপার্টমেন্টে এসে বহুবলু কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য ট্রেনে গুলি করা হয়েছে বলে প্রচার করতে থাকি। ট্রেন ইন্সুরেন্স প্রাটকর্মে থাকলে, ইন্সুরেন্স রেলস্টেশনের বাইরে জনসভার মধ্য থেকেও মাইকে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সভাপতি আমির হোসেন আমু বহুবলু কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য ট্রেনে গুলি করা হয়েছে বলে প্রচার চালাতে থাকেন। পরের দিন ২৪শে সেপ্টেম্বর শনিবার ট্রেনে বহুবলু কন্যার মর্গে গুলি করা হয়েছে বলে জাতীয়া পত্রপত্রিকায় সংবাদ বের হলে, বহুতা সরকারী পাবলিট হাউসের ডি ডি আই পি কমে বলে জননেত্রী শেখ হাসিনার হত্যার সর্বত্র নসীত্যা (যারা প্রকৃত ঘটনা জানে) হাসাহাসি করতে থাকে। এবং হাসাহাসির এক পর্যায়ে গুলির এই ঘটনা নিয়ে হরতাল ডাকার সিদ্ধান্ত হয়।

## ৫০ হাজার টাকা এ্যাডভান্স

২৯ অক্টোবর ১৯৯৪। খরলা নদী। বংপুরের নাহকরা নদী। সোকে বলে সর্বনাশা নদী। পরা-মেঘনার মতোই শক্তিমানী নদী। খরলোতা। বংপুর কুড়িগ্রাম থেকে নাগেশ্বর কুলবাড়িয়া যেতে হলে এই খরলা নদী পার হয়ে যেতে

হবে। নদী পার হওয়ার ছোট একটি ফেরী। দুইটি কাঠের নৌকা জোড়া দিয়ে তৈরি এই ফেরী। ফেরীতে দুই-একটা গাড়ির বেশি জায়গা হয় না।

এই ফেরী পার হয়েই বহুবকু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নারেশ্বর ফুল বাড়িয়ায় জনসভা করতে যাবেন। সাবের গাড়ি বহরের অর্ধেক গাড়ি ফেরী পার হওয়ার পর বহুবকু কন্যা ও তার গাড়ি ফেরীতে উঠানো হলো। ফেরীতে উঠেই বহুবকু কন্যা আতঙ্কিত উঠে বললেন, ভরে যাগে, একি ফেরী? এত বড় নদীতে কাঠের এই সামান্য ফেরী?

এই সময় বহুবকু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আনু শেখ হাসিনার গাড়ির চালক মোহাম্মদ কাশালানই মাত্র পাঁচ-জন লোকের সঙ্গী এবং পুলিশের স্পেশাল ড্রাকের ছয়জন পুলিশ ছিল।

বহুবকু কন্যা শেখ হাসিনা ফেরীর দু'জন চালক (মাঝি) কে বললেন, শেষ আবার কুধে না যায়।

ফেরীর মাঝিরা বলল, না না আপনি কম পেয়েন না। ফেরী ছোট কাঠের হলেও শক্ত আছে। এতদূর ভ্রমা যদি কেটে যায় তবেই ফেরী কুধবে, নইলে কুধবে না।

প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আনু বললেন, তোদের ভো আবার ভ্রমা মাটিয়ে রাখ নাই?

ফেরীর মাঝি বলল, ভ্রমবা যদি ভ্রমা ফটাইয়া হানি আপনারা তেরও পাবেন না। আস্তে কইরা ভ্রমার একটা কাঠ-এমন কাধে ফুটাইয়া রাখুন কেউই কুধতে পারবেন না। মাঝা দলিয়ার দিয়া এমন কাধে ফেরীর ফুটাইয়া রাখুন নে, লগে কধে ভ্রমা দিরা বলগলাইয়া পানি উইয়া দেবতে বা দেবতেই ফেরী ফলাইয়া যাইব। কেউ ধরতেই পারব না কি হুইলো। যেসকই আনলগো হাতে না, আনলগো হাতেও আগুহ পাও কিছু রাখছে।

প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আনু বললেন, বলেনা কিয়া এই ফেরীতে গেলে ফেরীটা ফলাইয়া দিও।

এরপরই বহুবকু কন্যা শেখ হাসিনা এসব পাটিয়ে মাঝিদের সুখ-দুঃখের বিষয় নিয়ে আলোচনায় গেলেন। মাঝিরা পাটিবারিক সুখ-দুঃখের সাথে তাদের চাকরি জীবনের অনেক দাবি-দাওয়ার কথা বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, আমি কবতার গেলে তোমাদের সব দাবি পূরণ করে দেব।

ফেরী ঘাটে কিছুতে বহুবকু কন্যা নারেশ্বর ও ফুলবাড়িয়ার চলে গেলেন। এবং নারেশ্বর ও ফুলবাড়িয়ায় জনসভায় বক্তৃতা শেষে পুনরায় আবার পেছন দিকে এই পথে, যে পথে তিনি গিয়েছিলেন, সেই পথে আসার নির্দেশ দিলেন। যদিও এই পথে আসার কোন কথা ছিল না। কথা ছিল ময়মনসিংহ-এর

## ফুল ছিটানো

আজ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা দিবস । ১৯৭৪ সালের ১৪ই ডিসেম্বর দুপুরে । সকাল ছয়টায় বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ২৯ লাগ্নি মিলেই যোজ্ঞের সারসঙ্গী বাসভবনে সকলে জাতির হল । সকাল সাতটায় বহুবলু কন্যা শেখ হাসিনা হীরপুর মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের সঙ্গেই ছিলেন । আটটা ষোলিশ মিনিটে প্রতিবেদনে শ্রুতবাণী অর্পণ করতেন । তারপর পেশেনা রায়েব আজ্ঞার বহুবলু কন্যা । সেখানে শ্রুতবাণী দেওয়ার পর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের সংগঠন প্রকল্প "৭১-৭৪ উৎসব" জননেত্রী শেখ হাসিনা এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন । তারপর মালিয়ার বেগমসিংহের কুইজা ট্রিনিটি কলেজ (শেখ হাসিনার) নামের ফুলফুলে ভাইয়ের ছেলে মকির আত্মত্বের মাঝে । বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডি. ডি. এন) নেবে জননেত্রী শেখ হাসিনা তার সারসঙ্গী মান করবে দুপুর সাগার ফিরে এসেন । দুপুর আড়াইটা বাজতে টেলিফোন একসঙ্গে বেজে যেতে বহুবলু কন্যা শেখ হাসিনা আত্মত্ব করে বলতেন । বেশ, আজ বিকেলে বহুবলু এজিবিউতে গকা মহানগর আত্মত্বী লীগের উদ্যোগে বিজয় বিজয় উৎসবে আয়োজনা সভা । জাতি হলম সেই আয়োজনা সভার প্রধান অতিথি । আর মাত্র তেরেক দিন পরেই জাতি বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার বহুবলু কন্যা শেখ হাসিনা করবে । এটিই আমার বিরোধী দলীয় নেত্রী ছিলেন শেখ হাসিনা মকি শাফা । আজই জাতি ভাষা প্রধানমন্ত্রী । আজই জাতিই জাতিই জনক বহুবলু শেখ মুজিবের রহস্যময় কন্যা । সামনে রয়েছে বাগেলনা জিরা হুটাই অলম্পন । এই মুহুর্তে আত্মত্ব প্রাচ্যার, আত্মত্ব ভাবমূর্তি কুড়ি কন্যা কর্তৃক প্রাচ্যার । আজকের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে আমি যাব একা নিতাই আমার উপর ফুল ছিটানোর কোন আয়োজন করে মাই । এমনভাবেই এরা মানে আত্মত্বী শীশ নেচারা মানবালমার্জ, আর উপর একা হলে! বাবসারী । এদের জন বলতে কিছুই নাই । না মনে মনে এরা কিছুই করে না । কুনি কি গার বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে গেলে আমার উপর শিও ও নেয়েদের দিয়ে ফুল ছিটানো?

নেত্রী, জাতিই কোন চিন্তা করবে না, জাতিই উপর ফুল ছিটানো হবে । তখন যাকে সাজে তিনটা । আর থালা দকা পরেই বহুবলু কন্যা বিজয় দিবসের মধ্যে উঠবেন । এই সংক্ষিপ্ত সময়ে কোথাও পান শিও, কোথাও পান মেয়েদের । বহুবলু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার আবদার । অবশেষে আত্মত্বী করে হাইকোর্ট আজার থেকে ফুল কিতম মিলেই গী, শিও কন্যাদের দিয়েই তার ফুল ছিটানোর আবদার পূরণ করা হলো ।

বাহাউদ্দিন নাসির শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের কুমারভ্রাতা জাইয়ের ছেলে। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ, পি, এল। এর আরো তিন ভ্রাতৃত্বভ্রাতা জাই অর্থাৎ শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের আরেক কুমারভ্রাতা জাইয়ের তিন ছেলে (১) নজির আহমেদ নজির, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীফ সিকিউরিটি (২) নজির আহমেদ হানু, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডি, পি, এল। (৩) কামিজ আহমেদ কামিজ। (মানে মানেই গাণোপ হরে যেতো আর কামিজকে সজ্জিত করা হতো বনানীতে অবস্থিত পামোদনের গ্রাইডেট ক্রিনিকে) বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থ বাংলাদেশ মিশনের চীফ পোটোকল অফিসার। মাদারীপুরের জখ্যাত অজো পাড়াগায়ে এদের বাড়ি। জামা টিনের ঘর। পূর্ব পুরুষ ধরেই এরা নবিস্ত্র। এদের বাবা, চাচা এবং এরা দুর্ভদ্রান্তে পড়ার বাড়িতে নজির থেকে অনেক কষ্ট করে দড়টুকুই হোক লেগা পড়া করেছে। ঢাকার ঢালুলা বলে কিছুই নেই। সেখানে কাত সেখানেই কাত। নিজস্ব আর্থিক বলতে সর্বদাকুলো ব্যবস্থা কন্যা শেখ হাসিনা। খাম-আর মায় কোথায়। দলবলে এটা এসেই উঠে পড়লো শেখ হাসিনার বাড়ি। শেখ হাসিনার বাড়িতে থাকে, শেখ হাসিনার খাওয়া খায়। শেখ হাসিনার নেওয়া কাপড় পরে। শেখ হাসিনার নেওয়া পরসায় চলে। আর চাই কি? আর কিছুদিনের মধ্যেই শেখ হাসিনার বেহিসেবী পরসার বদৌলতে এদের ভজন ভজন প্যাট, ভজন ভজন সার্ট, ভজন ভজন জুতা হয়ে গেল। এদের মধ্যে কেউ কেউ শেখ হাসিনার বদৌলতে অনেক বিতর্কালীও হল।

এদের মধ্যে বাহাউদ্দিন নাসির মনে করতো এবং জাইতো কেউ শেখ হাসিনাকে কোন কিছু বলতে পারবে না। সে যেই হোক। হোক না সে নলীয় কেন্দ্রীয় নেতা। অথবা সমাজের গণ্যমান্য কেউ। কিংবা কোন সুকির্জীবী। সে যেই হোক। কেউই শেখ হাসিনাকে কোন সংবাদ বা কোন কথা কিংবা কোন কথা বলতে পারবে না। তা সে সংবাদ বা কথা যত তত্ত্বপূর্ণই হোক না কেন।

শেখ হাসিনাকে কেউ কিছু বলতে চাইলে আসে তাকে (বাহাউদ্দিন নাসিরকে) বলতে হবে। এবং সে যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে শেখ হাসিনাকে বলবে, প্রয়োজন মনে না করলে বলবে না। আবার শেখ হাসিনার যদি কোন নেতাকে, বা কোন মানুষকে, কিংবা যে কাউকে কিছু বলার থাকে তাহলে তাকে (বাহাউদ্দিন নাসিরকে) বলতে হবে। বাহাউদ্দিন নাসির যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে শেখ হাসিনার সেই কথাটা অন্যকে বলবে, প্রয়োজন মনে না করলে বলবে না। বাহাউদ্দিন নাসিরের এই দুর্ভদ্রান্ত বা স্পর্ধী হয়েছিল শেখ হাসিনার কারণেই। বাহাউদ্দিন নাসিরের প্রতি শেখ হাসিনার অন্য কোন দুর্বলতা না



খাকলেও দু'টি দুর্বলতা ছিল। তার একটি হল, মতিঝিল আদালতী কোর্টের পূর্ণ পাশে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউ, সি, বি, এল, মতিঝিল শাখা) যে শাখা রয়েছে, এই শাখার বাহাউদ্দিন নাসিমের নামে শেখ হাসিনার কয়েক কোটি টাকা রয়েছে। উল্লেখ্য শিল্পপতি জাহির উদ্দিন হত্যার প্রধান আসামী চিটাগাং-এর আন্তার্জাতিক মান বানু, এই ব্যাংকের চেয়ারম্যান/পরিচালক। অপর দুর্বলতাটি বাহাউদ্দিন নাসিম শেখ হাসিনার শিল্পার কুকাডো কাইয়ের ছেলে। এই বাহাউদ্দিন নাসিম শেখ হাসিনার ধানমন্ডি পাঁচ নম্বর রোডের হুয়ান নম্বর বাড়িতে মাঝে মাঝেই আত্মপূর্ণ করে বলত, এই বাড়িওয়ালী তো বেইমান, বেইমানি তো করবেই। ভুইয়া তো গাইবেই। মনে তো রাখবেই না। কুজা (কুকুর) পাইলা খুইয়া ঘাইদু, কুজা (কুকুর) ফুলব না।

গ্রাম্যই বাহাউদ্দিন নাসিম এসব বলত। বলতে বলতে একদিন বাহাউদ্দিন নাসিম ঠিকই দু'টি কুকুরের বাচ্চা নিয়ে এসে পালতে তক্তা করলো। ধানমন্ডি পাঁচ নম্বর রোড-এর শেখ হাসিনার চুয়ান নম্বর বাসায় কুকুরের বাচ্চা দু'টি এখন অনেক বড় হয়েছে। এখন আর ওদের কুকুরের বাচ্চা বলা গারে না। বলতে হবে কুকুর। বাহাউদ্দিন নাসিম এই ধরনের কথা এখন কাজ করবেই বা না কেন? বাহাউদ্দিন নাসিম শেখ হাসিনার বাড়িতেই থাকত। আর এই বাড়িতে বাহাউদ্দিন নাসিমের শিল্পা, জাইয়েরা এসে, আশ্চর্য চরিত্রের অধিকারী শেখ হাসিনা মায়োয়ান ভেঁকে কুকুরের মত ঘুর ঘুর করে তাদের বাড়িয়ে দিতেন।

## স্বামী ভী-রাত ও কাটাননি

১৯৯৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বরষকু কন্যা শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। ২৯ মিল্টো রোডের সরকারী কালো ভ্যান করে ধানমন্ডি পাঁচ নম্বর রোডের হুয়ান নাম্বার বাড়িতে উঠলেন। ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নাম্বার বাড়িটি প্রথম ৩ দ্বিতীয় তলা শেখ হাসিনার পরিচালক স্বামী ভী ওয়াজ্জেন মিয়া'র নামে। আর তৃতীয় তলা শেখ হাসিনার নিজের নামে। শেখ হাসিনার অধিহেলিত ও পরিচালক স্বামী বৈজ্ঞানিক ভাঃ ওয়াজ্জেন মিয়া এই বাড়িটি করার সময় দ্বিতীয় তলা করার পর টাকা ফুরিয়ে গেলে শেখ হাসিনার কাছে ধাব চায়। তখন শেখ হাসিনা তৃতীয় তলা তার নিজের নামে লিখে নিয়ে তারপর ভাঃ ওয়াজ্জেনকে টাকা দেন। অবশ্য এই বাড়িতে ভাঃ ওয়াজ্জেন মিয়া আর শেখ হাসিনা একসঙ্গে একটি ব্লক ও কাটাননি। বস্তু এই বাড়িতে কেন, ১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা বাহাদুরশেহে আসার শও থেকেই ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত (এর পরের অবস্থা জানা নেই যদিও, তথাপি বুঝা যায়, পাঠক যেই দিন পড়লেন, সেই দিন পর্যন্ত গবে নিতে পারেন) এই, ১৬/১৭ বসর এক

শেখ হাসিনার স্বাক্ষর বিগোষ্ঠী দলটির নেতী হিমায়ে ২৯ মিলিয়ন ঘোড়ের স্বাক্ষরকারী  
 দলটির স্বাক্ষর, তখন এক ঘণ্টার মধ্যে সাধারণ দর্শনার্থীদের মাঝে সাধারণ  
 দর্শনার্থীদের মধ্যেই ডঃ গিয়াহেদ মিয়া শেখ হাসিনার সঙ্গে টিন মোনোবক  
 জানাতে পেলেন। কিছু স্বাক্ষর কন্যা শেখ হাসিনা আদিত স্বাক্ষর করে কুশলাদী  
 বিনিময় করলেও তার দামী ছত্র গিয়াহেদদের মাঝে কোন প্রকার কুশলাদী বিনিময়  
 সূত্রে থাক, তৎক্ষণিই কয়েকেন না। এমন কি তারে (ডঃ গিয়াহেদ মিয়াকে) স্বাক্ষর  
 পর্যন্ত কেউ বললেন না। ছত্র গিয়াহেদ মিয়া কিছুক্ষণ কলকাতার ক্যালকাতা করে  
 শেখ হাসিনার দিকে আকিয়ে থেকে দীর্ঘে দীর্ঘে দীর্ঘে দীর্ঘ থেকে থেকে গেলেন, জন  
 থেকে জনহৃদয়ের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে গোটের কাইতে চলে গেলেন। একমাত্র  
 শেখ হাসিনা স্বাক্ষর করে বুঝই বসিত কয়েক জন ছাত্র কেউ জানলো না, কলকাতা  
 না এই স্বাক্ষরটি কে।



## শেখ হাসিনার দেহে আঘাত

শেখ হাসিনার দেহে অনেক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এই আঘাতের ব্যাখ্যা নাহে নাহেই কাতরাতেন তিনি। এমনকি কোঁনে কোঁতেন। কঁদতে কঁদতে বলতেন ময়না (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক অস্বীকৃত ঘোষিত ২নং ব্যক্তি মিসেস মতিবুত (ময়না) রহমান বেটু) এই বিশেষ জাঙ্কলটায় বেশি করে মালিশ করে। শরতানের ব্যাঙাটা (ডঃ ওয়াজেদ মিয়া) আমাকে (শেখ হাসিনা) ১৯৮০ সালে এই জাঙ্কল মেরেছে, আজও সেই ব্যাঙা আমি কাতরাই।

ময়নার প্রধান কাজ ছিল বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনার দেহে মালিশ (মেসেজ) করা। প্রায় প্রতিদিন শেখ হাসিনার দেহে মালিশ (মেসেজ) করে খুব খেতে তোলা এবং খুমানোর আগে দেহে মালিশ করে তাকে (শেখ হাসিনাকে) খুম পাড়ানোই ছিল ময়নার প্রধান কাজ। এছাড়া ভি, আই, পি কেউ এসে তাকে এটারটেইনমেন্ট বা আপ্যায়ন করা। ভি, আই, পি, ব্যক্তির মাঝে প্রাথমিক আলাপ আলাচনা করে জনমেত্রী শেখ হাসিনাকে অস্বীকৃত করা। টেলিফোন করা ও টেলিফোনকারীকে প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন দেওয়া এবং নেত্রীকে তা ইনফর্ম করা। বসবস্তু কন্যার দাবতীর খাবার দাবাবের ব্যবস্থা করা। তার শাড়ি পোষাক আমাক তৈরি করা এবং শেখ হাসিনাকে আপড় চোপড় পোষাক পরিয়ে পরিপাটি করে বাইরের বিভিন্ন কর্মসূচীতে পাঠানো ইত্যাদি ছিল ময়নার দৈনন্দিন দায়িত্ব। এছাড়া ব্যক্তি দায়িত্ব হিসেবে ছিল নেত্রীকে বাইরের প্রকৃত খবরা খবর জানানো।

এসব করা ময়নার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু চাকরি ছিল না। এসব করার জন্য ময়নাকে বেতন করে রাখা হয়নি। উপরন্তু ময়নাই (মিসেস মতিবুত রহমান বেটু) জনমেত্রী শেখ হাসিনাতে টাকা পয়সা, কাপড় চোপড়; জিনিষপত্র যাবতীয় কিছু সাধ্যানুযায়ী দিত। কোরে ঘেয়ে শেখ হাসিনাকে খুম খেতে কুনো নাহা খাইয়ে তিনি খতকন ঘরে থাকতেন ততকণই ময়নাকে কাছে থাকতে হতো। কোন কোন দিন শেখ হাসিনার বাসা থেকে ময়নার নিজের বাসায় ফিরতে রাত ১/২টা ও হতো।

বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনা ময়নাকে ঘরে কঁদতে থাকতেন আর বলতে থাকতেন, জাম মচনা, শরতানের ব্যাঙা (ডঃ আমী ডঃ ওয়াজেদ মিয়া) আমাকে দিনে তিনবার মারতো। সকাল-দুপুর আর রাত্রে। এই তিন বেলা শরতানের ব্যাঙা শরতান, আমাকে মারতো। মেরে মেরে আমার মায়া শরীর কঁকরা করে দিতো। হাঙ্গামির ব্যাঙাটা দুপুরে এসে আমাকে মারবে, এই জন্য একবেলা কম মার পাওয়ার জন্য আমি (শেখ হাসিনা) জম আর গুতুল দুই সন্ধানকে নিয়ে দুপুরে পার্কে কাটিয়ে আসতাম। ঐ ইন্সপিক্টার মাহেরে চোটে আমার দেহের কিছু নাই। সারা দেহে শুধু ব্যাঙা। বিয়ের পর থেকেই শরতানের ব্যাঙা আমাকে মারা শুরু করেছে।



## অদ্ভুত চরিত্র, কর্ম ও ভাণ্ডা

শেখ হাসিনার স্বামী ডাঃ সত্যজোম বিদ্যা শেখ হাসিনাকে দৈহিক নির্ধাতম করতেন, মাতৃধর করতেন, এ কথা শেখ হাসিনা অসংখ্য হাত ফেরে ফেরে বলেছেন। শেখ হাসিনার কানায় মমানার চোখেও পানি উঠেছে। কিন্তু কোন স্বামী তাকে মারতেন, দৈহিক নির্ধাতম করতেন, এই কথা শেখ হাসিনা কখনই বলেনি। এ এক অদ্ভুত চরিত্র, কর্ম ও ভাণ্ডার অধিকারী শেখ হাসিনা। বিদেশ থেকে একমাত্র কন্যা পুতুল এসে মা শেখ হাসিনাকে ডাকে 'এই যে বহুবর্ণী' তোমার তো রূপের মেম নেই। এবার কি রূপ দেখাবে তুমি।

শেখ হাসিনা কোন কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে পুতুল আত্মীয় বজান ফুলের সামনে বলে উঠে, এটা তোমার কত নাচার রূপ! শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানা'কে পুতুল বলে, বাগা এটা তোমার বোনের কত নাচার রূপ? তোমার বোন তো বহুবর্ণী। রূপের শেখ নাই তার।

বহুবর্ণী কন্যা অনুনেতী শেখ হাসিনা 'অবকলা' হুল মেয়ে ছান। কোন কথা বলেন না। শেখ হাসিনা মেয়ে পুতুলকে ডার (পুতুলের) নিজের বিয়ের প্রস্তাব দিলে, কোন রকম টাল বাহানা না করে বিনা বাকে। দুহুর্জের মধ্যে সটান এক পায়ে গীতিকার জঞ্জি হয়ে যায়। মনে হয় যেন কারো হাত ধরে মুক্তি পেতে চায় পুতুল। শেখ হাসিনাও যেনতেন পাতকের কাছে পুতুলকে বিয়ে দিয়ে মুক্ত হতে চান।

বহুবর্ণী কন্যা শেখ হাসিনা বিশেষে বনবালগর একমাত্র পুত্র জয়কে কোন করে দেশে এসে বেড়িয়ে দেতে বলেন এবং আবার সময় তার (শেখ হাসিনার) জন্য একটা শাড়ি নিয়ে আনতে বললে, পুত্র জয় সরাসরি অস্বীকার করে বলে, "ও নর শাড়ি টাট্টি আনি আনতে পারবো না।"

শেখ হাসিনা আবার উপস্থিত সকলকে বলে, দেব, আমার সম্ভান দেব, আমার জন্য একটা শাড়ি আনতে বললাম। ছেলে আমার সম্ভানধি না করে দিল।

মা হিসেবে পুত্র কন্যার প্রতি শেখ হাসিনার আচার-আচরণে কোনদিন কোন এটি চোখে পড়েনি। বরং মনে হয়েছে মা হিসেবে শেখ হাসিনার কুলনা নেই। তারপরও আচরণের বিষয়! শেখ হাসিনার প্রতি সত্য পুত্র-কন্যার কোন এককম আচরণ!

## রাজাকারের ছেলের সাথে বিয়ে দিব না

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার কন্যা শুভ্রদের বিয়ে ঠিক করলে, খানমন্ডি ও শাখর মোস্তফার ওঃ নামার বাড়িতে শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়া এসে কিও হয়ে শেখ হাসিনাকে বলতে লাগলেন, মেয়ে কি তোমার একার? মেয়ে কি আমার না? তুমি রাজাকারের ছেলের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছ? রাইফেল হাতে নিয়ে যে রাজাকারগিরী করেছে, মুক্তিযোদ্ধা মেয়েকে, তার ছেলের সঙ্গে আমি কিছুতেই আমার মেয়ে বিয়ে দিব না। তুমি আমার মেয়েকে ঐ রাজাকারের ছেলের সাথে কিছুতেই বিয়ে দিতে পারবে না।

অনুভবী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, আমি নেচে বিয়ে দিব। পারলে তুমি ঠেকাও।

ডঃ ওয়াজেদ বললেন, তাই বলে তুমি রাজাকারের ছেলের সাথে মেয়ে বিয়ে দিবে?

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, কিসের আখার রাজাকার ফাজাকার? আমার আত্মীয় এটাই বড় কথা। সাথে মরলে আত্মীয়রাই মরে। দেখ-নাই ঐ মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধারাই আমার বাপ-মা-ভাইদের কিভাবে মেয়েছে? আমি আমার মেয়েকে এখানেই বিয়ে দিব। পারলে তুমি ঠেকাও।

ডঃ ওয়াজেদ মিয়া বললেন, তোমাদের সাথে তো আমি ঠেকাঠেকিতে পারব না। তবে আমি বলে দিচ্ছি আমার মেয়েকে যদি রাজাকারের ছেলের সাথে বিয়ে নেও তবে আমি এই বিয়ের সাথে নেই। এই বিয়েতে আমি আসবো না। আমি তোমাকে (বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে) অনুরোধ করছি ঐ রাজাকারের ছেলের ছাত্রা দেখানে শুশি দেখানে তুমি মেয়ে বিয়ে লাও, আমি তোমার সাথে থাকবো। কিন্তু রাজাকারের বংশের ক্যুছে মেয়ে বিয়ে দিলে আমি থাকবো না।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদের কথা রাখলেন না। তিনি তার ইচ্ছে মতো রাজাকারের ছেলের সঙ্গেই মেয়ে বিয়ে দিলেন। সত্যি সত্যিই ডঃ ওয়াজেদ কথা পকেপাকি, পান চিনি, গায়ে হলুদ এবং বিয়ে কোথায় আসলেন না। তখু বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে মিনিট ৩/৪-এর জন্য এসে আবার খালেদা জিয়ার সঙ্গেই চলে গেলেন। তিনি কারো সাথে কোন কথা বললেন না। কেউ তাঁর সঙ্গে কোন কথা বললো না।



সময় মতো হয় বিভিন্ন ধর্ম অনুসরণ করে আসলে মানুষকে একে একে ভেঙে ফেলা হয়। এই ১০ জনের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা।  
 এতে মানুষ মানুষের মতো একে অন্যের মতো হয়ে উঠে। মানুষ নিজেকে ভেঙে ফেলে এবং নিজেকে অন্যের মতো করে তুলে নেয়। এই ১০ জনের মধ্যে ছিলেন  
 বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা। এই ১০ জনের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা। এই ১০ জনের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা।

বিয়ের পুটিনাটি থেকে তরু কতর মানজীয়া যা আয়োজন তার সিংহাসনই করতে হয়েছে। আয়ালের (এখনমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক অনাহিত মোসিত এক নাখার মতিবুর রহমান বেইট দুই নাখার যিনেস মতিবুর রহমান বেইট, ময়না)। এর উপর বহুবকু কন্যা শেখ হাসিনার মালার মুক্কাফো জাইয়ের ফেল মতিবুরে এখনমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ, পি, এস বাহুউদ্দিন মাদিমের বায়না হো ছিলই। ডেকোবেটারের বিক, বাবুটির বিল, মানমায়ার বকশিস ইত্যাদি এখন যা ময়োজন হয়েছে, বাহুউদ্দিন মাদিম তার সব কিছুই আমাদের কাছ থেকেই নিয়েছে।

## সব যান বেই হন

বিয়ের অনুষ্ঠানে বিয়ে বাড়ানোর জন্য কার্জীর সারনে একটি মাইক লাগানো হয়েছিল। বহুবকু কন্যা শেখ হাসিনা হঠাৎ সেই মাইক দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে আগতদের মালার ওসারে মনকের সুখে বলতে লাগলেন, সব যান বেই হন, কি পেয়েছেন! তামাশা পেয়েছেন! এখনই এই জায়গা থেকে চলে যান। নইলে অনুদিয়া হবে।

বহুবকু কন্যার মুখে মাইকে-এই কথা শুনে উশাহিত হকলে হতমিলন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান। এবং অনেকই আশা-নাখা না শুধে অনুষ্ঠান ফেল চলে যেতে এক করলে, ময়না জাজাজাজি জননেদীর কাছে এই কথাই অর্থ কি জানতে জাইলে শেখ হাসিনা বলেন, মাওয়াত জাজাই অনেক এনেছে, তাপেও ময়না আমি এই কথা বলেছি। এরপর ময়না মিছরিজ জতিবিরের অনেককে দুলাবার চেঁচা করেছে। কিন্তু কারে ফল হয়নি। অধিকাংশ মিছরিজ জতিবিরই না বেয়ো চলে যায়।





एक समिति द्वारा आयोजित विद्यालयी छात्रों  
द्वारा एक समिति द्वारा आयोजित विद्यालयी छात्रों



বিয়ের লক্ষ্য অনুষ্ঠান শেষ। সকলেই চলে গেছে। শুধু বব (জামাই) আর  
বরের আতীত-বন্ধনটা রয়েছে। বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনা তার কন্যা পুতুলকে  
হরের পাড়িতে তুলে নিয়ে মরনকে জড়িয়ে ধরে কান্নাচ বেহে শঙ্কলেন। তথাপি  
জননেত্রী শেখ হাসিনা মরনকে বললেন, মরনা আজ আর তুমি আমাকে ছেড়ে  
যেও না।

নিয়ের অনুষ্ঠান হল সংসদ ভবন চত্বর থেকে শেখ হাসিনার সঙ্গে আমাদের  
একমাত্র সন্তান পাঁচ বৎসরের স্বর্ণলতাকে সাথে নিয়ে ধানমন্ডি ৫ মাঝারি ঘোড়ে  
শেখ হাসিনার ৫৪ মাঝারি পাড়িতে চলে এলেন। বাড়িতে এসে বাইরের কাপড়  
থ্যেটে সবাইকে নিয়ে মাটিতে গোল হয়ে বসে জননেত্রী বসবস্তু কন্যা শেখ  
হাসিনা মরনকে বললেন, মরনা তোমরা যা করলে, তোমাদের স্বর্ণ জীবনে শোধ  
করা হয়েছে না। তোমারিন তোমাদের তুলনা হবে না। তোমারিন তোমাদের তুলনা  
না। আমাদের মেয়ে স্বর্ণলতাকে দেখিয়ে বললেন ও তো পেটে থেকেই আমাকে  
কলবাসে।

অবশ্য এসব কথা বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনা আজ নতুন বলছেন না। এর  
আগেও অনেক বার এসব কথা তিনি বলেছেন।

## এক কোটি সাততালিশ লাখ টাকা

১৯৯৫ সাল। ১০ই জানুয়ারী। জাতির জনক বসবস্তু শেখ মুজিবুর রহমানের  
বিশেষ শ্রদ্ধাবর্ধন দিবস। ধানমন্ডি নমিশ মাঝারে বসবস্তু ভবনে বসবস্তু  
শ্রদ্ধাভিষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ক্রম হোহন নামের নামে রেজিস্ট্রি করা শেখ  
হাসিনা দ্যায় হস্তের নিশান প্রেট্রিল জীলে করে ফিরে আসছেন বসবস্তু কন্যা শেখ  
হাসিনা। তার সঙ্গে তার পাশে বসে আছে তার একজন মাত্র সখী। জাহিতার  
জালাল পাড়ি চালাচ্ছে। পাড়ি চলছে। জাহিতার জালাল বসবস্তু কন্যা শেখ  
হাসিনাকে জিরকস করল আশা মেয়র হাসিনা এল না মূল দিতে?

বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনা জবাব দিলেন, কে জানে। বসবস্তু শ্রদ্ধাভিষে  
মূল নেওয়ার জন্য তাকে কম ফোন করি নাই। এর কাছে কম লোক পাঠাই নাই।  
তারপরও বেইমানটা আসে নাই। শরতানটা পাবাই নেয় নাই। এক কোটি  
সাততালিশ লাখ টাকা খরচ করে নিমকহারামটাকে আমি মেয়র বানিয়েছি।  
তোমরা তো সব জান, সবই সেবেয়, সবই করেয়। ক্ষত কষ্ট করেছি আমি।  
আসলে যে মূল থেকে একবার চলে যায় তাকে আর মূলই নেওয়া উচিত না। ও  
বের হওয়ার জন্য আমায় সাথে বেইমানি করে বৈদ্যচাকী এশাসকে বাণ ফেলে  
এশাসদের পাড়িতে চলে গেছিল। সেইখানে হেক বেয়ে আমার আমার কাছে  
ফিরে যখন আসলো তখনই বেইমানটার নেওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু কি যে  
হইলো। কি মনে করে যে আবার নিলাম। শরতানটা আমার সাথে এত বড়  
বেইমানি করবে মূলকে পাঠি নাই। মূলকে পাঠি নাই। মূলকে কি আর এই কান  
করি।

## দেবী এখন নামাজ পড়ছেন

বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৪ সালের শেষ মুহূর্তে খানমতি ও নাহার বোকের ওই নামজার কাঙ্ক্ষিত উঠেই, '৯৫ সালের জানুয়ারীক প্রথম থেকেই জোরসেবের জায়ে লাগাতর আন্দোলন স্বগ্রাম, হরতাল, পদযাত্রা ইত্যাদি শুরু করলেন। দুপুর দুটায় উনি কেঁকে মহাখালী পর্যন্ত পদযাত্রা শুরু হলো। অর্থাৎ উনি থেকে সবাই পায়ে হেটে মহাখালী গিয়েন। মহাখালীতে মধ্য তৈরি করা আছে, পদযাত্রা শেষে এই মধ্য থেকে বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ভাষণ দিবেন। শেখ হাসিনা তার বেকনকৃত ব্যাখ্য বহনকারী নাম মোহন নাদ এত নামে রেজিস্ট্রেশন করা নাম করণের নিশান পেট্রোল জীপে করে হালি সব নেতা কর্মী সবাই পায়ে হেটে, উনি থেকে মহাখালীক দিকে উঠানো হল। প্রায় পাঁচ সাত মিনিটের লোকের পদযাত্রা। পদযাত্রায় অংশ নেওয়া ৫/৭ হাজার লোকের ঠিক মাঝখানে বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জিপে করে পদ-যাত্রার সঙ্গে তার মিলিয়ে চলছেন। পদ-যাত্রার আগে মাঝে পেট্রা বিশেষ রিক্সার হালিক বেঁধে মাঝা ধরনের প্রোপান নেওয়া হচ্ছে। জানুয়ারী মাস, শীতের রোনা। ইটতে খুব একটা বাতাস লাগছে না। দুপুর গড়িয়ে কিংকল হবে হবে। হঠাৎ এমনটি মাইকে কল হল জননেত্রী বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এখন আসব নামাজ পড়ছেন।

সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো মাইক থেকে কল শুরু হল জননেত্রী বহুবন্ধু কন্যা এখন আসব নামাজ পড়ছেন। হালিতে অর্থন নোয়া কিনটে যাবে।

প্রেসিডিয়াম সনসা জোয়ারেল আহম্মেল (গভর্মানে শেখ হাসিনার শিষ্ট ও বাগিলা মন্ত্রী) বললেন, আরো ওঠেনা খামে, এখনও আসব ওঠাকুই হয় নাই। একটু পরে বল।

এই কথা শুনে মধ্য নেতাজ হুসাখালি শুরু করলেন। এমিকে বহুবন্ধু কন্যা নিশান পেট্রোল জীপের বড় বড় জানালায় ছান খুঁজে নামাজ পড়তে শুরু করলেন। আর পদযাত্রার হাজার হাজার পুরুষ লোক জীপ পাড়ি দিয়ে বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নামাজ পড়া দেখতে লাগল। নামাজ শেষ হয়ে গেল কিন্তু মাইকে নামাজ পড়ান প্রচার শেষ হলো না। প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় পেট্রা বিশেষ মাইকে জননেত্রী বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নামাজ পড়ছেন প্রচার করা হল।

আমি আর একদিন মোহাম্মদপুর পেট্রা পদযাত্রা শুরু হয়ে শুকশান আমেরিকান এম্বাসির সামনে দিখে রাক্তার বেহা শেষ হবে। পদযাত্রা শুরু হলে বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ডেকে বললেন, নামাজের ওয়াক্ত উঠার পরে যেন মাইকে কল শুরু করে। ওয়াক্তের আগে যেন কল শুরু না করে।



এবার মাইক মাঝদেওর আগে উঠেই জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ জানিয়ে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে মাঝদেওর ওয়াক-উপ ইংগিত পরই মাইকে প্রচার শুরু হয়। নেত্রীও যথাযথি নিশান পেট্রোল জীপের মালিক খুলেই নামাজ আদায় করলেন। হাজার হাজার পুরুষ মানুষও জীপ নিজে হস্তবদ্ধ কন্যা শেখ হাসিনার নামাজ আদায়ে দেখল। পদ্মসাত্তা শেখের বস্ত্রবদ্ধ কন্যা তার ও নামাজ ধনমতি রোডের বাসায় গেলে তার একমন্ত্রী বলল, অগা (শেখ হাসিনা) আপনি নামাজ পড়তে থাকলে মানুষ কিছু করে আপনাকে দেখতে পারে, এতে নামাজ নষ্ট হয়। আপনি নিশান পেট্রোল জীপে বসে গিয়ে নেন।

উত্তরে শেখ হাসিনা বললেন, না পরী মাঝদেওর জীপের ফিল্মিং থাকে না। তখন ঐ নরী বলল, তাইলে অগা আপনি জীপে বসে উঠুন। চান্দ সাখরেন, এখন নামাজ পড়বেন আমরা তখন ঐ চান্দর দিচ্ছি জীপটি দিচ্ছি তখন। যাতে আপনাদের নামাজ পড়া কেউ দেখতে না পারে।

জননেত্রী বললেন, না তোমরা তো সব তাইয়ের মতো, চান্দ সাখরেন না।

**আমার সাথে বেইমানী করেছে**

এক দিন দিন পড়ে অচপুয় থেকে চলিহান পর্যন্ত পদ্মসাত্তা। এই পদ্মসাত্তায়ও ঐ একই মাইক, একই নামাজ, একই পুরুষ মানুষের মির দেখা। এই পদ্মসাত্তায় বেশ নিয়োগিল নেয়োগিলি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ হানিফ। হস্তবদ্ধ কন্যা শেখ হাসিনার নিশান পেট্রোল জীপের পাশ ইন্ডিতে উঠতে নেয়োগিলি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ হানিফ বস্ত্রবদ্ধ কন্যা শেখ হাসিনার জিরেক্স করলেন, নেত্রী আমার মিতায়ে দেখছি না?

নেত্রী বললেন কোন্ মিতা?

জেলা সভাপতি বললেন, তার আওয়ামী লীগের সভাপতি থাকার মেসার নোঃ হানিফকে দেখছি না?

জননেত্রী রোগে বলে উঠলেন, জানেন না, কুতাব বাফাটা আমার সাথে বেইমানী করেছে। নিমকহায়ায়ী করেছে। তার আমি এক কোটি সাতশিশ লাখ টাকা খরচ করে মেসার হানিফকে। তার কুতাব বাফাটা আমার সাথেই বেইমানী করেছে। ও (দেফার মেসার হানিফ) এখন প্রকিনিন নামেরা তিয়ার সাথে দেখা করে। দিনে তিন-চার বার আসেনা জিয়ার সাথে জেদে কথা বলে। আর জরি ববদ দিলেও আসে না। কোন করলেও ধরে না। সমস্ত আসলে এই বেইমানদেরও শিক্ষা দিতে হবে। বুজলেন, এই বেইমানদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে। আপনারা প্রবৃত্ত হন।

জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সারা দেশে লাগাতার তিনদিন হরতাল নিয়েছেন। দোকান-পাট খুলবে না, অফিস-আদালত, কলকারখানা, কুল কলেজ চলবে না, গাড়ির চাকা ঘুরবে না। আগাম তিন দিনের হরতালের ঘোষণা পাওয়ার ঢাকা শহরের প্রাচ্যে অর্ধেক মানুষ শহর ছেড়ে বাসের বাড়িতে চলে গেছে। হরতালের প্রথম দিনেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাত বাড়ির (খানমন্দির ও নাহার সোভেট ওর নাহার বাড়ি) ছাটির নিচেব পানির ট্যাঙ্ক (বিস্তারকার) থেকে ছাদের উপরের ট্যাঙ্কিতে পানি তোলায় মটর নষ্ট হয়ে গেলে হরতালের দ্বিতীয় দিনে রাত আটটার সময় নবাবপুর থেকে সিরাজী নামের এক ডাকহীরা মটর মেকানিক নিয়ে আসা হয়। মটর মেকানিক সিরাজী মটর মেখে এটা ঠিক করতে একদিন সময় লাগবে এবং মটরটা খুলে নিয়ে যেতে হবে জানালে তাকে মটর খুলে নিয়ে যেতে অনুমতি দেওয়া হয়। মটর মেকানিক সিরাজী আওয়ামী লীগের পোড়া সমর্থক। সে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে একটা সালাম দিতে চাইল। বঙ্গবন্ধু কন্যা দু'দিন থেকে মটর নষ্ট হওয়ার কারণে ঠিকমতো খোদল করেননি। তার উপর আজ সারাদিন নিচেই নামেন নাই। এই পরিস্থিতিতে মেকানিক সিরাজী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে সালাম দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে একটা বিদ্রোহের অবস্থায় ফেলে দিল। আবার মেকানিক সিরাজী কষ্ট করে পায়ে হেঁটে এখানে এসেছে। এসব চিন্তা ডাকনা করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বলা হলো মটর মেকানিক আওয়ামী লীগের একজন কর্মী। সে আপনাকে একটা সালাম দিয়ে যেতে চায়। জননেত্রী সালাম দিতে অস্বীকার করলে, জননেত্রীকে বলা হল আপনি সালাম দিলে মেকানিক ডাড়াডাড়ি মটর মেরামত করে দিত।

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, ওর বাড়ি কোথায়?

ঢাকায়।

ঢাকাইয়া কুটি?

জি, বাস ঢাকাইয়া।

ঠিক আছে দোকালার ডি আই শি কমে নিয়ে আসো, আমি ছাড়ে বসে নেই।

মেকানিক সিরাজী এসে সালাম দিল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জিজ্ঞাস করলেন আপনার বাড়ি কোথায়?

সিরাজী বলল নবাবপুরে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, বসেন।

সিরাঙ্গী খুনই স্বভাবের সাথে জড়িয়ে হয়ে বসল। নেত্রী জিজ্ঞেস করলেন, আওয়ামী লীগ করেন বুনি।

মেকানিক সিরাঙ্গী বলল, শাকিবহান আমল থেকেই আওয়ামী লীগ করি।

এরপর জননেত্রী শেখ হাসিনা একটানে মেয়ের হানিককে কথায় টেনে এনে বসলেন, আমি ঢাকায়। হিসেবে হানিককে খোর বানালান, আর হানিক খোর হয়েই আমার সাথে বেইমানী করল। আপনারা হানিককে স্বাক্ষরেন না। আমি এককোটি নাত্রিশ লাখ টাকা খরচ করে হানিককে মেঘর বানিয়েছি। আর সেই হানিক আমার সাথে নিমকহারামী করে খালেনা জিয়ার আঁচলের তলে ঢুকেছে। প্রতিদিন খালেনা জিয়ার সাথে দেখা করে, খালেনার কথাগুলো আমার আনোমনে আসে না। বেইমান নিমকহারাম আপনারা তৈরি হন শুধু উচিত শিক্ষা দিবেন। ইত্যাদি বলতে বলতে এক পর্যায়ে মটর মেকানিক সিরাঙ্গীকেই আওয়ামী নির্বাচনে হানিকের বিরুদ্ধে মেঘর প্রার্থী করে ফেললেন। তারপরও মেঘর হানিকের বিরুদ্ধে কথা বলার শেষ হল না। প্রায় ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেল। কিন্তু কথা শেষ হলো না। এনিকে বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার আগেই বলাইল-যে কোন লোকই আমার কাছে এলে কিছুকণ পরেই ভোমরা নানা করনের কথা বলে তাকে আমার নামের থেকে ডুলে নিয়ে যাবে। আমার (শেখ হাসিনা) এত ভাল গভীর নাই যে আমি খট্টায় পর খট্টা একজনকে সামনে নিয়ে বসে থাকব। আবার আমি নিজে তো কাউকে বলতে পারি না এখন দান। কাজেই আমার কাছে কেউ এলে ভোমরা তাকে নানা কথা বলে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। নেত্রীর এই কথা মনে করে মটর মেকানিক সিরাঙ্গীকে বলা হল, আপনি উঠেন, নেত্রী রাতের খাবার খাবেন।

সিরাঙ্গী উঠে নাড়ালো, কিন্তু বহুবন্ধু কন্যা কথা থামালেন না। সিরাঙ্গী কিছুকণ নাড়িয়ে থেকে আবার বসল। দ্বিতীয় বার আবার সিরাঙ্গীকে বলা হল, আপনি উঠেন নেত্রী রাতের খাবার খাবেন।

কিন্তু বহুবন্ধু কন্যার মেঘর হানিকের বিরুদ্ধে কথা শেষ হল না। তিনি বলতেই থাকলেন, মেকানিক সিরাঙ্গী আবারও বলে পড়লো। বহুবন্ধু কন্যা মেঘর হানিকের বিরুদ্ধে বশব্দ হুয়ে কথা বলেছেন। মিনিট দশেক পরে মেকানিক সিরাঙ্গীকে তৃতীয় বার বলা হল আপনি উঠেন নেত্রী রাত খাবেন।

বলে বলে বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলে উঠলেন, আমি বাইছি।

## বহুবন্ধু শেখ মুজিবের জন্য উৎসব

১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকেও এক বিকেলে খানকাউ ৩২ মাঝারে বহুবন্ধু ভবনে বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যা খেতে যেতে বসলেন, এবার আপনাদের জন্য মিনটা জাকজমকভাবে পালন করতে হবে। দুই অনুষ্ঠান টুপি পাড়ায়

হবে। ঢাকা থেকে অনেক লোকজন নিয়ে যেতে হবে। ওয়াশিংটন কান্ট্রের নেতৃত্বে একটা উপকমিটি করতে হবে। আর তোমরা শুধু সাহায্য সহযোগিতা করবে। মোট কথা আকার ৭৬তম জন্ম দিনটা আকর্ষণীয় করে করতে হবে।

১লা মার্চ ১৯৯৫, শুক্রা বেলায় খানমন্ডি ছয় নম্বর রোডের আওয়ামী ফাউন্ডেশন অফিসে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক রুম। বৈঠকে ওয়াশিংটন কান্ট্রের (বর্তমান মুখ্য ও সংস্কৃতিক বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী) নেতৃত্বে উপকমিটি করে তিন দিন ব্যাপি কর্মসূচী নেওয়া হল। কর্মসূচীর প্রথম দিন ১৭ই মার্চ টুহিপাড়ায় সকাল ৭টায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজারে পুষ্পমালা অর্পনের মাধ্যমে শিবিরের কর্মসূচী শুরু হবে। ঐ দিনের কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ে সকাল আটটায় শিও কিশোরদেরকে মিলি বিতরণ। মিলি বিতরণ করবেন জনসেন্সী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। এরপর বিকেল তিনটার গোমনডাঙ্গা হুই কুল মাঠে আলোচনা সভা। আলোচনা সভা শেষে লাঠি খেলা। কর্মসূচির ২য় দিনে অর্থাৎ ১৮ই মার্চ ঢাকায় আওয়ামী-লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে শুক্রা রাতটার সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবং কর্মসূচীর তৃতীয় দিন ১৯শে মার্চ বিকাল তিনটায় বঙ্গবন্ধু এডিনিউ-এ জনসভা।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৭৬ তম জন্ম দিনের কর্মসূচী সান্ত্বায়ন করার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সকল প্রকার প্রকৃতি পুরোনমে এগিয়ে চলছে। এবারের টুহি পাদা কর্মসূচীতে একটা নতুনত্ব থাকবে। সেই নতুনত্ব হলো ঢাকা থেকে শ'পাঁচেক মুখ্য টুহি পাদায় নিয়ে যাওয়া হবে। এই মুহুরতের প্রত্যেককে নেওয়া হবে ইউনিয়ন কাপড়ের নতুন কুল হাতা লালা মার্চ। এই মার্চের পরেই এ্যাম্বুল্যান্স করে সেখা থাকবে "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৭৬ তম জন্ম উৎসব।"

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা জনসেন্সী শেখ হাসিনা ঢাকা থেকে আগত অতিথিদের টুহি পাদায় বাগত জানালোর জন্য ১৫ই মার্চ ১৯৯৫ টুহি পাদা চাল এলেন। ১৬ই মার্চ ওয়াশিংটন কান্ট্রের নেতৃত্বে ঢাকা থেকে যুবকরা এল। তবে পাঁচ নম্বর মুখ্য ঢাকা থেকে নিয়ে জানার কথা থাকলেও মোটামুটি দুই/তিনশত মুখ্য ওয়াশিংটন কান্ট্রের নিয়ে এসেছে। সেই সাথে আরো কিছু অতিথি ঢাকা থেকে এসেছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা আগত সকল অতিথিদের বাগত জানালেন। ঢাকা থেকে আগতদের গোপালগঞ্জ সরকারী সার্কিট হাউস, টুহিপাদা উপজেলা কোর্ট ও কার্যালয়ের বিভিন্ন জায়গায় রাতে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হল।



পরদিন ১৭ই মার্চ সকাল দীটার মধ্যে টুপি শাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর মাজার ও বাড়িকে লক্ষ্যে এসে হাজির হল। পূর্বের বিকল্প অনুযায়ী ইউনিয়ন কাগজের ট্রী করা নতুন কুলহাতা মার্চ পথে ওয়াদাঙ্গুল কানের প্রায় দ্বিগুণ শক্ত যুক্ত নিয়ে কাঁড়িয়ে আছে। সকাল সোজা সাতটার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজারে প্রথমেই পুষ্পস্তবক অর্পণ করলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাবিলা। তারপর অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ ও অধিষ্ঠিগণ। এরপর শিশু কিশোরদের পুষ্পস্তবক অর্পণ। কিন্তু একমাত্র মিসেস মতিবুর রহমান রেবু (ময়না)র একমাত্র কন্যা স্বর্ণমতী হাজো অনা কোন শিশু ঢাকা থেকে আসেনি। আর টুপিগাড়া গ্রাম থেকে যে সকল শিশু-কিশোর মিষ্টি নেওজার অনা এসেছে, তাদের সকলেই প্রায় বিবর। মাঝে মাঝে হালিও এক আদর্শনের গায়ে বস্ত্র আছে, তবে সে বস্ত্র এতই ছোট এবং মলিন যে তা বিবর মনে হয়। কাজেই বিবর শিশু কিশোরদের পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে না দিয়ে শিশু-কিশোরদের পক্ষ থেকে একমাত্র সবেখন নীলমনি স্বর্ণমতীকেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে হল।



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজারে টুপি  
মতিবুর মতিবুর রহমান রেবু কন্যা স্বর্ণমতী।

## হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিডিওটা সুন্দর হত

এর পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুমতির দ্বিতীয় কর্মসূচী শিত-কিশোরদের মাঝে মিটিং বিতরণ। মিটিং বিতরণ করবেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা। বাজার থেকে ৩০/৪০ ফুট পশ্চিম দিকিখে শেখ জাতির জনক শরীফের যে উঠান (উঠান মানে প্রহরার ঘরের সামনের খালি জায়গা)। এই উঠানেই দাঁড়িয়ে আছে শত্রুদের শিত-কিশোর। এই উঠানের পশ্চিমে শেখ হাসিনার বঙ্গীয় চাচা শেখ কবিরের ঘর। এই ঘরের সামান্যতকই বন্ধ ছিলেবে ধরা হকছে। এখনে বন্ধুতা দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হকছে। অনুষ্ঠানটি ভিডিও করা হকছে।

সকাল সাড়ে আটটায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আদর্শ বাস্তবায়িত করার স্বপ্ন চোখে নিয়ে ছাব্বিশটির ছাত্বে বীর পারে শিত-কিশোরদের মিটিং বিতরণ করার জন্য এগিয়ে এলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা জনমেত্রী শেখ হাসিনা। কিছু একি! অনুষ্ঠানে উপস্থিত তখন সাত শিত-কিশোরের সকলেই জায় বহুদীন। বাজার ঘাড়ে একআধটা শিত আখার সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আর এই অনুষ্ঠানেই এবাদতুল কাদেরসহ ঢাকা থেকে আসা শত্রুগণ যুবক সাদা নতুন কুম্ভাতা সার্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই সার্টের পকেটেই প্রায়জারি করে লেখা আছে "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭৬তম জন্ম উৎসব।"

এই কি বিদ্রোহ? এই কি বিদ্রোহ দিনেচনা? এই কি ইনসাত? জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্য উৎসবের এই দিনে, জন্ম উৎসবেই আসা টুপিপাড় প্রায় বাহ্যার এই দুঃখী-বগ্নহীন শিত-কিশোরদের ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্য উৎসব উপলক্ষেও কি এক টুকরা নতুন কাপড় ছুটল না?

নিজেকে আর সামান্যনা পেল না। এবাদতুল কাদেরকে প্রহর এক বন্ধক দিলাম এই বলে যে, দিয়া নিজে ফোঁ সাক্ষ্যাপ নিয়ে চান্দর পরসায় নতুন জামা পরয়ে দাঁড়িয়ে আছেন: কি হাত দু'জাতশ জামা এই হতভাণা বহুদীন শিতদের জন্য নিয়ে এলে?

ধমক দেওয়ার মুহুর্তেই মনে হল বঙ্গবন্ধু কন্যা জনমেত্রী শেখ হাসিনা আমার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হকছেন, তাই কড়িয়ে নেওয়ার জন্য বললেন, এটেলিঃ ভিডিওটা সুন্দর হত।

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা খুশি হয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ  
ভিডিওটা সুন্দর হতো।

এরপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা জনমেত্রী শেখ হাসিনা এক টুকরো মিটিং পোলেই খুশি হতভাণে শিত-কিশোরদের মাঝে মিটিং বিতরণ করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭৬ তম জন্ম উৎসবের দ্বিতীয়া পর্ব শেষ করলেন।



আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে নব্বই জন শ্রমিক তফদার বিষয়কে তফস্ব দেওয়া হয় এবং বিতর্কিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বলা হয়, আওয়ামী লীগের বিদ্রোহের প্রতি দৃষ্টি রাখি দেখিয়ে নব্বই জন শ্রমিক তফদার করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা বিদ্রোহ যুবলীগ কর্মীর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া নব্বই জন শ্রমিক তফদার প্রয়োজনে শান্তিযোদ্ধা অপরাধ। যদিও যুবলীগ প্রার্থী নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে শৌকসভার চেয়ারম্যান হইবে তবুও তাকে শান্তি দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্ব। কেননা নামনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। যুব লীগ কর্মী এবং বর্তমানে চাঁদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানকে নব্বই জন শ্রমিক তফদার দৃষ্টিতে মূলক শান্তি না নিলে সংসদ নির্বাচনেও অনেকই আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীরা বিদ্রোহ নব্বই জন শ্রমিক তফদার করে প্রার্থী হওয়া পারে। ইত্যাদি বিতর্কিত আলোচনার পর শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সদস্যবৃন্দকে যুবলীগ কর্মী চাঁদপুর পৌর সভার নব নির্বাচিত চেয়ারম্যানকে সংগঠন থেকে বহিস্কার করার সিদ্ধান্ত নেয়া।

পরদিন সকালে শেখ হাসিনার চাচাতো ছাই শেখ হাসিনার ৪র্থ ছেলে শেখ হেলালুর ৪র্থ ছাই ২০/২২ বৎসরের যুবক শেখ কবেল খানসাহা ৫ মাধ্যমিক শেখ হাসিনার খসরা এনে বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে কলস, আশা কুমি চাঁদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানকে খসরা নিয়ে করণ করে নেও।

শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু মা-ওয়ে বহিস্কার করল। শেখ কবেল খসরা, ৫ মাধ্যমিক হাইস্কুল (পর্যাপ্ত করে) চেয়ারম্যান হইবে ওয়ে মালা না নিয়ে বহিস্কার করল এইটা কুমি (শেখ হাসিনা) কও কি? জলদি করে ছাইকা ছাইকা খসরা মালা নিয়ে মিষ্টি খাওয়াও।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু, দূর গন্তব্যেই তো আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ওয়ে বহিস্কার করল।

শেখ কবেল খসরা, তার জোয়ার ওয়ার্কিং কমিটি ওয়ার্কিং কমিটি কর্মীদের কথা কুমি হইলো না। ওরা জানে কি? বেচারা জিহা অইতে জোয়ার নাহলো দিবা। তানা এখন উল্টা কথা। বড় আপা কুমি চেয়ারম্যান হিসেবে অভিনন্দন পাঠাও। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বঙ্গবন্ধু হইলো এক কথ কবি আগে বহিস্কার কটি পরে বহিস্কার প্রত্যাহার কবি।

শেখ কবেল খসরা দেখ, আমি জোয়ারে কইতেছি, এখনই চেয়ারম্যান হিসেবে অভিনন্দন জানাও আর টাকা ছাইকা মিষ্টি খাওয়াইয়া খসরা মালা দেও।

সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু, ছাইলো তো এখনই জিহুর বহমান (আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক) কে বলতে হয়, বইলো আবার বহিস্কারে চিঠি পাঠিয়ে দেবে। এতক্ষণে পাঠিয়ে দিয়েছে ফিলা ও জোয়ার।



কলেই সঙ্গে সঙ্গে কোন করে আত্মনীর লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিতুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু, তলেন, শতকরা প্রাপ্তি ওয়ার্ড কমিটি টানপুর শৌকসভার চেয়ারম্যানকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নিয়েছে এই টিটিটা পাঠিয়ে না। চেপে ঘান।

একদম শেখ কবেল তলেন দাওয়ার জন্য নিজেই মেমে এসে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার খালাস ফুফুকে ডাইনেই তলেন মন্দির আহমেদে নাইন শেখ কবেলের পথ আশ্রমে বঙ্গবন্ধু, এই কবেল-টানপুরের চেয়ারম্যান-এক কবেল থেকে কত টানল নিয়েছিল? আদার জাণ দে।

শেখ কবেল-কলে, দুই কু-নতো, ফাইতে নাও।  
মন্দির কলে, জানাত প্রাণ মে নইতে ফাইতে দিলেন। বঙ্গ আশ্রমে কইয়া নিম্ন। শেখ কবেল হলে পথে নিও, পরে নিও। এখনও হাতে পাই, ফাই। মন্দির কলে, টিক অফে আশ্রমে নিম্ন কো?  
ইয়া নিম্ন।

## জানাতা কে শান্তি থাকার শক্ততা

১৯৯৩ সালের ২৪শে আগস্ট পুলিশ মিলাপনে ধাক্কি পৌছে দেওয়ার নাম করে ইয়ানমিন নামে ১৪ বছরের এক কিশোরীকে সিনাকপুর দাওয়ার পায়ে ধরান ও হত্যা করে। এই বঙ্গর জানাতা হতে খেলে পর পমিতায় জ্ঞান-হলে, সিনাকপুরের মানুষ বিজ্ঞ হলে উঠে। এবং সিনাকপুরের মানুষ পুলিশের বিজ্ঞ মিছিল মিটিং এক কবেল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সিনাকপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট অ্যাড্ভ লাইমসহ কবেলজন মেলা নেতাকে ফাইলমে জ্ঞানী কিত্তে ঢাকনা কবেল করেন। এডভোকেট অ্যাড্ভ লাইমসহ সিনাকপুরের পাঁচ নেতা ঢাকা এসে ৩২ মাসের মানবাধিকার বঙ্গবন্ধু কবেল লাইমসহ কবেল বিজ্ঞ প্রাপ্ত খালাস বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে কবেল বৈঠক করেন। বঙ্গবন্ধু কবেল এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আসনা আপনি বঙ্গ হত্যা সিনাকপুরবাসীর এই আবেদনকে যে কোন কিত্তে পিনিনমে প্রচল বিজ্ঞাতে কপ দিলে বিজ্ঞবন খালাসের পরামর্শ ও নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জাননেই শেখ হাসিনা কবেল সিনাকপুরবাসীর এই বিজ্ঞভাতে নির্দলীয় খোলাসে (আবরণে) কবেল খালাস কিত্তা বঙ্গবন্ধুর বিজ্ঞ এই খালাসকে আদা বঙ্গবন্ধু, আদা চালা কবেল খালাসখান সৃষ্টি করে খালাস বঙ্গবন্ধুর পতন ফাইতে হবে। এখন আর ঢাকার দিকে কবেল থাকলে চলতে না। এখন সিনাকপুর থেকেই কবেল কবেল হবে এবং ঢাকায় এসে শেখ কবেল হবে। প্রতিদিন প্রতি দুই পুনিশের সাথে সংঘর্ষ করতে হবে। লাইমের পর লাইম ফাইতে হবে। পুনিশের লাইম ফাইতে হবে। যত ঢাকা পদলা লাইম নিয়ে ঘান। শুধু এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে হবে। ঐ পুনিশের মাঝেই লোক আছে, যাদের ঢাকা পদলা দিলে গুলি করে মানুষ মোর লাইমের লুপ লাগিয়ে দিলে। পুনিশের সাথেও কিত্তা করবেন, ঢাকা পদলা দিবেন। মনে রাখবেন যদি এভাবে সফল করতে

পারেন তাহলেই কেবলমাত্র কবজার খুঁ দেখতে পারবেন। নইলে জীকেন আর  
আগামী সীমাকে কবজা নিয়ে পারবেন না। যাতে দেখে গুলি এসব মালা-  
হাফা, মুটিতগা, খুন খাড়াবী হুজিরে নিতে পারেন, তবেই একমাত্র যদি  
কবজার খুঁ দেখেন। ইয়ানমিন নইরা এসব ঘটানোর একটা সুযোগ করে  
দিয়ে, এখন এটাতে কাজে লাগান। মনে রাখবেন এসব অবশ্যই হতে হবে  
নির্বীণীয় কামারের। আগামী সীম নাটমের বিকুদিলগও যেন না আসে। কাজ নিয়ে  
কেউ মাঝে যাবেন না। সপ করবেন পিছন থেকে। পারতাক্ষকে কোন ব্যাপারেই  
খুঁ খুঁপাবেন না। যদি খুঁ খুঁপাতেই হয় তাহলে সুনিয়ম যত ভাল ভাল কথা আছে  
তাই বলবেন। কাজে যদি ছোক, মুখে রাখবেন শুধু অন্য কথা। আর সজিই যদি  
একটা লম্বাকার ছাঁটতে নিতে পারেন, তাহলে অধিক দিনাজপুরে আসা। কিন্তু  
ওখানে আপনাদের সাথে আমার বেনম কথা হবে না। আমি শুধু বক্তৃতায় যোগ  
দানবো বৈধ বসন, শান্ত শাকুন ইত্যাদি আতীয়া তথা। কিন্তু আমারা  
আপনাদের কাজ সুযোগটি জানিয়ে থাকেন। এখন এত লাগ টাকা নিয়ে যান।  
পরিস্থিতি বুঝে থাকি যা লাগবে ওখানই পৌছে দিও। আমি শুধু যত্ন চাই।  
টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদের পার্জিত্যবির বালস্তা আছে নইলে আমি  
টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য পার্জিত্য বার্ষ্য করে দেই।

এ্যাডভোকেট আখুর বহিমলর অন্যান্য নেতারা বহুবলু কন্যা কাজ থেকে  
সিনায় নিয়ে বহুবলু কন্যা ত্যাগ করে চলে গেল আর কন্যা আটটা। প্রতিবেক  
সিনাজপুরে অপরাধী পুলিশ ইয়ানমীন হত্যাকার দলারপা নেতারা চেষ্টা করলে  
সিনাজপুরের জনতা আরো বিকৃত হয়ে ওঠে। বহুবলু কন্যা থেকে বহুবলু কন্যা  
শেখ হাসিনার কাজ থেকে সিনায় নিয়ে চলে যাওয়ার ঠিক দুই মিনি পরে,  
এ্যাডভোকেট আখুর হাইয় দানমতি ৫ নাথারে (৫ নাথার দানমতির দানায়)  
ফোন করে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে না পেয়ে, এই বলে মায়েসে না সহ্যাদ ফোন  
যে, নেত্রীকে কল করেন এমন পরিস্থিতি পুলিশের কোন কাশ পারওয়ান সংবাদ পাওয়া  
যায় নাই। তবে এখন পর্যন্ত পুলিশের ওলিতে নিহত শাক (৭) জন সিনাজপুর-  
কারীরা লাশ পাওয়া গেছে। বহুবলু কন্যা শেখ হাসিনা দাসার ছিন্ননে তারেক এই  
মায়েসে বা সংবাদ দেওয়া হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার নিয়োগের দাবিদে  
নিয়োজিত স্পেশাল ট্রাঙ্কের পুলিশদের আত্ম আর কোন কাজ নেই বলে বিদায়  
করে দিয়ে, দানমতি ৮ নাথার থেকে তার কাজেরটা চালা শেখ হাজির বহমান  
চৌকন-এর দানায় নিয়ে সিনাজপুরে এ্যাডভোকেট আখুর বহিমলের সঙ্গে কথা  
বলেন। বহুবলু কন্যা বলেন, ঠিক আছে চলিতো যান। আরো জোরে চলিতে  
যান। টাকা পরমা যা দরকার আপনি পেয়ে যাবেন। আর একটু জোরবান্ড করুন।  
আমি আসছি।

অতপর বহুবলু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সিনাজপুর গেলেন। জনতার  
শান্ত থাকার ও বৈধ খরচ বহুবলু নিয়ে আমার চাকার ফিরে এসেন। এবং ফিরে  
এসে বসলেন, না, যত দূর ভাত মিঠা হয়নি। অর্থাৎ যত টাকা বহুবলু কন্যা হয়েছে  
তত হল আসেনি।

# খাতা কলম গোলা ব্যঞ্জন ও দিগন্ধ

১২ ডিসেম্বর ১৯৯৪ সাল। বহুবঙ্ক কন্যা জনসেবী বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মতিঝিল শাখা চক্রে ছাত্রদের মহা সমাবেশের আয়োজন করেছে। মাত্র কয়েক দিন আগে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই মতিঝিল শাখা চক্রেই ত্রি, এন, পিও ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী স্বাক্ষরকে দিয়ে ছাত্রদের মহা সমাবেশ করেছেন। ছাত্রলীগের এই মহা সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বক্তৃতা করেছেন বিগেণ্ডীনলের মোকাবেলা করার জন্য স্বাক্ষরই যথেষ্ট। ছাত্রলীগের এই মহা সমাবেশের পাশ্চাত্য মহা সমাবেশ হিসেবেই বহুবঙ্ক কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আজকে এই ছাত্রলীগের মহা সমাবেশের আয়োজন করেছেন। এবং বেগম খালেদা জিয়ার এই বক্তৃতার পাশ্চাত্য জবাব হিসেবে শেখ হাসিনা আজ বক্তৃতা করেন। বহুবঙ্ক কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বিকাল ৫টা ১৫ মিনিটে মঞ্চে উঠলেন। আজকের এই ছাত্রলীগের মহা সমাবেশের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ এবং উল্লেখযোগ্য দিক হলো কেবল মাত্র ছাত্রলীগের নেতৃত্ব এবং একমাত্র বহুবঙ্ক কন্যা শেখ হাসিনা ছাত্রা অন্য কোন আওয়ামী লীগ নেতাকে মঞ্চে উঠতে দেওয়া হলো না। মঞ্চে নিয়ে উক্ত দিকে আওয়ামী লীগ নেতাদের বঙ্গার ব্যবস্থা হলো। বহুবঙ্ক কন্যা শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের নেতাদের দ্বারা পরিবেশিত হয়ে মঞ্চে বসলেন। আওয়ামী লীগের নেতারা মঞ্চেও নিউ যেতে মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে নিউ চলে গেলেন। বহুবঙ্ক কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আর বক্তৃতা ছাত্রদের লেখা পড়ায় বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার উদ্যোগ আহবান জানালেন এবং মঞ্চে উপস্থিত ছাত্রলীগের নেতাদের হাতে-খাতা কলম তুলে দিলেন। খাতা-কলম তুলে নেওয়ার মুহুর্তে কয়েক সাংবাদিকের ক্যামেরা বার বার মঞ্চে উঠলো, আরপরকাল দিন শেষের প্রায় সবগুলো জাতীয় দৈনিক পত্রিকার খাতা-কলম তুলে দেওয়ার ছবি ছাপা হল এবং কলমের লেখা পড়ায় মনোযোগ দেওয়ার শেখ হাসিনার আহবানকে পত্রিকার ইচ্ছায় কন্যা হল। কিন্তু তার আগে ১২ ডিসেম্বর রক্তবায় ১৯৯৪ বিকাল ৩টায় গানমতি ৩২ নাম্বারে বহুবঙ্ক কন্যার লাইব্রেরী কক্ষে বহুবঙ্ক কন্যা শেখ হাসিনা ছাত্রলীগ নেতা অজয় কর, পঙ্কজ, হিদায়েতের সাথে, জ্যোতিষ্য সাদা, ত্রিবেদী সৌরিক এবং আলম সহ মোট ৯ জনকে ভেবে জনে নামনের আশেপাশে প্রয়োজন হবে বলে গোলাব্যঞ্জন ও অস্ত্রশস্ত্র কেন্দ্র কন্যা নাম এক লক্ষ টাকা নিয়ে বহুবঙ্ক কন্যা বলেন, আওয়ামী লীগে ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করার পর তোমরা ঢাকা শহরসহ সারা দেশে নতিবিশিষ্ট জনের সৃষ্টি করবে। খালেদা জিয়ার পতন না হওয়ার পর্যন্ত প্রতিদিন ৫/১০টা লাশ অবশ্যই ফেলতে হবে। নইলে খালেদা জিয়ার পতন হবে না। এই জন্য যত টাকা লাগবে তোমরা পাবে। টাকার কোন অভাব হবে না। তোমরা গোলাব্যঞ্জন ও অস্ত্রশস্ত্রের বিশাল আয়ের ফাঁদে চাই—১১

বহুদূর পড়ে ছড়াবে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই তালি রাখবে না। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ রেজ করলে এই সকল অস্ত্রশস্ত্র ও নোয়া আনাদের হস্ত ছাড়া হয়ে যাবে। এইসব জিনিষপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে নিরাপত্তা জায়গায় রাখবে।

আজ একটা দাখিলু তোমরা সিরিয়ামনি পালন করবে। সেটা হলো, এই যে স্টাটন গার্ডেন রোড এবং ইন্ডেন কলেজের পশ্চিম পার্শে যে কোয়ার্টারগুলো আছে, সেগুলোয় নব্বু সচিব-উপসচিবদের, আমি (শেখ হাসিনা) হরতাল নিলেও এই সচিব উপ-সচিবরা পায়ে হেঁটে ঠিকই সচিবালয়ে যায়। এরপর যখন আমি হরতাল দেব, তোমরা এদের শাসন করবে। বঁত পেতে থাকবে; বেজেটাদিরা (সচিবরা) হেঁটে হেঁটে সেজেটাদিয়েট যেতে থাকবে যদি মধ্যে তোমরা ওদের কাপড় চোপড় বুগে দাটো করে ফেলবে।

হামলীগ নেতারা বলল, আমাদের দুই গ্রুপ ভাগ করে দেন। এক গ্রুপ গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র দাখিলে থাকি। আর অন্য গ্রুপ সচিবদের উলঙ্গ করার দাখিলে থাকুক।

বহুবলু কন্যা শেখ হাসিনা তখন আলমকে সচিবদের নেংটা করার দাখিলু নিলেন।

এরপর অনেক হরতাল যায়। কিন্তু সচিবদের নেংটা করা হয় না। বহুবলু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার পক্ষ থেকে সচিবদের কাপড় বুগে উলঙ্গ করার দাখিলু প্রাপ্ত আলমকে বারবার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও যখন সচিবরা উলঙ্গ হচ্ছে না, তখন তিনি (শেখ হাসিনা) ঢাকাওভাবে যাকে কাছে পান তাকেই সচিবদের নেংটা করার দাখিলু দিতে থাকেন। কিন্তু তারপরও সচিবরা উলঙ্গ হচ্ছে না দেখে বহুবলু কন্যা শেখ হাসিনা অস্বাভাবিক রোগে পেলেন। এবং সচিবদের উলঙ্গ করার ফুল দাখিলুপ্রাপ্ত আলমকে নগদ বিশ হাজার টাকা দিয়ে বললেন, এই বিশ হাজার টাকা এখন দিলাম। ব্যক্তি আরো ত্রিশ হাজার টাকা সচিবদের নেংটা করার পর নিব। এবং পরের হরতালেই নেংটা করতে হলে। নইলে পুরা টাকা কেবল দিতে হবে।

ঠিকই পনের হরতালেই আলম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও মোস্তফা চক্করের সামনে একজনকে উলঙ্গ করে ফেলল, খানসন্তি ৫ নাথার রোডের ১৪ নাথার বাড়িতে বহুবলু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে এই উলঙ্গ করার সফলতার সংবাদ পৌঁছলে তিনি শুনিয়ে মিষ্টি বাগ্যানোব জন্য আলমকে ভেঁকে আনতে লোক পাঠান। কিন্তু আলম ততক্ষণে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। তার পরের দিন দেশের সকল সংবাদপত্রে নিগব্বর শিরোনামে ছবিসহ খবর ছাপা হল। জানা যায়, এই উলঙ্গ বা নিগব্বরের শিকার হওয়া ব্যক্তি একজন সচিব (সেজেটাদি) নন। তিনি বাংলাদেশের একজন অতি সাধারণ কাগরিক। গোবেচারা পাবলিক।



## সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমের কর্মজীবনসংক্রান্ত

কোন আন্দোলন, কোন সংগ্রামেই কাজ হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া একতরফাভাবে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী নতুন পার্লামেন্টের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন এবং ২৪ মার্চের মধ্যে সংবিধান অনুযায়ী সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন।

সপ্তম পার্লামেন্ট নির্বাচন, বি. এন. দির পুনরায় সরকার গঠন, এবং খালেদা জিয়ার পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হওয়া কিছুতেই যখন ঠেকানো যাচ্ছে না তখন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই জানুয়ারী ১৯৯৬ সালের শেষ রেহানার মনমের প্রকাশনের ব্যক্তিত্ব কর্নেল ডারেক সিঙ্কী (শেখ রেহানার ভ্রাতৃ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্মজীবন এসেই সর্বপ্রথম ডারেক সিঙ্কীকে কর্নেল থেকে ব্রিগেডিয়ার পদোন্নতি দেন এবং তার নিজস্ব সামরিক ষ্টাফ নিয়োগ করেন।) এর সাথে গোপনে আলোচনা করেন। এবং ডারেক সিঙ্কীর মাধ্যমে সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সাঈদ মোহাম্মদ নাসিম বীর বিক্রমকে রাষ্ট্রীয় কর্মজীবন করার প্রস্তাব দেন। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সেনা বাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে সামরিক অভ্যুত্থান করে বেগম খালেদা জিয়া সরকারকে উৎখাত করে রাষ্ট্রীয় কর্মজীবন করার প্রস্তাব দেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার নিজস্ব তরফ থেকে এবং তার মন আত্মায়ী শীপের তরফ থেকে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে কু করার মাধ্যমে সার্বিক নিরুপস্থিত সমর্থন ও সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করার পূর্ব আশ্বাস দেন। ১৯৮২ সালে বি. এন. দি সরকার উৎখাত করার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা জবনকার সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদকে দেইভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছিলেন, ঠিক একইভাবে ১৯৯৬-এর দ্বা জানুয়ারীতে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিম বীর বিক্রমকে কর্মজীবন করার জন্য সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থনের আশ্বাস দিলেন। কিন্তু এবার সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সাঈদ মোহাম্মদ নাসিম বীর বিক্রম বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার প্রস্তাবে সাহা না দিয়ে উৎখাত বলে পাঠালেন, আমি পেশাদার সৈনিক। পেশাদার সৈনিককে পেশাদার সৈনিকই থাকা উচিত। এবং শেষে বর্তমানে যা চলছে তা রাজনৈতিক সংকট। রাজনীতিবিদদেরই এই রাজনৈতিক সংকট রাজনৈতিকভাবে মোড়াবেলা ও নিরসন করতে হবে। সেনাবাহিনী এই সংকটে জড়িত হয়ে নতুন সংকট সৃষ্টি করবে না।

এরপরে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রচলিত হতাশ হয়ে এই সেনা আর থাকা যাচ্ছে না বলে জব্বা করেন।

# পুলিশের দাশ চাই, মিলেটারী দাশ চাই

আজ ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬। সকাল ৯টা। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা খানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৫ নম্বর-এ তাঁর নিজ কামতবন্দেব-মিলিটারী তলায় ভি.ভি.আই, পি.ডি.টিং কক্ষে ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম, সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী বান পান্না, নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান (বর্তমানে আওয়ামী লীগ এর, পি) অজয় কর, বঙ্গক, নিজ্জান সাহা, সিপাহর, অনিম, সাধন দাসসহ মোট এগারো (১১) জনকে নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই জরুরী এবং খুবই গোপন বৈঠকে বসেছেন। আসছে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এককভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এই নির্বাচন ত্যাগতাল করার জন্য সর্বশক্তি নিতে মাঠে নেমেছেন। জীবন-মরণ লড়াই। আজ দিকেন ওটাও পাহা পথে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সমাবেশ এবং এই সমাবেশ শেষে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বাসভবন অভিমুখে মিছিল হবে। এই সমাবেশ ও মিছিলের বিষয়েই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বৈঠকে বসেছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এতদুপা প্রকটী, অত্যন্ত গোপনীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও কর্মসূচী দেওয়ার জন্যই এই বৈঠকে বসেছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে জীবন ঠিকিত ও মলিন দেখাচ্ছে। তেঁও কোন কথা বলছে না। তিনিও কোন কথা বলছেন না। সবাই চুপ করে বসে আছে। মনে হচ্ছে যেন, যাকে পরাজিত রাজাহাঙ্গা স্তানী আর তার সৈনিকেরা হামে আছে। হঠাৎ কান্না বিজ্ঞপ্তিত বাসকল্ল কটে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, আজ আমার একটি জাইও বেঁচে নেই। যদি একটি জাইও বেঁচে থাকত তাহলে, আমি যে নির্দেশ দিতাম, যে কর্মসূচী লিখাম তা অবশ্যই পালন হত। তোমরা কি আমার জাই হতে পার না? আমি তো তোমাদের জাই-ই মনে করি। তোমাদের মাঝেই আমার-হারিয়ে যাওয়া জাইদের খুঁজে পেতে চাই। কিন্তু তোমরা কি আমাকে কোন মনে কর? যদি তোমরা আমাকে কোন মনে কর, আর যদি সত্যি সত্যিই তোমরা আমার হারিয়ে যাওয়া জাই হও। তাহলে এই কঠিন দিনে, কঠিন কর্মসূচী পালন করার জন্য প্রস্তুত হও।

সত্যসেই আমার সাথে শপথ নেও, বলেই উপস্থিত সকলকে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা শপথ ক্যালেন এবং উপস্থিত সকলেই শপথ নিল। শেখ হাসিনা শপথ বাক্য উচ্চারণ করলেন—“আমরা শপথ নিতেছি যে, যে কোন ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা জীবন উৎসর্গ করলাম। এবং আমরা আরো শপথ করিতেছি যে, আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনার যে কোন ধরনের নির্দেশ তা হতে কঠিনই হোক না কেন জীবন নিয়ে পালন করবো।”

শপথ স্বাক্ষর পাঠ শেষ হলে বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, আজ আমি ১৭ (১০)টা পুলিশের লাশ চাই। ৫ (পাঁচ)টা মিলিটারির লাশ চাই।

পুলিশের লাশ তাওয়া বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নতুন কিছু নয়। অতীতে বহুবার তিনি পুলিশের লাশ চেয়েছেন। কিন্তু আজকের মতো এত আনুষ্ঠানিকতা এতো নটকীয়তা করে অতীতে করেনও তিনি পুলিশের লাশ চাননি। অতীতে তিনি (শেখ হাসিনা) মাঝে মাঝেই বলতেন, পুলিশের লাশ চাই। পুলিশের লাশ চাই। কিন্তু কাউকে নির্দিষ্ট করে বলতেন না। খুব কড়া করেও বলতেন না। ইষ্টাৎ কিছুকিছু করে কথাগুলো বলতে থাকতেন। বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কিছুকিছু করে পুলিশের লাশ চাই, পুলিশের লাশ চাই বলতে থাকলেও কেউ তা গনত না তা নয়। উপস্থিত সকলেই তা গনত। কিন্তু কেউই তা গুরুত্ব দিত না এবং বাধন করত না। বহুবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা 'পুলিশের লাশ চাই পুলিশের লাশ চাই' কথাগুলো হাওয়ায় উপর ছেড়ে দিতেন। আর উপস্থিত সকলেই তার (শেখ হাসিনার) ন্যায় হাওয়াতেই কথাগুলো মিথিয়ে যেতে দিত। কিন্তু বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মনে থেকেই এমন কিছু ঘটানোর জন্যই কথাগুলো বলতেন। অর্থাৎ কেউই শেখ হাসিনার কথা পালন করত না। পুলিশের লাশ ফেলত না। আর সেই জন্যই আজ ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ এত আনুষ্ঠানিকতা আর এত সার্বভৌম পরিবেশে শপথের মাধ্যমে বহুবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ১০টা পুলিশের আর ৫টা মিলিটারির (সেনাবাহিনীর) লাশ চাইলেন। একটা ব্রিককেইস হায়েট রুমে প্রবেশ করলো শেখ হাসিনার কক্ষাভ্যে ছাই (আপুই বন সেরনিয়াবাতের ছোঁল) আবুল হাশনাত আব্দুল্লাহ (বর্তমানে জাতীয় সংসদ সদস্য সফারী দলের টীপ হুইপ)। বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ব্রিককেইস খুলে ৫০০ (পাঁচশত) টাকার নগদ ১০টা স্মাটিক্স হানে ৫ লক্ষ টাকা ঢেলে দিয়ে বললেন, এই নাও, যাও কর্মসূচী বাস্তবায়িত কর।

বহুবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ধানমন্ডি ৫ মাথাঘের বাসা থেকে রওয়ানা হয়ে বিকেল ৩-৩০মিনিটে পাড়শেখের সমাবেশের মঞ্চে উঠলেন। সমাবেশে হাজার ডিনেক লোক জমায়েত হয়েছে। তিন চার জন নেতার বক্তৃতা শেষে বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বক্তৃতা দিতে উঠলেন। বক্তৃতার শুরুতেই তিনি বললেন, আমরা প্রধানমন্ত্রী বলেনা জিয়ার বাসকরনে মিছিল নিয়ে যাব। আপনরা সকলেই মিছিলে অংশ নিবেন।

বহুবন্ধু কন্যা যেই একথা বললেন আর অমনিই চতুর্দিক থেকে বোমা পটকা, গুলি শুরু হল। মুহূর্তের মধ্যে লবনেক জনতা নিকরবিনিক জগানধনা হয়ে কে কোথায় গেল তার হদিস পাওয়া গেল না। সমাবেশ স্থল ফাঁকা শূন্য হয়ে গেল। মঞ্চের নেতারা পরি কি মরি করে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নড়ে পালাতে

লাগল। বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে অতি করে দক্ষ থেকে নামিয়ে খানমতি ও২ নাথার বহুবন্ধু ভবনে নিয়ে যাওয়া হল। পালানোর অভিযোগিতার নেতারা কেউ কারো চেয়ে কম পেলেন না। এমন কি বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার মস্তক সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেবী হুঙ্কা এই অবস্থায় পিছনে পরে যাওয়া এক নেতা (বর্তমানে হুঁদী) জ্বরে (শেখ হাসিনাকে) ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিয়ে পাণ্ডিরে হয়।

সম্মদেশ ও প্রধানমন্ত্রী কালেনা জিয়ার আসতখন অতিমুখে যিছিল কর্মসূচী কার্য হয়। পরে গোমোযোগের কারণে পুলিশ সোনারগাঁ রোড, পাটপাশ, গ্রীনরোড ইত্যাদি রোডে যানবাহন চলার বন্ধ করে দিলে, কল্যাণগান রোডে যানজটে আটকে পড়া বি, আর, সি, সিএন হুইটি নেতারা হান, তিনটি ট্রাক, তিনটি পিকাপ গাড়ি, পাঁচটি প্রাইভেট কার, চারটি বেবী ট্যাক্সি (হুঁদীর) ইত্যাদিতে এবং খানমতি প্রতিশের সামনে শুজাবাদ পেট্রোল পাম্পে বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাও নির্দেশে বহুবন্ধু ভবনের ইচ্ছ (ফর্মটারী) নিয়ে আসন লাগিয়ে প্রতিশোধ হিসেবে জ্বলিয়ে দেওয়া হল। বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা খানমতি প্রতিশের নামনে নিজ হাতে একটি ছুটারে (বেবী ট্যাক্সি) আসন লাগিয়ে দিলেন।

## বেঙ্গমাদা আসতেছে

বেঙ্গম খালদা জিয়ার দশ বি, এন, সি ১৫ই ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনের দিন ছোট ভেঙ্গে ছোটের উপস্থিত করতে না পারার একদিন পর্যন্ত বি, এন, সিএ পাশে থাকা রাজনৈতিক মহল, প্রশাসন ও অন্যান্যরা এমন প্রকাশ্যেই বি, এন, সিএ বিরোধীতা শুরু করে।

১৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার ১৯৯৬। দুপুর প্রায় ৩টা। খানমতি ও নাথার রোডের বহুবন্ধু শেখ হাসিনার ৫৩ নাথারের বাড়ির উপরের তলায় ৮৬৮৭৭৯ টেলিফোনটি বেজে উঠে। ফোনটি তিসিক করে ছালা দলতেই, ফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এসে ছালা, আমি হানিক, হানিক!

কোন হানিক?

আমি নগরের নতুনপতি হানিক, ঢাকার মেয়র।

আসসালামু আলাইকুম হানিক ভাই, আপনি?

হ্যাঁ আমি।

আপনি কে?

আমি .....



ও ভাগে আছে ভাই? বি. চান। আমি একটু কেঁচোর সাথে কথা বলতে চাইছিলাম। অনেকদিন অসুস্থ ছিলাম। কথাবার্তা বলতে পারি নাই, ভাই এখন একটু বলতে চাই। নেত্রীকে একটু দেওয়া যায়?

হী. ধরেন, দেবজি নেত্রী কোথায়!

বঙ্গবন্ধু কন্যা ভাত খেতে বসিয়ে হাত ধুছিলেন। বলা হল আপা মেডিকেল সেন্টারে।

নেত্রী হাত মুছতে মুছতে কোনের দিকে হেঁটে আসতে আসতে বললেন, মহিউদ্দিন ভাই তো (চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র)?

না, ঢাকার মেয়র।

অনেক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বমকে গিলে আপন মনেই বলে উঠলেন, বেইমানটা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। দাঁড়ীও ভাব কিছু একটা কারলেন। মনে হয় কোন বঙ্গবন্ধু কি ধরবেন না ডিক্টা করলেন। তারপর দীর্ঘ পায়ে এগিয়ে এলেন। কোনটা ধরলেন, হ্যাঁচো। না না এখানে না, এখানে না। বহির্দেশে আসেন (বহির্দেশে আসে খানমজি বহির্দেশে আসতে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে) পবিত্র জায়গায় আসেন। পবিত্র জায়গায় বসেই আশোচন্য করি।

হ্যাঁ এফুসি আসেন, হ্যাঁ, আপনি না আপা পর্যন্ত আমি আছি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা টেলিফোনটি রেখে নিয়ে বললেন, চক চক করিয়ে দাও। বেইমানটা আসতেছে। চল করিয়ে দাও।

নব্বই মিলে খানমজি বহির্দেশে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে সাওয়া হল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু কন্যার গেটের বাইরে সড়ক পারদর্শী করতে লাগলেন আর ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফের অগেজা করতে লাগলেন। মিনিট বিশেক পরেই রাংগানেশের জাতীয় পতাকা লাগানো জীপ গাড়িতে করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হানিফ বহির্দেশে বঙ্গবন্ধু কন্যার নামে এসে পৌঁছল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এগিয়ে গিয়ে নিজ হাতে মেয়র হানিফের জীপের দরজা খুললেন, আর বলতে লাগলেন, এই যে অধ্যক্ষী সিনেট এল, জি, আর, ডি মিনিটার। এল, জি, আর, ডি মিনিট্রি জাড়া ডি ঢাকার মেয়র চলতে পাঠ? এল, জি, আর, ডি মিনিট্রি তো আপনায়। আপনিই তো এল, জি, আর, ডি মিনিটার। এই কথা বলতে বলতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মেয়র হানিফকে জীপ গাড়ি থেকে নামিয়ে এনে, উপস্থিত সকলের সাথে মেয়র হানিফকে দেখিয়ে এই যে অধ্যক্ষী সিনেট এল, জি, আর, ডি মিনিটার বলে পছন্দে করিয়ে দিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাও যুগে এই কথা বলে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ খুশিতে ভঙ্গম ভঙ্গম হয়ে বলল, নেত্রী যা বলেন, নেত্রী যা বলেন।

# নায়ক, মন্ত্রী ও জনতার মঞ্চ

তাঁরপর মেঘর হাসিনাকে বসবস্তু ভরনের অফিস করছে এনে বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনার বসলেন, এই মিটি আসনা, মিটি আসনা, হাসিনা আইকে মিটি শুভ্রাও।

মিটি খেতে খেতে বসবস্তু কন্যা বসলেন, বসবস্তু ছিলেন সহনায়ক, আর আপনি হলেন নায়ক। নায়ক না হলে কি চলে? সাদা দেশ, সাদা জাতি এখন অকিয়ে অসহ নায়কের দিকে। নারেন আপনার দিকে। বসবস্তুসি সাক্ষিয়ে আক আপনাত দিকে। আমি এই পর্যন্ত এনে নিয়েছি, এখন আপনি ফিনিশিং দেন। এখন আপনার পরা। আপনি নায়ক, আপনার হাতেই সব। আমার হাতে আর কিছু নেই। আমার যা ছিল সব আমি করেছি। আপনি মেঘর আপনিই নায়ক, এখন আপনি ফিনিশিং গোল করেন। আপনি ছাড়া ফিনিশিং হবে না। আপনার হাতেই ফিনিশিং হবে কলেই খেলা এখনও ব্যক্তি আছে।

আপনারাই তো বসবস্তুকে শেখ মুজিব থেকে বসবস্তু বানিয়েছেন। আপনারা যদি বলেন আমার পিতাকে আশ্রয় না দিতেন, নাহায়া সহযোগিতা না করতেন তাহলে কি আমার পিতা শেখ মুজিব থেকে জাতির পিতা হতে পারতেন? এই আপনারা ঢাকার হানুসেরা বানিয়েছেন। আজ আমি তার মেয়ে, আমাকে যদি আপনি বাহায়া না করেন আমি কি করে বড় হবো? আমার ভাইয়েরা কেউ বেঁচে নেই। আপনিই আমার ভাই। আমি আপনার বোন। আমাকে আপনি সহযোগিতা করেন। আমি কখনোই আপনার কথা কুলার না। আপনারকে ছাড়ার চেষ্টা না।

ঢাকার মেঘর হোয়াংদন হাসিনা বলল, ইয়া নেই, আমাকে এক ঘান সময় দেন, আমি খালেস জিয়াকে ফেলে দিব।

বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, না, না, একমাত্র সময় দেওয়া যাবে না। আপনি পনের দিনের মধ্যেই ফেলে দেন।

এই বৈঠকেই ঠিক হল প্রেসক্লাবের সামনে স্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে এখন থেকেই বক্তৃতা বেগম খালেস জিয়ার পতন না হয়, দিন রাত ২৪ ঘণ্টা স্থায়ী হবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার। পরবর্তী সময়ে নটিশিল্পী ও টিভির বন্দর পাঠিক রাংমন্ত্র মজুমদার ও নটিশিল্পী পিথু বন্দোপাধ্যায় এই মঞ্চের নাম দেন জনতার মঞ্চ।

প্রেসক্লাবের সামনের এবং নটিশালয়ের উত্তরের ভেতরানো রোডের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত অর্ধাৎ পল্টনের মোড় থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত সড়কা সম্পূর্ণ বন্ধ করে সড়কা বাসস্থানে বিশাল মঞ্চ তৈরী করে প্রতিদিন চলতে থাকলো গান নাকলনা, বক্তৃতা, আবৃত্তি ইত্যাদি। এক পর্যায়ে এই মঞ্চ এনে যোগ দিল নটিশালয়ের কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী। এই সবই চলতে লাগল ঢাকার মেঘর বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনার ভাষায় নায়ক ও আগামী দিনের এল, জি, আর, ডি মন্ত্রী হোয়াংদন হাসিনের নেতৃত্বে।

এদিকে আত্মজাতিক নাতা দেশসমূহের চাপে বিশেষ করে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের চাপে বেগম খালেদা জিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন দেওয়ার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন করার জন্য ১৫ই ফেব্রুয়ারীর প্রতিবন্ধিতাধীন নির্বাচনে সংবিধান সংসদজুড়ে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে একদিনেই জন্য সপ্তম জাতীয় সংসদ অধিবেশন ডাকলেন। পঁচিশে (২৫) মার্চ '৯৬ সকাল দশটায় একদিনের জন্য বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সংবিধান সংসদজুড়ে সপ্তম জাতীয় সংসদ অধিবেশন বসল। এই সপ্তম জাতীয় সংসদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন দেওয়ার জন্য সংবিধান সংশোধন করার জন্য বসেছে। নব্বয় দশটায় বেগম খালেদা জিয়া সংসদ অধিবেশনে যোগলেন। গভীর রাতে শেষ স্বপ্নে গেলো পর্যন্ত বেগম খালেদা জিয়া সংসদ অধিবেশনেই ছিলেন।

তারপর দিন ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস। সকাল পৌনে সাতটায় খানমতি ও নাহার থেকে বসবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সাজার জাতীয় দৃষ্টিনৌথে পুষ্পস্তবক অর্পণের জন্য প্রচু্যত হইলেন। বসবন্ধু তম্মা শেখ হাসিনা (বৈতনিকৃত ব্যাংক বহনকারী রাম মোহন দাস-এর নামে রেজিস্ট্রি করা) তার শাল রঙেরে মিশান পেরোন জীপে করে জাতীয় দৃষ্টিনৌথে যাওয়ার সময় পুশিক্ত লোকুল হতে করতে গেলেন, গোলাপি (খালেদা জিয়া) এখনও সংসদে বসে রয়েছে। গোট (খালেদা জিয়া) সংসদে এখন আরও কম কি যে তুই এখনো সংসদে বসে রইলি?

সফর গঙ্গী একজন কন্যা, রূপ দেবারে বসে রয়েছে।

বসবন্ধু কন্যা বললেন, গতকাল সকাল থেকে সারা দিন সারা রাতে সংসদে বসে রূপ দেবিয়ে ও কি গোলাপির (খালেদা জিয়া) পরান জুড়ে নাই যে, আজ সকাল পর্যন্তও রূপ দেবারে গোলাপি সংসদে বসে রয়েছে। সংসদে গোলাপির এককথ কি কাম? সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের সংশোধনী আনতে আরো ২৪ ঘণ্টা সময় চাপে নাকি যে গোলাপি এখনো সংসদে বসে রয়েছে?

জাতীয় দৃষ্টিনৌথে গিয়ে বসবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, আরে গোলাপি (প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া) যে এখনও আসে নাই, আজ আমিই প্রথম মালা দেব। দৃষ্টিনৌথে পুষ্পস্তবক দেওয়ার পর ঢাকার দিকে যা এসে বসবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নাভার থেকে কমিউনিকার গাড়ীপুকের রাজ্য ধরে যেতে থাকলেন। গগন বাড়ীর কাছাকাছি চেয়ে বিরাট বড় এলাকা জুড়ে কাঁটাতারের বেড়া নিয়ে যেহা একটা জাগুয়ার ঢুকলেন বসবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। বেশ কিছু গাছের মাঝে ছোট একটি বাংলো টাইপের ঘর। এই ঘরেই বসবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বসলেন এবং বললেন, এই গাড়ী থেকে বিরাট নামাও, আজ পিকনিক। আজ নব্বয় এখানেই কাটান। আজ পিকনিক।

পুরাতন ঢাকার সাতী আলীউদ্দিন হোসেনের স্মরণীয় বিদ্যালয়ের সেকেন্দ্রে বিদ্যালয় সর্ভার দাতা রাষ্ট্রই দেওয়া ছিল। সাতা থেকে যুক্তিসৌন্দর্যে চতুর্থান্দা ইওয়াক অগ্রে মাইজেনখালে করে বিদ্যালয়, প্রেট, গ্রাম ইত্যাদি নিয়ে আসা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে মাইজেনখাল থেকে তা নামানো হল। খাওয়া হল। প্রচল হাসাহাসি হল। খোলাপি (খালেদা জিয়া) এখনো পার্লামেন্টে বসে রয়েছে। সাতাদিন-সাতাহাত খোলাপি পার্লামেন্টে বসে বসে তপ দেনিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

## শেখ হাসিনা জেনারেল নাসিমের মুখোমুখি বৈঠক

বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে, সত্তম সংসদ একদিনের অধিবেশনে মিলিত হয়ে, সশস্ত্র সশস্ত্র করে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত করে; সত্তম সংসদ বিলুপ্ত বা বাতিল ঘোষণা করল। এবং আগামী ১২ই জুন ১৯৯৬ ইংরেজিতে সত্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এর তারিখ ঘোষণা করল। এবং সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে প্রধান করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হল।

সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান (এরশাদ আমলের) অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল নূরুদ্দিন খান (বর্তমানে শেখ হাসিনার মন্ত্রী) এবং অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল নাসিম (বর্তমানে আগওয়ামী লীগ এম পি ও রেল জিনিসের চেয়ারম্যান) এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু নাসিম মোহাম্মদ নাসিম বীর বিক্রম- এর সাথে আলোচনার প্রস্তাব পঠান। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ঐ প্রস্তাবের পটপ্রেক্ষিতে নাট্যশিল্পী লুৎফুর নাহার লতা (বর্তমানে আমেরিকা নিবাসী) ও তার স্বামী আব্দুলপ্রাপ্ত মেজর নাসির সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিমের সাথে শেখ হাসিনার বৈঠকের আয়োজন করে। নাট্যশিল্পী লতা ও তার স্বামী মেজর (অবঃ) নাসির ববানীর কুলশুম জিলা, ১১৭ কানী রুক-ই রোড ৪-এর হাফাযেরা সিরামিকের ও তত্ত্বা ববনের ওয়া তত্ত্বাবধায়ক শেখ হাসিনা এবং সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমের মুখোমুখি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আগামী ১২ই জুনের নির্বাচনে সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিম এবং তার সৈনিকদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। জবাবে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিম শেখ হাসিনাকে সার্বিক সাহায্য সহযোগীতার পূর্ণ আশ্বাস দিয়ে বলেন, আপনি (শেখ হাসিনা) চাইলে এখন থেকে সেনাবাহিনী আপনার নির্দেশেই চলবে।

এর জবাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, এটা যদি সত্যি হয় তবে ভবিষ্যতে আমিও আপনার নির্দেশেই চলব।



এই নৈটকে পর থেকে সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মানু সাহেব মোহাম্মদ নাসিম বীর বিক্রম বহুবলু কন্যা শেখ হাসিনার পরামর্শ ও নির্দেশেই সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে থাকেন।

## হিন্দুরা নৌকায় ভোট দেয়

১৯৯৬-এই ১২ই জুনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রার্থী মনোনয়ন দিল। আওয়ামী লীগও মনোনয়ন দিল। গোপালগঞ্জের তিনটি আসন এবং বাগের হাটের দুইটি আসনের মোট ছোটটির কয়েকটি শতাংশ ভোটার হিন্দু সম্প্রদায় ইওয়ান স্বাভাবিক কারণেই এই পাঁচটি আসনে আওয়ামী লীগ এর নৌকামার্কী প্রার্থী ছাড়া অন্য কোন দলের অন্য কোন প্রার্থীর প্রার্থীর নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। এবং কোনভাবেই বিজয়ী হয়নি এবং হবেও না। (১) বোকসেনপুর ও কানিয়ানী, (২) গোপালগঞ্জ ও কানিয়ানী (৩) টুঙ্গিগাড়া ও কোটালিগাড়া (৪) মোছার হাট ও ফকিরের হাট (৫) বইঠাঘাতি ও দাকোপ এই ৫টি (পাঁচ) আসনে যত দিন পর্যন্ত পর্যন্ত শতাংশ হিন্দু সম্প্রদায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ প্রার্থী নৌকা মার্কীর একচেটিয়া ভাবে বিজয়ী হতে থাকবে। এই পাঁচটি আসনের প্রার্থীদের জলাকরা কোন কাজ করতে হয় না। যে কোন প্রকারেই হোক বহুবলু কন্যা শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের নৌকা মার্কী টিকিট নিয়েই সে যে ভোটই হোক ৭৫% ভোটে বিজয়ী হবে। এই ৫ টি আসনকে বলা হয় ভিকার আসন। বহুবলু কন্যা শেখ হাসিনা বয়া করে থাকে এই অঞ্চলের আসন টিকা দিবেন, তিনিই এই অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি বা প্রার্থীর সংসদ সদস্য। অর্থাৎ এম, পি। এই অঞ্চলের লোকগাড়া গ্রাম অঞ্চল একজন লম্বা বৃদ্ধ হিন্দু লোককে কোন আওয়ামী লীগকে ভোট দেন জানতে চাইলে, ই প্রবীণ বৃদ্ধ হিন্দু লোকটি বলেন, আমরা আওয়ামী লীগ টিগ বুঝি না। আওয়ামী লীগকে ভোটও দেই না। আমরা ভোট দেই নৌকার। অর্থাৎ নৌকা মার্কীর ভোট দেই।

নৌকা মার্কায় কেন ভোট দেন জানতে চাইলে, তিনি বলেন যারে, নৌকার ভোট দিব না? নৌকা যে দেবীর বাহন। মা দুর্গা দেবী এই বাহনে (নৌকা) চড়েই সর্ষ থেকে স্বর্গায় এসেছিলেন, অমৃত (পানিষ্ট) কে চুম্বন করার জন্য। আর আমরা যদি মা দুর্গায় বাহন নৌকার ভোট না দেই, তাহলে দেবীর বাহনের অসম্মান হবে। মা দুর্গা অভিসম্পাত দিবে। এই জন্য দেবেন না, ভোটের সময় আমরা সবলেই গিয়া, মা দুর্গা দেবীকে খুশি করার জন্য মা দুর্গা, মা দুর্গা বলে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আসি। একজনও বাদ থাকে না। সবলে গিয়া নৌকা মার্কায় ভোট না দিলে মা দুর্গা অসন্তুষ্ট হবেন। আমাদের অঞ্চল হবে। তাই যত কাজ কাম থাকুক, যত অামেলাই থাকুক, কোন বঞ্চম ওষু ভোট কেন্দ্রে যেতে পারলেই হলো। আমরা সবলেই গিয়া নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আসবো।

## রাজাকারের কাছে আসন বিক্রি

এই অঞ্চলের ৫টি আদনের ৩টি আদনে রাজাকারের দপ্তর কন্যা শেখ হাসিনা বসে। আর ১টি আদনে শেখ হাসিনার কুমারত্যা এই শেখ সেলিম। এবং মোকশেমপুর + কাশিয়ানীর অপর আদনটিতে বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনা বহুবার কথা নিয়েছেন। নিজের কেউই যেতে পারে কথা নিয়েছেন।

মতিয়ুর রহমান রেজুকে নানা মনোহর কাজ নিয়েছে, আর তখন শেষে প্রতিবারই বলেছেন, তোমাকেই আমি (শেখ হাসিনা) মোকশেমপুর কাশিয়ানীর এম. পি. বাসাব। মতিয়ুর রহমান রেজুও দ্বী. মনোহরকেও বহুবার বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনা বলেছেন, তোমরা আমাদের জন্য যা করলে এবং যা করছে, তার স্থান আমি কোনদিন শোধ করতে পারবো না। তোমাদের কথা কোন দিন ভুলে যাবে না। তবে রেজুকে (মতিয়ুর রহমান রেজু) আমি মোকশেমপুর কাশিয়ানীর এম. পি. বাসাব।

কিন্তু না, বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনা কথা রাখেন না। ওয়াদা রাখেন না। কথা নিয়েও তিনি (বসবস্তু কন্যা) কথা বন্ধ করতেন না। ওয়াদা করে ওয়াদার বরখাস্ত করতেন। ওয়াদা ভুল করতেন। যদিও বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনা বসবস্তু কন্যা ওয়াদার কোন জিয়ার উদ্দেশ্যে বলেছেন, ওয়াদা ভুল করেই অন্যত্র পড়েন করে না। তবু মতিয়ুর রহমান রেজু কেন? বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনা মনোহর দিলেন না, সাবেক ছাত্র নেতা, ত্যাগী এবং স্ক. নেতা ইসমত কাসির গামা, আবুল হাসান, মুহুল বোস এদের কাউকেই তিনি মোকশেমপুর কাশিয়ানী থেকে মনোহর দিলেন না। তিনি মনোহর দিলেন এমন একজনকে যার বিক্রমে সশস্ত্র রাজাকারীর অভিযোগ আছে। কপিও আছে, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুক ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনীর যোগসাজসে সশস্ত্র রাজাকার হত্যাছিল। তাদের বাড়ীতে রাজাকারের ক্যাম্প বানিয়েছিল। এবং এ অঞ্চলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিয়ে অনেক বাড়ী খত জালিয়েছিল। তিনি (লেঃ কর্নেল ফারুক) প্রগাঢ় দুষ্টবীর শীর্ষ নেতা সালাম খানের দূর সম্পর্কের জড়িত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি রাজাকারীর অভিযোগে বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে যান। পরবর্তী কোন এক সময়ে সর্ববৃত্ত '৭২/৭৩ সালে দেশের থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চর্চা হন। ২০/২৫ বছর সেনাবাহিনীতে চাকরী করে জেনারেল এখনাদের সাথে লাইন করে সাপ্লাই করে পোস্টিং নিয়ে প্রচুর টাকা পয়সা আয়ান। মতিয়ুর রহমান রেজু, ইসমত কাসির গামা, আবুল হাসান, মুহুল বোস এরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা। এই মুক্তিযোদ্ধা ও ত্যাগী নেতাদের হান্দ নিয়ে বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনা মোকশেমপুর + কাশিয়ানী থেকে মনোহর দিলেন '৭১-এর রাজাকার এল. পি. আর-এ-আগা।

সে: কর্নেল ফারুক খানকে । কিন্তু কেন? সেনাপাহানীতে চাকরীতে অবস্থায় ফারুক খান উপার্জিত কর্তৃক থেকে সে: কর্নেল ফারুক খান বহুবদ্ধ কন্যা শেখ হাসিনাকে এক কোটি টাকা দেন । এবং এই কণন এক কোটি টাকার বিনিময়ে বহুবদ্ধ কন্যা শেখ হাসিনা মোকশেমপুর কাশিয়ানী আসনটি এল পি. আর. এ. আসন সে: কর্নেল ফারুক খান ফারুক খানের কাছে বিক্রি করেন ।

## হিন্দুসাই আমার বন-ভরসা

বহুবদ্ধ কন্যা শেখ হাসিনা যেদিন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ঘোষণা করলেন, সেদিন তিনি নিজের মোট ৪টি আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘোষণা দেন । গোপালগঞ্জের ১টি, বাগেরহাটের ২টি এবং ঢাকার ডেমরা থেকে ১টি । এই মোট ৪টি আসন থেকে বহুবদ্ধ কন্যা শেখ হাসিনা নিজের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দেন । কিন্তু ঘোষণা দেওয়ার পরেও দিনই বহুবদ্ধ কন্যা শেখ হাসিনা ঢাকার ডেমরা আসন থেকে তার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নিলে, ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হুসাইনকে নেতৃত্বে করেওজন মেন্ট: বহুবদ্ধ কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অনুরোধ করে বলেন, আপনি গোপালগঞ্জ আর বাগেরহাটের (টুপিগড়া মুদ্রাতি নদীর অপরপার) ৩টি আসন থেকে দাঁড়ালেন অথচ ঢাকার একটি আসন থেকেও নির্বাচনে দাঁড়ালেন না । ৫টি আসন থেকে হ্যাঁ আপনি দাঁড়াতে পারেনই । বালুয়া জিয়া ৫টি আসন থেকে দাঁড়িয়েছে ; আপনিও ৫টি আসন থেকে দাঁড়ান । আপনি আমাদের নেত্রী, আপনি অত্যন্ত ঢাকার ২টি আসন থেকে নির্বাচনে দাঁড়ান ।

জবাবে বহুবদ্ধ কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, গোপালগঞ্জ আর বাগেরহাটে তো ৭০% (সত্তর শতাংশ) হিন্দু আছে; ঢাকার কত পার্সেন্ট হিন্দু আছে? হিন্দুরা ছড়া মুসলমানরা আমাকে ভোট দেয় না । মুসলমানরা বেইমান ও অকৃতজ্ঞ । হিন্দুরা ইমানদার এবং কৃতজ্ঞ । আমি হিন্দুদের উপর ভরসা করতে পারি, বিশ্বাস রাখতে পারি । কিন্তু মুসলমানদের বিশ্বাস করা যায় না । ভরসা করা যায় না । এই জন্যই কো অফি সত্তর শতাংশ হিন্দুদের অঞ্চল গোপালগঞ্জ আর বাগেরহাট থেকে ৩টি (তিন) আসনে দাঁড়িয়েছি । কিন্তু ঢাকা থেকে ১টি (এক) আসনেও দাঁড়াইনি । যা ও ডেমরা থেকে দাঁড়িয়েছিলম বোদ্ধ স্বর নিয়ে দেখলাম, ডেমরার ডেমরা হিন্দু নাই, তাই প্রত্যাহার করে নিয়েছি । ঢাকার মেয়র হুসাইন বললেন, একটা আপনার কুল ধারণ । মুসলমানরা ভোট না নিলে আপনার অন্যান্য প্রার্থীরা কিতে কিভাবে?

বহুবদ্ধ কন্যা বললেন, মূলত: হিন্দুদের ব্যাংক ভোটটা পুরাটা পড়া, বাকী আওয়ামী লীগ লোকলভ্য দিয়ে গুটিয়ে গাতিয়ে কোন রকমে ধরিয়ে আসে । হিন্দুরা না থাকলে আমি, আমার দল ১টি (এক) আসনেও জিততে

স্বাধীনতা না। হিন্দুজা যতন্ত নিরাপদে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে এই জন্যই জা  
 আনি এক সংশোধন সংগ্রাম করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারত আনায় করেছে। হিন্দুজাই  
 আমার বল। হিন্দুজাই আমার ভরসা।

নির্বাচনী প্রচারণার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। সারা দেশ পেট্রোল, গ্লে-কার্ড,  
 ফ্যাটুল, ব্যানারের এবং মেটাল সিগনে জোকে গেছে। কোথাওও একটুকু কালি  
 আয়না নেই। প্রতিদিন প্রতিনয়ক জনে মিটিং আর মিছিল।

## সেনা নামানোর নির্দেশ দিয়ে চম্পট

১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে ম্যাট্রিশিষ্টা লুৎফর নাহার লতার  
 মাধ্যমে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিম বহবজু কন্যা শেখ হাসিনাত কাছে  
 লন্ডনে পাঠালেন যে, ২৫ মার্চ '৯৬ সত্তম পার্লামেন্ট ২৪ ঘণ্টারও বেশি  
 বিরতিহীন অধিবেশনে সংবিধান এর যে সংশোধনী আনা হয়েছে, তাতে রাষ্ট্রপতির  
 হতে সেনাবাহিনীর সকল কর্তব্য দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সংশোধিত সংবিধান  
 অনুযায়ী সেনাবাহিনীর সকল কর্তব্য বি, এম, পিত কর্তমান রাষ্ট্রপতি আব্দু  
 রহমান বিদ্বাসকে দেওয়া হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি  
 মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের কাছে এবং সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমের  
 কাছে সেনাবাহিনীর কোন কর্তব্যই নেই। এই সংবাদ শোনার পর বহবজু কন্যা  
 শেখ হাসিনা বলেন, ও, এই জন্যই বাবেলা জিয়া দিন-রাত পার্লামেন্টে  
 বসেছিল। বাবেলা জিয়া ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সংসদ অধিবেশনে বসে  
 থেকে এই কুকীর্তিই করেছে। আমি জা আশে বুঝিনি, আশে চিন্তা করিনি।

এরপর বহবজু কন্যা শেখ হাসিনা উত্তেজিত হয়ে বলেন, কিসের সংবিধান?  
 কিসের সংশোধনী? আমি যা বলব জেনারেল নাসিমকে তাই করতে হবে।  
 জেনারেল নাসিম আমাকে তথ্য দিয়েছে আমি যা বলবো, আমি তে নির্দেশ দিব  
 নাসিম সেই তাবেই সেনাবাহিনী চলাবে। লতা (লুৎফর নাহার লতা) তুমি যাও,  
 সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে বলো আমি যেভাবে বলবো, যা বলবো  
 সে ঘেন নেতাবেই তা করে। ব্যক্তি সব দায়দায়িত্ব আমার, আমিই বুঝবো।  
 সংবিধান অনুযায়ী সেনাবাহিনীর পুরো কর্তব্য ও দায়দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি আব্দু  
 রহমান বিদ্বাসের। কিন্তু সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিম যীক বিক্রম  
 প্রতিদিন প্রতি মুহুর্তে বহবজু কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে সেনাবাহিনী পরিচালনা  
 করতে লাগলেন। হেতু নির্দেশনার কারণে জেতবে জেতবে সেনাবাহিনীতে সংকেত  
 সৃষ্টি হলো। রাষ্ট্রপতি রহমান বিদ্বাস সেনা কর্মকর্তাদের কোন নির্দেশ দিলে,  
 সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিম বহবজু কন্যা শেখ হাসিনাত নির্দেশ তার বিপরীত  
 নির্দেশ দিতে লাগলেন। এমনকি রাষ্ট্রপতি রহমান বিদ্বাস কোন সেনা কর্মকর্তাকে  
 বদলীত নির্দেশ দিলে বহবজু কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে জেনারেল নাসিম পাঠা



স্বনামীয় নির্দেশ দিতে শুরু করলেন। সেনাবাহিনীর ভেতরকার সংকীর্ণ আয়োজনিত হয়ে সংস্কারের দিকে যেতে লাগলো। এই পরিস্থিতি ব্যাপ্তি আশুত রহমান বিশ্বাস ১৮ই মে ১৯৬৬ বঙ্গভা সেনানিবাসের (ক্যান্টিনেটের) জি ও সি মেজর জেনারেল গোলাপ হেলাল মোরশেদ নাম সি জি সি এস সি এবং সি, ডি আর এর উপ-মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জিওথ হামিদুর রহমানকে অকার্যকর (ব্যবহৃত্যনুলক) অবসর দান করেন। (এই অবসর দেওয়া উর্দ্ধতন সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ হেলাল এর স্বামী) পাট্টা ব্যবস্থা হিসেবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ৪ জন উর্দ্ধতন সেনা কর্মকর্তাকে অবসর দেওয়ার নির্দেশ দিলে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিম (শেখ হাসিনার নির্দেশমত) মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল হকিম, মেজর জেনারেল সুবিম জলী, জুইজ, ব্রিগেডিয়ার আশুর রহিম ও কার্ণেল আব্দুল মাসাম এই ৪ জন উর্দ্ধতন সেনাকর্মকর্তাকে অবসরের নির্দেশ দেন। ফলে সংঘাত চরম আকার ধারণ করে সশস্ত্র বাহিনী চাচাতো পাট্টা চাচাতো চলে গেলে। সাংবিধানিক ভাবে সেনাবাহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যাপ্তি আশুত রহমান বিশ্বাস, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে অবসর দানের সিদ্ধান্ত নিলে, ১৯শে মে ১৯৬৬ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার জেনারেল নাসিমকে তার (নাসিমের) সমর্থনে সারা দেশ থেকে ঢাকায় সেনাবাহিনী মার্চ করানোর (নিয়ে আসার) নির্দেশ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার এই নির্দেশ পাওয়ার পর সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু দায়েদ মোহাম্মদ নাসিম ১৯শে মে দিনাগড় রাত ২টার পর (খজির বাটা অনুযায়ী ২০শে মে রাত ২টা) ঢাকার বাইরের সমস্ত সেনা ইউনিটকে তার সমর্থনে ঢাকায় মার্চ (চলার আসার) ক্রমা নির্দেশ দেন।

এর কয়েক ঘণ্টা পরে ২০শে মে সকাল ৮টার বেশরকারী বিমান আয়ো বেসলে করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে অবহিত না করে চুপিসারে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। এদিকে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমের নির্দেশ পেতে বঙ্গভা, বঙ্গপুর, যশোর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি ক্যান্টিনেট থেকে সেনাবাহিনী ঢাকার দিকে বওয়ান হয়। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিম এর নির্দেশে এবং সমর্থনে ঢাকার বাহিনী থেকে আলা নৈনিকনেত মুক নেতৃত্ব দেন ময়মনসিংহ ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জিওথ হামিদুর রহমান এবং বঙ্গভা বিদ্রোহ কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার শফি মেহবুব। এই পরিস্থিতিতে ব্যাপ্তি আশুত রহমান বিশ্বাস সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে বহুখাত করে সি জি এস (জি অদ জেনারেল ষ্টাক) মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমানকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদোন্নতি দিয়ে নতুন

সেনাবাহিনী প্রধান পদে নিয়োগ দেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে ন্যাকি জেনারেল আবু সাঈদ মোহাম্মদ নাসির তার ব্যবহারের আদেশ এবং নতুন সেনাবাহিনী প্রধান পদে জেনারেল মাহবুবুর রহমান-এর নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করে নিজেকেই সেনাবাহিনী প্রধান দাবি করতে থাকেন এবং পরবর্তী নির্দেশের জন্য বরখাস্ত করার শেষ হামিনার সাথে যাক যাক সোশালিস্টের দাবী তৈরী করতে থাকেন।

এদিকে বরখাস্ত করার শেষ হামিনা অক্টোবরী লীগের দরতমাসে এর দি ও শেষ পরিকল্পনের ব্যবসায়িক পার্টনার তার ইকবালের এতো বেসমসে করে কলকাতার পৌছে কলকাতারের আপার সার্কিট (পাহাড়ের উপরে যে সার্কিট হুটস) হুটসে কাসে লগরেজ পানে হাকিয়ে লগরেজ কেউ দেখছেন। আর তা পাওয়ার সাথে সাথে থাকে একটি করে ছেনসিভিল পাশে।

বরখাস্ত করার শেষ হামিনা অবশ্য আগে কখনো ছেনসিভিল দেখেন না। '৯১ সালে নির্বাচনে হেরে যেয়ে বিরোধী দলের নেত্রী হিসাবে ২৯ নম্বর মিলে। হেরে নরকারী বন্যার উঠার পর থেকেই সার্কিট, কাসি মোহাম্মদ মাকসুদ, খুদ হুটস না। মাকসি দিয়ে নর সময় পারি করতো। মাথা ব্যথা করতো, টেনশন খুদ হুটস না। বিশেষ করে বক্তৃতা দেওয়ার সময় থলা ভেঙ্গে যেতো। বক্তৃতা দেওয়ার সময় থলা বলে যাওয়া ছিল সব চেয়ে বড় অসুবিধা। জাঃ এন, এ, মালেক (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেষ হামিনার নাজেনতিক উপদেষ্টা) অনেক হোমিওপ্যাথি ঔষধ খাইয়েছেন। জাঃ এন, এ, মালেকের কাছ থেকে শত শত শিশি হোমিওপ্যাথি ঔষধ খেয়েও কোন ফল হুটস না। জননেত্রী বরখাস্ত করার শেষ হামিনা ভাব হুটসেন না। জাঃ মালেক এই সকল ঔষধে, অন্য কোন পরমা নিচেন না, যদি পরমা নিচেন তাহলে নিশ্চিত কলা হুটস। পরমা নেওয়ার জন্যই জাঃ মালেক অথবা নেত্রীকে ঐ সব ঔষধ পাওয়াচ্ছে। জাঃ মালেকের হোমিওপ্যাথি ঔষধের সাথে চলতে চলতি পাতার রস, হেউটমু। কিন্তু কোন কিছুতেই কিছু হুটস না। অবশেষে একদিন তার এন, এন, মালেক এক হেরেন মাকসুদা ছেনসিভিল নিচেন এসেন এবং বরখাস্ত করারও কলকাতা নেত্রী ২ টামু। করে দিনে ৩ বার এই ঔষধ খান। কেহনেন নারি চলে যাবে, খুশখুশি কাশ চলে যাবে, থলা ভাঙবে না, মাথা ব্যথা চলে যাবে। ক্রান্তে জল খুদ হবে।

একজন বরখাস্ত, হুদ হুদ এই কৌ ছেনসিভিল, আপা, লটি মেয়ে মানুষ বেশা করে। মালেক ভাই, এটা আপনি কি আসবেন?

জাঃ এন, এ, মালেক বলছেন, তার তোমাদের কথাবার্তা। নেত্রী, এই ঔষধ আমাদের দেশেই ছিল। আমরা কত প্রেসক্রাইপ করেছি। এটা খুবই কার্যকরী এবং ভাল ঔষধ। এরপর আমলে শুধু শুধু এই ঔষধটা ব্যাক (নিষিদ্ধ) করেছে। নেত্রী আপনি কোয়ে নেকেন, যদি আপনার অসুবিধা দূর না হুটসে, তবে আমাকে কলকাতা।

এটা ৯২ সালের প্রথম সিক্রেট কথা। এরপর থেকেই ৬ গ্রামচ করে দিনে ওষাধ, আর যেদিন মিটিং থাকে, কনসাল্টা থাকে, বক্তৃতা থাকে, সেদিন ৫/৬ গ্রামচ করে দিনে ৩/৪ঘার এমনকি চারেক সিক্রেটের সাথে মিশিয়ে কনসাল্টার মধ্যে নিতে গলা রিক গ্রামচ জন্য বক্তৃতার আগমুহূর্ত পর্যন্ত। মধ্য-বক্তৃতা হলে বক্তৃতার মাঝেও বসবস কন্যা বেশ থাকিনা ফেনসিভিল থেকে লাগলেন।



বক্তৃতা করছেন কনসাল্টা কন্যা বেশ হইলেন। মনে গা-এর মত ফেনসিভিল হইতে উদ্ভূত হইল। পাশে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্সি সফট অফিস থেকেও কনসাল্টার আকর্ষণ বলিত এবং পিছনে মুক্তিবাহা অতিবৃত্ত গ্রহণ হইল।

এইভাবে বছর দুই/ তিন নেত্রী নিয়ামিত প্রকটিন ফেনসিভিল থেকে। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি আর ফেনসিভিল ছাড়তে পারলেন না। যখনই তিনি ফেনসিভিল ছেড়েছেন তখনই পুঙ্গোনে নেই রোগ হ্যাঁদি নর্সি, গলা কুশখুশ, বক্তৃতার সময় গলা তেলে যাওয়া, খুম না হওয়া ইত্যাদি আবার পেয়ে বসে।

তাই হ্যাঁ! এঁর, এ, মালেক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে নিঃশ্রুতি ফেন্সিটিল  
মিত্রে থাকলেও আর নেত্রীও খেতে থাকলেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার মনোবৃত্তিও আকর্ষণে কল্যাণ জন্ম তুলেন কন্যা  
হেলা, আপা ঢাকার খবর কি?

নেত্রী কথিত নুরে বললেন, কেউ কারো নাহি ছাড়ে সমাজে সমান।

তারপর বললেন, দিছে এসেছি গণিয়ে হা হ্যা হোক। আজ নেত্রীর  
অনেকগুলো পথসঙ্গী আছে। পথসঙ্গী মানে রাজ্যের ধারে জনসঙ্গী। নেত্রীর আজ  
অনেক বন্ধুতা করতে হবে। গলা গরম রাখতে হবে। গলা বলে গেলে বা ভেঙে  
গেলে বন্ধুতা চলবে না। আবার ওম্মিত জাকার পরিস্থিতি নরম। তাই আজ  
একটা বেশি ফেন্সিটিল খেতে হচ্ছে। বেশা ১১টার কল্লভাঙ্গার এই জনসঙ্গী শুরু  
কল্যাণ। এব মনো জাকার পরিস্থিতিও কল্লভাঙ্গার অলসীতি ঘটায় বঙ্গবন্ধু কন্যা।  
স্বাধীনতা রহমান বিশ্বাস এবং জেনারেল নাসিমের এই সংঘাত জাকা  
ক্যান্টনমেন্ট করে নিয়ন্ত্রণে এটা বুঝা যাচ্ছে না। তবে সাতার ও খালীপুর  
ক্যান্টনমেন্ট যে রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাসের পক্ষে এটা বুঝা গেল এই কারণে যে,  
জেনারেল নাসিমের নির্দেশে ঢাকা অভিযুক্ত আলা ফাখর, বঙ্গুর, বঙ্গুর এবং  
মামুনসিংহ ক্যান্টনমেন্টের সৈনিকদের প্রতিরোধ করার জন্য নবম পলাতক টি-  
ডিসনের জিওসি মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান এর নির্দেশে সাতার  
ক্যান্টনমেন্টের সৈনিকেরা প্রতিরোধ বাটী অবস্থান নেত এবং ফেরী চলাচল বন্ধ  
করে দেয় ও নদী পার হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। সৌভাগ্যবশত খাটের এক মনোবৃত্তি  
খাটের সৈনিকদের নদী পার হওয়ার চেষ্টা করলে ফুটিয়ে দেওয়া হবে বলে  
ওয়ারেনসের মাধ্যমে স্থগিত করা দেয়। এনিয়ে মামুনসিংহ থেকে আলা  
সৈনিকদের কল্যাণ ব্যাকিংকট মিত্রে খালীপুরের সৈনিকেরা আটকিয়ে নেয়।  
কুনিয়াৎ মামুনসিংহ, ডিউগার, মামুনসিংহ প্রভৃতি ক্যান্টনমেন্টের অবস্থান বুঝা যায়  
না। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে পটি পথসঙ্গী বন্ধুতা করেছেন। ঢাকা  
থেকে বদল এলো জাকার রাজ্যের ট্রাভেলের মধ্যে। কিন্তু কার পক্ষে নেমেছে?  
অর্থাৎ সতাইয়ে কে জিতবে? জেনারেল নাসিম? না রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাস?  
এটা কিছুতেই নিশ্চিত হওয়া গেল না। এই পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ  
হাসিনা পথসঙ্গীর কর্মসূচী বাতিল করে দেন। এবং বেনগার পালাবেন সেই  
চিন্তায় ও চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কেউ বলেন টেকনাফে, কেউ বলেন  
নান্দরবনে, কেউ বলেন ডিউগার-এ।

আওয়ামী লীগের বাণেশ্বরের বর্তমান জন, শি, নীও বাহালুর বঙ্গবন্ধু কন্যা  
শেখ হাসিনাকে বাণেশ্বরে নিয়ে যেতে থাকলে পথিমধ্যে ডিউগার সিটি  
কর্ণাটেশ্বরের মেয়র মহিউদ্দিন, বর্তমানে শেখ হাসিনার প্রম মন্ত্রী মামুন, বিমান



মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন শেখ হাসিনাসহ সকলকে চিঠিপাং সার্কিট হাউসে নিয়ে তুলেন। চিঠিপাং সার্কিট হাউসের ভি, ভি, আই লম্বে বহুবহু কন্যা শেখ হাসিনা, মেহর মহিউদ্দিন, চিঠিপাং আওয়ামী লীগ সভাপতি বর্তমান শ্রম মন্ত্রী মাহান, কেন্দ্রীয় নেত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, কেন্দ্রীয় নেতা ডাঃ মোশরফ মহিউদ্দিন জালালসহ কয়েকজন রয়েল টেলিভিশন কেম্বলেন। শেষে এই সংকট মুহুর্তে করণীয় কি সে বিষয়ে বহুবহু কন্যা জনশ্রী শেখ হাসিনা বোম্বার্ডের নিশুপ। টেলিভিশন দেখা শুধা এই সংকটময় মুহুর্তে আর কোন কাজ নেই। ডব্লু ঢাকায় একটি ফোন করে শেখ বোহানাকে বাসা ছেড়ে অন্য জায়গায় থাকার কথা নলেই তিনি নিশুপ, নির্বিকার। এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন জিজ্ঞাস্য করলো, নেত্রী আমানত করণীয় কি?

নেত্রী উত্তরে আমতা আমতা করলেন। ঢাকা থেকে আসা নেত্রীত দল্লর সঙ্গী মটর সাইকেল আকরাই বদলে, আমাতের এখন উচিত জেনারেল নাসিমের ক্ষম্ মিছিল বের করা।

এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন জানতে চাইলেন, কি জন্য জেনারেল নাসিমের পক্ষে মিছিল বের করা উচিত?

এই জন্য মিছিল বের করা উচিত, জেনারেল নাসিম বি, এন, পির রাষ্ট্রপতি বহমান বিশ্বাসের প্রতিপক্ষ মানে বি, এন, পির রাষ্ট্রপক্ষ।

জেনারেল নাসিমকে সেনাবাহিনী প্রধান করে রাখতে পারলে সেনাবাহিনীকে ডেক এড হাউলক থাকবে। আর জেনারেল নাসিমের পতন ঘটলে, বি, এন, পির রাষ্ট্রপতি বহমান বিশ্বাসের সেনাবাহিনীর উপর একত্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে আগামী ১৩ জুনের নির্বাচনে এক প্রকার পক্ষ হবে। ঠিক আছে, নাসিমের পক্ষে মিছিল বের করেন, নলেই বহুবহু কন্যা শেখ হাসিনা যেতলমে ফুটে পড়লেন। চিঠিপাংয়ের মেহর মহিউদ্দিন, সভাপতি মাহান মিছিল বের করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করলে, তাদের মিছিল বের করার জন্য চাপরচাপি করলে জয়া পলেন, এমন কোথাও কোকজন পান, মিছিলের প্রোগান কি হবে?

ঢাকা থেকে আগত নেত্রীত দল্লর সঙ্গী মটর সাইকেল আকরাই বদলে, যে কোন কিছুই বিনিময়েই মিছিল করতে হবে। নলে ১২ই জুনের নির্বাচনে আদার ক্ষমতায় যেতে চান? জেনারেল নাসিম যদি নাও চিৎক, নাসিমের যদি পতনও হয়, তথাপি মিছিল বের করে গেরটের (প্রতিবাদ) বজায় থাকতে হলে। আপনাতা মিছিল বের করেন। মিছিলে প্রোগান মিবেল, জেনারেল নাসিম গ্রামাবাদ, বহমান বিশ্বাস নিপাত থাক। এই পর্যায়ে মহিউদ্দিন আর মাহান বহরে যেতে কয়েকজন মোরকট একটা মিছিল বের করে সার্কিট হাউসের চারপাশে ঘুরলো। টেলিভিশনে রাষ্ট্রপতি আব্দুর বহমান বিশ্বাসের জাফন ক্রম্ হলো। বহুবহু কন্যা শেখ হাসিনা

আমরা চলে গেলেন, অত্যাধিকারিক সরকার (কোমার) হাবিদুত রহমান কোমার? নামেরা জিয়া ২৪-শক্তি সংগঠন বলে থেকে এমনভাবে সংবিধান সংশোধন করেছে যে, কমতা আনুলে ওদের হাতেই রয়ে গেছে। আমরা তার কিছুই বুঝিনি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আমার বেডরুমে চলে গেলেন। ঢাকা থেকে আগত সকল সঙ্গী হটল সাইকেল আরোহী ঢাকার কোন করে তার স্ট্রীকে বসলো, তুমি দাও আওয়ামী লীগ অফিসে এবং আওয়ামী লীগের নেতা কবীরের বাসায়। মেয়ে বল বঙ্গবন্ধু কন্যা সারনেত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছেন, মিছিল বের করতে এবং মিছিলে শোধান নিয়ে জেনারেল নাসিম সিন্দবাদ! রহমান বিশ্বাস নিশ্চয় ফাক।

হঠাৎ বেডরুমের বিনিক্তর থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলে উঠলেন এ-ই-এ-ই-এই।

তারপর চুপ করে কিছুই বললেন না। অর্থাৎ নেত্রী বেডরুমের বিনিক্তর ভূমি এতক্ষণ কথাগুলি আড়ি পেতে চনছিলেন। টেলিভিশনে অত্যাধিকারিক সরকার প্রধান বিচারপতি হাবিদুত রহমানের বক্তৃতা নেত্রী বনমোম এবং আমার বেডরুমে চলে গেলেন। বেডরুমে গিয়ে নজিব ও বাহাউদ্দিন নাসিম বঙ্গবন্ধু কন্যাকে সারিটি হাউস ছেড়ে অন্যর পানিয়ে যেতে পরামর্শ দিলে তিনি বলেন, আমি কোমার যাব? অথচ চেষ্টা বেশ কি হয়। বলেই শেখ হাসিনা পুরো আমার বোতল ফেনসিডিল চেয়ে হয়ে পড়লেন।

মাঝ রাত্রে মোটাহুটি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, জেনারেল নাসিম এ দাড়াইতে পরাজিত।

সকাল বেলা বঙ্গবন্ধু কন্যা সারনেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, নাসিম পরাজিত হয়েছে ভাল হয়েছে। তবু (নাসিমকে) আমি ফেব্রুয়ারী মাসে কমতা নিতে বলেছিলাম ও শুধন ভাটি সেনিচ্ছে। পরাজিত হয়েছে ঠিক হয়েছে।

সকাল ৯টা৪ টাইটে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা চট্রগ্রাম থেকে ঢাকায় ফিরলেন। সেনাবাহিনী প্রধান সেক্টরেনাট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম বীর বিক্রম বরকাত ও গ্রেপ্তার হলেন। এরপর থেকে আর যেখনদিন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জেনারেল নাসিমের নাম বিদ্বিগ্ন ও উচ্চারণ করলেন না।

## আবু হেনার আগমন

১২ই জুন ১৯৯৬। নজিবুদ্দিন মৃদার স্থাপন করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। নর-নারী নির্বিশেষে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হুমতে হুমতে ভোট কেন্দ্রে গেল, হাসতে হাসতে নিজেদের ভোট দিল। আবার হাসতে হাসতেই ঘরে

ফিরে আসে। সফার পর বাংলাদেশ টেলিভিশনে নির্বাচনী কল্যাণকর ঘোষণা শুরু হয়। প্রথম দিকে দেশা দায় আওয়ামী লীগ বেশ এগিয়ে রয়েছে। প্রায় ১০টির পর আসার দেশা দায় বি, এন, পি বেশ এগিয়ে রয়েছে।

প্রথম দিকের ঘোষিত নির্বাচনী কল্যাণকর বহুবদ্ধ কন্যা শেখ হাসিনার উপস্থিতি সকলেই বেশ সুলভিত হতে থাকেন। কিন্তু প্রায় ১০টির পরের ঘোষিত কল্যাণকর সকলেই চিহ্নিত হয়ে পড়েন।

প্রায় ১০টির পরের দিকে বহুবদ্ধ কন্যা শেখ হাসিনার উপস্থিতি হওয়া হতে পারে এই কথা বলে তার বাসার উপস্থিতি সকলকে চলে যেতে বলেন। বাইরের সকলে চলে যাওয়ার ফলে বহুবদ্ধ কন্যা শেখ হাসিনার দানমতি ৫ নাখার রোডের ৫৪ নাখার বাসায় নীরব হয়ে যায়। প্রায় ১০টির দিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আবু হেলা হেলা একজনকে সঙ্গে নিয়ে বহুবদ্ধ কন্যা শেখ হাসিনার বাসায় আসেন এবং প্রায় এক ঘণ্টা একতর গোপন বৈঠক শেষে চলে যান।

## একাত্তরের সংস্কার

নির্বাচনের ছুড়ায় কল্যাণকর দেশা বেশ অন্যান্য দলের চেয়ে আওয়ামী লীগ সবচেয়ে বেশি সিট পেয়েছে। কিন্তু বহুবদ্ধ কন্যা হিসেবে কন্যা দেশা দেশা বি, এন, পি, জাতীয় পার্টি, জামাত এবং জামদ (বহুবদ্ধ) আ, স, ম, রব যদি একত্রিত হয়ে যায় তাহলে আওয়ামী লীগের ছাইতে ১টি সিট বেশি হয়ে যায়। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের ১টি সিট কম হয়। সেই ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের পবিত্রত বি, এন, পি জাতীয় পার্টি, আর জামদের আ, স, ম, রব এই জোট বা গণিতিত দলগুলো সংস্কার গঠন করতে পারে এবং সংস্কার সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা সিট অন্যায়সে নিজেদের মধ্যে ভাগ্যভাগি করে নিতে পারে। বহুবদ্ধ কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এই হিসাব-নিকাশের পর শুধু বলতে থাকেন, আবু হেলা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার) আমার সাথে ছিলেন কল্যাণকর? প্রত্যক্ষ করে কল্যাণকর? কল্যাণকর না, কল্যাণকর কল্যাণকর না।

এর পর-১৫ই জুন সফার বেলায় বহুবদ্ধ কন্যা শেখ হাসিনা আসেন নেতা এবং জামদের একমাত্র নির্বাচিত সংস্কার জনতা আ, স, ম, রবকে যে কোন প্রকারে চলে বলে কৌশলে তার (শেখ হাসিনার) বাসায় নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। হৈরাণী প্রত্যক্ষের ৮৮মালের পার্লামেন্টের গৃহপালিত বিদ্রোহী দলীয় নেতা সন্নিহিত প্রায় ১০ আ, স, ম, রবকে এই সংস্কার দিলে মনে হলো তিনি এমন একটি সংস্কারের জন্য চাতক পাবিত্র নায়ক অপেক্ষা করছিলেন। বহুবদ্ধ কন্যা শেখ হাসিনা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বলার সঙ্গে সঙ্গে আ, স, ম, রব এমন বি বহুবদ্ধ কন্যা শেখ হাসিনার দানমতি ৫ নাখার রোডের ৫৪ নাখার বাড়িতে ছুটে চলে আসেন। ২য় তলার ভি, ভি, আই, পি কক্ষে আ, স, ম, রব এন, পি কে

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বসতে নিলেন, ছিটী গাওয়ালেন। ততাপত বলালেন, হব আই, আপনাই দেশ হাৰীন কৰেছে। বাংলাদেশ হানিয়েছে। আপনাই তো আমাৰ পিতাকে শেখ মুজিবৰ থেকে বঙ্গবন্ধু হানিয়েছে। শাক্তা বিয়ে পৰিচিতি দিয়েছে, এসবৰ মূল বাস্তবিকভাৱে আপনাৰ অমনাই কৰেছে সব চাইতে বেশি।

আ, স, ম, হব বলেন, আপনি তো তখন রাজনীতিতে ছিলেন না কাজেই আপনি জানেন না, আমাৰ অখনই বঙ্গবন্ধু বিৰোধীতা কৰে চাইনি। আৰ আমি বাস্তবিকভাৱে তো কখনই বঙ্গবন্ধু বিৰোধীতা কৰিনি। বঙ্গবন্ধু চাৰ পাশে মাতা ছিল এম আমাৰ মাতাৰ পক্ষিতক, এতেই জানাৰে মধ্য বুৰু সূৰি কৰে দিছেছিল। অমনে বঙ্গবন্ধুই আমাৰে প্রকৃত নেতা ছিলেন। আৰ আমাই বঙ্গবন্ধুৰ প্রকৃত পোত ছিলাম।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, হ্যাঁ হব আই, আপনাই বঙ্গবন্ধুৰ প্রকৃত পোত। তাই আ আমি আপনাৰে নিজে মন্তাসনা পঠন কৰে চাই। আমাৰ সকলে নিজে সবকাৰ পঠন কৰে দেশ চালাতে চাই।

আ, স, ম, হব বললেন, মনেৰে নিক থেকে তো অনেক আবেদই আমি আপনাৰ (শেখ হাসিনাৰ) নেতৃত্বে দেশ পরিচালনাৰ হস্ততি নিয়ো আই এবং একেলিনি তো কেবল আপনাৰ ডাকৰ অপেকাৰই ছিলম।

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, আমাকে বিশ্বাস কৰন, আমি আপনাৰ বিশ্বাসৰে অম্বাসা কৰাৰো না।

আ, স, ম, হব বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাৰে বিশ্বাসে কৰাৰ বাপাত আমাৰ কোন খটতি নেই। আপনি বঙ্গবন্ধু কন্যা আপনাৰে কি অবিহাস কৰা যায়?

উপস্থিত মজিন আহমেদ, বাহাউনি নাসিম, নকিব আহমেদ মানু, কানিজ আহমেদ (এয়া সবাই শেখ হাসিনাৰ লাকৰ কুমাতো চাইলেন হেলে) নাম মোহন দাস, বুলাল আৰি দাস, অনাস, সেক্টাৰ মিক আৰিচে আ, স, ম, হব বললেন, আমি স্কোটাৰ সঙ্গে একটি একা কথা বলাতে চাই।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা উপস্থিত সকলকে বললেন, ভেবেচা এখন বাইরে যাও।

সবাই বাইরে চলে আনলো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আৰ জানৰ নেতা আ, স, ম, হব ভিতৰে একত্রে কথা বলালেন। মিনিট পাঁচেক পৰে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কলম এবং ৩টি কাগজ চাইলেন। ১টি কলম এবং ২টি কাগজ স্কোটাৰে দেওয়া হলো। বাইরে থেকে বুঝা গেল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবং জানৰ নেতা আ, স, ম, হব নিজেসৰে মধ্য একটি লিখিত চুক্তিমাৰা কৰলেন। মিনিট ১৫ পৰে আ, স, ম, হব চলে গেলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মোকলা



করলেন আ; স, ম, তাকে যানেন কক। দেখে, এয়ার ইন্ডেস বরকার গঠন করতে পারেন।

পরের দিন সকালে রান কোরন মান একটি হিসেব নিয়ে এসে বসবস কন্যা শেখ হাসিনাকে বুঝলেন যে, সি, এন, সি, জাতীয় পার্টি, জামাত ইন্ডেস, আনস কক এবং একমাত্র খতম এম সি কুচিয়াত ফকমুল হোসেনও যদি একজোটা ফক হয় তাহলেও আওয়ামী লীগ এর সংখ্যা পরিচিতি থাকে এবং আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করতে পারে। কারণ একাধিক আসন থেকে বিজয়ী হলেও জনমানের লব্ধিমান অনুযায়ী শপথ নেওয়ার পূর্বে ১টি (এক) মন্ত্রী আসন বা নিউ বেসে থাকি আসন বা নিউ বেসে নিতে হবে। এবং ফেডে রেওয়া সেই আসন বা নিউ বেসে ফেডে হবে। অর্থাৎ এক থাকি ফকমুল আসন বা নিউ বেসেই বিজয়ী হোক না কেন, এক থাকি একজন এম, সিই হতে হবে এবং একজন এম, সি, হিসেবেই ধরা হবে। সেই দিক থেকে সি, এন, সি, জাতীয় পার্টি আসন, জামাত এবং খতম জাতীয় আসন বা নিউ বেসে হক, ১১টি (একাদশ) আওয়ামী লীগের ৪টি (চার)। শপথ নেওয়ার পূর্বে ফেডে রেওয়া আসন মান নিয়ে হিসেব করল লেখা যায় আওয়ামী লীগের একমাত্র উল্লেখিত জোড়ের চাইতে ১টি (এক) আসন বেশি থাকে। জনসত্তা বসবস কন্যা শেখ হাসিনা এই হিসেব বুঝার পর বলে উঠেন, ওরে হায়ানজাদা আমা কই ছিলি? অমম কই ছিলি? এখন সব শেষ। এখন সব শেষ। তব আওতাধারি নিয়ে আমা কক থেকে নির্বিত নিয়ে গেছে। এখন আর তা পশীচাচা থাকে না। হুদামজাদা আমা কি করলি? এখন কি করি? ঝগের কাছে আমার নির্বিত আছে।

এই হলো বসবস কন্যা জনসত্তা শেখ হাসিনার ঐক্যমস্তক বরকারের প্রকৃত উৎপত্তি। এবং আসন নেমে, আ, স, ম, কক হলো।

## বুৎশন এরশাদের পা বরা

১৯৯৭ জুন ১৯৯৬। সকাল ৭টাখ বারবক রাষ্ট্রপতি হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের প্রী বুৎশন এরশাদ বসবস কন্যা শেখ হাসিনার আর হাত পানমাড়ি ও নাপার বাড়িতে দেখে ককলেন। ২য় হলার সি, সি আই, সি কমে মুগোমুখি সেওয়া বসেহেন বসবস কন্যা শেখ হাসিনা আর অনেক কইহলকি বুৎশন এরশাদ। মুগোমুখি কক ৫ ফিটের হকো মুরক। বুৎশন এরশাদ ককলেন, আপা (শেখ হাসিনা) আপনার কাছে আমা একটি অনুরোধ, আপনি জাতীয় পার্টি থেকে জিন্নাত মুশারফকে মহিলা এমপি বানাবেন না

শেখ হাসিনা বললেন, এটা আপনাদের বাপার, আপনাক থাকে নিবেন আমি তাকেই মহিলা এমপি বানাব।

বিশ্বশন এরশাদ বললেন, আপা, আপনি আমার বোন, আপনিও মহিলা, আপনারাও বানী আছে। আপনি বোন হিসেবে আমার প্রতি দয়া করেন। সবই আপনার হাতে। আপনি দয়া করে আমার স্বামীকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করুন। ঐ চখিরা ভীষী নষ্ট। জিন্মতে মুশারফকে দয়া করে আপনি মহিলা এম, পি জানাবেন না। প্রয়োজনে আপনি জাতীয় পার্টি থেকে একটিও মহিলা এম, পি জানাবেন না।

বহুবধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, না না আমি জাতীয় পার্টিতে ১টি-এক জামাতকে ১টি মহিলা এম, পি কির।

বিশ্বশন এরশাদ বললেন, তাহলে আর যাই হোক, জিন্মাতকে এম, পি করবেন না।

শেখ হাসিনা বললেন, বহুজাম ভোঁ এটা আপনারদের ন্যাপার।

বিশ্বশন এরশাদ নোকা থেকে উঠে বোজা বহুবধু কন্যা শেখ হাসিনার পা ছড়িয়ে ধরে বললেন, আপা, আপনি আমার বোন, আপনি দয়া করে আমাকে এই মহিলাকে ফেলবেন না। আপনি দয়া করে আমার স্বামীকে উদ্ধার করুন।

শেখ হাসিনা বললেন, আরে কি করছেন, কি করছেন। ঠিক আছে, পা ছাড়ুন, পা ছাড়ুন আমি দেখব।

বিশ্বশন এরশাদ বললেন, আপা আপনি কথা দেন।

বহুবধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, ঠিক আছে আমি জিন্মাতকে এম, পি জানাব না।

অতঃপর বিশ্বশন এরশাদ ভি, ভি, আই, পি কমেট পশ্চিম পার্শ্বের নরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ির ধারে গেছে না যেতেই ভি, ভি, আই, পি, কমেট উল্লস নিকের করজা দিয়ে বহুবধু কন্যা শেখ হাসিনা বেরিয়ে জাইনিং করেন এসে নাচতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন, তাড়িয়ে ছাড়ুন না। নাগাইটা দিমু। কাউরে ছাড়ুন না। জিন্মাত মুশারফকে এমপি বামনাই।

## বোরখাওয়ালীদের মিট

বহুবধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেছেন জিন্না পতন আন্দোলনে একতরঙ্গ (৭১) এর মুক্ত অপরোধী স্বাভাবিক গোলাম আগর ও তার বন জামাতে ইসলামীর সাথে গভীর রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এবং নির্বাচনের প্রাকালে শেখ হাসিনার বিয়াই (শেখ হাসিনার মেয়ে পুতুলের শত্রু) মুশারফ হোসেনের উত্তরার ব্যক্তিগত জামাতের প্রধান স্বাভাবিক গোলাম আগর এবং মহিউর রহমান নিজামীর সাথে গোপন বৈঠকে মিলিত হন।

ঐ বৈঠকে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয় যে, ১২ই জুন ৯৬-এর নির্বাচনে জামাতের কন্নী ও সমর্থকরা বি, এম পি প্রার্থীকে ভোট দিবে না। এবং যে সমস্ত

কয়েকটি জামাত দ্বন্দ্ব সেই সময় জরুজায় আশ্রয়ী লীগ রাষ্ট্রকে জোট দেওয়ার চেষ্টা করবে। যিনিমধ্যে বহুবলু কন্যা শেখ হাসিনা জামাতকে ২টি মহিলা আসন নিবেদন।

রাত তখন ১০টা বহুবলু কন্যা শেখ হাসিনা ভাইনিং টেবিলে হাতের বাধাও খেতে খেতে জামাত নেতা হাতক গোলাম সাফম ও নিজামীসের সমস্ত বৈঠকেও ও ওয়াদাত কথা পুনরায় উল্লেখ করে বললেন, ওদের বলেছিলাম বোরকাওয়ালীদের ২টি মহিলা এম. পি দিন। তখন ভেবে ছিলাম জামাত গোটা পনের নিট পাবে। কিন্তু জামাত পেয়েছে মাত্র ২টি আসন, বোরকাওয়ালীদের এখন ১টাও বেশি মহিলা এম পি দিন না।

এই কথা শুনে শেখ হাসিনার জাঠী, শেখ নাসেরের স্ত্রী, শেখ হেলাল এম পি'র মা বললেন, এখন মিলিও অর, না মিলিও অর, কামতো গুয়েই গেছে।

অর্থাৎ জামাতকে এখন মহিলা এমপি মিলেও চলে, না মিলেও চলে। নির্বাচনী কাজ তো উদ্ধার হুয়েই গিয়েছে।

বহুবলু কন্যা বললেন, ভবিষ্যতে হাতের দুটোয় রাখাও জন্য একটি মহিলা এম পি বোরকাওয়ালীদের সেই। মিসেস মতিবুর রহমান রেবু (মরানা) বললো, আপা এটা আপনি কি বলেন? মানুষের মন ভেঙ্গে দিবেন না। মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করবেন না। আপনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নেত্রী, মানুষ আপনাকে স্বাধীনতার প্রতীক মনে করে। আপনি যদি জামাতকে মহিলা এম. পি দেন তবে যাদের ক্ষিমা আর আপনাদের মধ্যে ভাঙ্গাং থাকবে না। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষ বিশ্বাস হবে। আপনাদের ক্ষতি হবে। আপনি এটা করবেন না।

এরপর মুক্তিযোদ্ধা মতিবুর রহমান রেবু এবং মিসেস মতিবুর রহমান রেবু (মরানা) একত্রেগোপে বহুবলু কন্যা শেখ হাসিনার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে দিয়ে বললো, আপা আপনি কথা দেন জামাতকে একটাও মহিলা এম. পি নিবেদন না।

শেখ হাসিনা বললেন, আমাকে ডাবকে দাও। রাত তখন ২টা।

পরদিন সকাল ৭টায় মুক্তিযোদ্ধা মতিবুর রহমান রেবু ও মিসেস মতিবুর রহমান রেবু (মরানা) প্রথমেই গেল ইন্ডির রোডে শেখ হাসিনার জাঠী শেখ হেলাল এম. পির বাড়ি বাসায়। দু'জনে মিলে শেখ হাসিনার জাঠী পা জড়িয়ে ধরে বললো, জাঠী আপনিই কেবল পারবেন জামাতকে মহিলা এম. পি দেওয়া থেকে আপাত্তে (শেখ হাসিনা) বিরত রাখতে।

জাঠী বললেন, তোমাদের সাববেই তো আমি কালকে বললাম মিলেও পার, না মিলেও পার।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনে বলল, না জাঠী, আপনি কথু বললেন জামাতকে মহিলা এম.পি দিও না।

চট্টীকে এক প্রকার জোড় করাই দানমতি ও মন্তর ঘোড়ে শেখ হাসিনার বাড়ি নিয়ে যাওয়া হলো। এবং পুনরায় স্বামী-স্ত্রী মিলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পা জড়িয়ে ধরে জামাতাকে মহিলা এম. পি না দেওয়া জন্য কান্নাকাটি শুরু করেন চট্টী-বংশের, ওরা কান্নাকাটি করছে তাছাড়া জামাতাকে মহিলা এম. পি না মিলে জোয়ার বেচন কতি হবে না। নিও না কুমি জামাতাকে মহিলা এম. পি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বঙ্গলেন, দিক আছে, তোমরা যখন দিতে চাও না, না লিখ।

## হানিফ এম জি আর ডি মন্ত্রী

আগামী ২৩শে জুন ১৯৯৬। সকাল ৭টা বঙ্গবন্ধু চট্টপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের কাছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিচ্ছেন। নব্বই খুব বাত। দাদা মন্ত্রী হবেন বলে আশা করছেন তারা নব্বইই প্রচলিত শ্রমশ্রমে আসছেন। ঘনঘন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বানান আসা-যাওয়া করছেন। মনে মনে জানাচ্ছেন আমি তো মন্ত্রী হইব। আমাকে মন্ত্রী বলা থেকে দান নেয় কিভাবে? তবুও বলা তো দায় না, যে এক আবছা মন্ত্রী নানা ঘোড় বাদ পড়বে আমার নাম অর্থাৎ ঐ বাদ যাওয়া ডালিকার নেই তো? না, না এ কি করে হয়। আমাকে মন্ত্রী না বানিয়ে পরবেন না। আমি মন্ত্রীও পাসই। তবে, কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাব এটা ভাবনার বিষয়। কলী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছেই লোক কসার লোক বিশেষ করে আত্মীয় বংশবানর কাছে ধনী দেওয়া, জোড় তদবির করা চলছে। এমনকি রাষ্ট্র একজনই শুধু তদবির করছেন না, ধনী নিচ্ছেন না। কারণ তিনিই একেবারেই নিশ্চিত তিনি মন্ত্রী হচ্ছেনই। তবু মন্ত্রীই নিশ্চিত নয়, মন্ত্রণালয়ও নিশ্চিত। এবং সেই মন্ত্রণালয়টি হলো এল, জি, আর, ডি, মন্ত্রণালয়। এই পৌড়াগাদার ব্যক্তিটি আর কেই নন, তিনি হচ্ছেন ঢাকার মোহাম্মদ মোহাম্মদ হানিফ। মোহাম্মদ মোহাম্মদ হানিফ এল, জি, আর, ডি, মন্ত্রী বলা হয়েছে। আসছেন, এটা তিনি একেবারেই নিশ্চিত। তার শুধু শপথ নেওয়াটা কতি। আগামী ২৩শে জুন শপথ অনুষ্ঠানটাও হয়ে যাবে। ঢাকার মোহাম্মদ মোহাম্মদ হানিফের এল, জি, আর, ডি, মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীত্ব এই নিশ্চয়তার কারণ, গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী '৯৬ দানমতি ৩২-এ বঙ্গবন্ধু করছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা আজকের ভারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তো মোহাম্মদ হানিফকে এল, জি, আর, ডি, মন্ত্রী বানিয়েই রেখেছেন এবং মোহাম্মদ হানিফকে এল, জি, আর, ডি মন্ত্রী হিসেবে অন্যানুষ্ঠানিক ঘোষণাও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১৭ই ফেব্রুয়ারী '৯৬ দিয়েছেন। কাজেই মোহাম্মদ মোহাম্মদ হানিফ না কিংবা তু মুর্তিহেই আসছেন।



## সবার মুখ কালো

আজ ২৩শে জুন ১৯৯৬ সাল। সন্ধ্যা এটায় বঙ্গবন্ধবনের দরবার কক্ষে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান সিদ্দিকের কাছে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা শপথ নেবেন।

শানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের শেখ হাসিনার ৫৪নং বাড়িতে শুধু ছাত্র শেখ হাসিনা ছাড়া বাকি সবার মুখ কালো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পিতার কুমারত্যাগ ভাইদের ছেলেরা নজির আহমেদ নজিব, নজিব আহমেদ হান্ন, কানিজ আহমেদ এদের সবার মুখ কালো। এমন কালো, যেন কালোশামীর কালো মোম এদের মুখে চক্কর করেছে। এদের আরেক চাচাতো ভাই রাহাতুদ্দিন নাসিম সে ক্ষেত্রে ভোর হওয়ার আগেরই শেখ হাসিনার বাসা ছেড়ে চলে গেছে। বাড়ির চাকর-বাকর, পিয়ন, গাড়ির ড্রাইভার, বারুচি, এমন কি যাত্রা দীর্ঘ ১৬/১৭ বছরের শেখ হাসিনার সাথে থাকতে থাকতে শেখ হাসিনার আত্মীয়গণ মতো হয়ে গেছে, শেখ হাসিনার পরিবারের সদস্য হয়ে গেছে, তাদের চোখেও চলে, তাদের মুখেও ভীষণ মলিন। ভীষণ কালো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কিছুক্ষণ পর পর শুধু বলছেন, সবাই এমন ভক্ত করেছে, যেন আমি মরে যাচ্ছি। অন্য ঘনিষ্ঠজনক পরেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন। অবশ্য তার বাড়িতেই নেমে এসেছে ভীষণ গরম শোরকের ছায়া। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেই যাচ্ছেন, হ্যাঁ আমি কি করে যাচ্ছি যে, সবাই শোক শুরু করেছে?

শেখ হাসিনার আত্মীয়সহ দুই/তিনজনকে এই শোরকের কারণ কি জিজ্ঞাস করলে তারা বলেন-বুঝেন না, উনি ভো (শেখ হাসিনা) প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেছেন, উনার আশেপাশ ভো কুছিয়েই মিছেন। আমাদের কি হবে? এখন ভো উনি আমাদের খোঁজও নেবেন না। আমরা যে এতো বছর এতো ভাই করবাম, জা মনেও রাখবে না। বলা হলো না না প্রধানমন্ত্রী হয়ে ভুয়ে যাবেন কেন? মনে রাখবেন না ভো? নিশ্চয়ই মনে রাখবেন।

ওরা কহাবে কহাবে, এখনও বুঝেন নাই ভো, কি-রত্ন বেইমান, বুঝবেন। সন্ধ্যা সাতটায় বঙ্গবন্ধবনের দরবার কক্ষে প্রবেশ করা হলো। আগ্রাসী লীগের সমস্ত এম. পিয়ার এসেছেন। বিচারপতিগণ এসেছেন। ডিন হাইনসী প্রধান এসেছেন। প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ, গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সবাই এসেছেন।

নতুন প্যায়জামা-পাঞ্জাবি আর মুজিব কোর্ট পরে এসেছেন ঢাকার মেহর মোহাম্মদ হামিদ। তিনি সাধারণত মুজিব কোর্ট পড়েন না। কিন্তু তিনি ভো নিশ্চিত তিনি আজ মন্ত্রীত্বের শপথ নিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তাঁর (হামিদকে) মন্ত্রী বলে ঘোষণা নিয়েছেন। কাজেই তিনি আজ মুজিব কোর্ট পরে এসেছেন। তিনি জানতেন যথ্য তৈরী করেছেন। খালেদা জিয়া সরকারের পতন ঘটিয়েছেন। অনুভব মজুর ন্যাক ভো তিনিই। এই সবকিছু নিয়ে ঢাকার মেহর হামিদ আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যমনি না বলেও কম গুরুত্বের না।

## আমার সাথে বেইমানী!

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু জনা শেখ হাসিনা শপথ নিলেন এবং বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন। এবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর মন্ত্রী সভার নাম ঘোষণা করবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যাপ থেকে তার মন্ত্রী পরিষদের নিট বেত করছেন। তাঁর মের মোহাম্মদ হানিক ব্যাপ থেকে ব্যাপ থেকে উঠছেন। প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার মন্ত্রী পরিষদের নাম শুনে একটা সময় লম্বাছে। ঢাকার মেয়র হানিক এমনভাবে আছেন যে তিনি না মেয়র বলে আছেন, না মন্ত্রী আছেন। তিনি মনে করছেন, মেয়রে বলে কি মন্ত্রী এখনই তো উঠতে হবে, মন্ত্রী পরিষদের প্রথম নামটাই আধ। মেয়র ছেড়ে মন্ত্রী আছেন না এই জন্য যে মন্ত্রীরা মনে হতে পারে। তাই তিনি আধা বলা, আধা মন্ত্রী আছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রী পরিষদের নাম পড়তে লাগলেন। প্রথম নামটি মেয়র হানিকের না, দ্বিতীয়টি না, তৃতীয়টি না, চতুর্থ না, পঞ্চম না, ষষ্ঠ না, সপ্তম না, অষ্টম না, ..... না, না, না, না এর পর মেয়র মোহাম্মদ হানিক কামার কামার শ্রোতা-দর্শক ভরা দরবার ভেঙে মেয়রের দু' লাভি মাকখান নিজে দ্রুত বঙ্গবন্ধু আখা করে বেরিয়ে গেছে থাকলে একজন আবে পিছন থেকে হানিক তাই বলে জড়িয়ে ধরলে তিনি তাকে ধাক্কা মেয়ে সরিয়ে দিয়ে, আমার সাথে বেইমানী। আমার সাথে বেইমানী। বঙ্গবন্ধু মনে মনে মনে ভাব করে চলে যান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বাসায় ঘিরে তার বাসার বেত বেত বলেন, আজ আমার দুইটা আনন্দ। প্রধানমন্ত্রী হতে আমার আনন্দ আর হানিকের বেইমানির প্রতিশোধ নিতে আমার আনন্দ।

পরবর্তী পর্যায়ে মেয়র মোহাম্মদ হানিক ডায়ালগিক (বার্ডিং-এ) হানপাতালে অর্ধ-হাস্য সাংবাদিক ভেঙে বলেন, কলিকাতা লক্ষ্য না করেন অপমান করতে পারেন না।

তারপর দাবী করলেন তিনি স্বাভাবিকভাবে। এর পর মেট্রোপলিটন কর্তৃপক্ষের। কিন্তু না, মেয়র হানিকের কিছুই পাওয়া হলো না। মন্ত্রী না। তিনি মন্ত্রী না। মেট্রোপলিটন অধিকারি না।

## বেশামাল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার মানমতি ৫ নাছুর রোডের ৫৪ নাছুর বাসায় ঘিরে এসে তার জন্য নতুন সরকারী বাসা পছন্দ করার জন্য আত্মীয়স্বজনদের বললেন। শুরু হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য বাসা পছন্দ করা। প্রথমেই দেখা হলো রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন বুগা। তার পর দেখা হলো এরশাদ আমলে

তক হতে কলকাতা গিটার আমদানি শেষ হওয়া, জার্মান সংসদসভা যখন আলোচিত ২০ নম্বরটি বিতরণ করে। নির্দিষ্ট ৩০ নাম্বার হেয়ার বোর্ডের বাগাটি । ৩০শর রাষ্ট্রীয় অধিষ্টি ভবন পড়া, যেখানে এবং অবশেষে কলকাতায় । পণ্ডিতগণেরা, অস্বীকার করেন যে অনেক আলাপ আলোচনার পর থেকে বাংলা নগর সংসদ ভবনের পশ্চিম উত্তরে জিলেন্ট লেকের পশ্চিমে বিশাল আকারের দুর্গের ন্যায় কলকাতায় পছন্দ করা হলো । প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর আমলে তাঁর (শেখ মুজিবুর) অফিস ছিল এখানে । তখন এই ভবনকে বলা হতো গণভবন । পুনরায় এই ভবনের দায় গণভবন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বালভবন করা হলো ।

৩রা জুলাই, ১৯৯৬ রাত ৯টার দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই পদত্যাগ  
এসে উঠলেন। পদত্যাগ এসে তিনি সোজা ২য় তলায় গেলেন। ২য় তলায়  
শোবার রুম দেখলেন, খাবার রুম দেখলেন, বস্ত্রের রুম দেখলেন, আরো  
৮/১০টা রুম দেখলেন। প্রতিটি রুমেই ২৬" গ্রহিন টেলিভিশন এবং অত্যাধুনিক  
আবতাব পড়ে সুড়ঙ্গ ভঙ্গ সাজানো। দ্বার বেশি ইত্যাদি বিশাল প্রাসাদের বিশাল  
আবতাবের নীচতলার অংশটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেখতে পারলেন না।  
মুমিয়ে পড়লেন। পরদিন ৪টা জুলাই, দিনের দিনে ছোট ছোট ফেলোমেন্টের  
যেমন খুব ভোরে উঠে পোনাল টোলস সেসে নতুন জামাকাপড় পরে কুশির টেলার  
বেড়ানত বেশ হাথ দাঁত, ঝিক ঐ বকর ভারেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুব ভোরে  
উঠে সারসার করে পোনাল টোলস সেসে নতুন শাড়ি পরে লাকটো ব্যাজার আগেই  
কাব (প্রধানমন্ত্রীর) কার্মাখায়ে চলে গেলেন। থিরলেন দুপুর আর ১টা।  
পদত্যাগের নীচ তলার চুকতেই হাকের ডান দিকে অর্ধা নীচ তলার পশ্চিম  
পার্শ্বের ৩ নম্বর কামে ঢুকলেন, সঙ্গে হিরলেন ছাটী, মাদন শেখ হেমালেন ন।  
এই ৩ নম্বর কামটিতে ঢুকই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেসামান হুটে ছেড়ে এক  
হিৎকার দেন, ও...ও লা...তি রে এ...ত ব...ক টে...গি...ন বলে লাক  
নিত শেখ হেলল এম, পির সাকো অকিতো করে বললেন, কইয়া ওটি (সকনা  
আত্মীয়) কে খবর দেন, এই টেলিফোন খাটতে হবে।

जगदीश्वरमन्त्र, रुद्रमन्त्र, आलोकनमन्त्र, विष्णुमन्त्र, शिवमन्त्र ।

ব্রাহ্মণমণ্ডলী শেখ হাছিনা দলদলন, তাইলে টিপিপাত্তর মাইনলসে (হানুস)  
খবর সেন। এই টিবিমে কাইতে হান।

সমন্বয়ের জন্য উৎসাহে তার নিয়ন্ত্রণের কার্যকে নিম্নোক্তকৃত সেন্সেয়ারশীল বিশেষ  
 দল এম. এস. এফ এবং জি. জি. আর-এর সমন্বিতা এগিয়ে এলে প্রধানমন্ত্রী  
 শেখ হাসিনা দুপ করে যান এবং জাতিকে বলে নিয়ে উপরে চলে যান।

পঞ্চাশতাব্দের তিনটি ক্রমটি একটি বিশাল ক্রম। এই বিশাল ক্রমে তিন আকৃতির একটি বিশাল টেবিল রয়েছে। এবং এই বিশাল টেবিলের চার দিকে প্রায় শতটি বিজ্ঞানবিদ চেয়ার রয়েছে। এই তিন ক্রমটি বাণ্যার বা চাইনিং ক্রম নয়, এটি আসলে একটি কনসারভেশন ক্রম।

ଦୁଇ ଶୋହଲ ଡାମାଡାଗି

কর্মখানে বাংলাদেশের যিনি নির্দীক কর্মচার অধিকারী, যার অধীনে হলেন  
এদেশের বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য, উচ্চ পর্যায়ের চাকরী-বাকরী নিয়ন্ত্রিত হয়,  
সরকারের সামরিক-বৈমানিক আমলা, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং  
প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়জন যে যেখানেই আসেন তাদের মধ্যে সবচেয়েইতে শক্তিশালী  
কর্মচারী, দায়িত্ব কর্মচারী পর্যায় থেকে যে কোন পর্যায় পর্যন্ত কর্মচারী  
কর্মচারীর পোষাক-পরিধান-এবং বস্ত্রীয় যত্ন মনোযোগ বা ইচ্ছানুযায়ী হয়,  
সরকারী পর্যায়ের সাক্ষা-বাণিজ্য পাওয়া না পাওয়া যায় উপর নির্ভর করে,  
এদেশের বৈদেশিক-অর্থিক সমস্ত টাকা ব্যয় করা হয়, কর্মখানে প্রধানমন্ত্রী  
শেখ হাসিনা পরিবারের কারিগার যিনি, একমাত্র রাজনীতি ছাড়া পোশাক-বস্ত্রের  
অর্থনীতি একক হয়ে পরিচালনা করেন যিনি, এদেশের মানুষের জন্য কিছুমাত্র  
ভালোবাসা মাত্র-মমতাই দেখানো নেই যার, এদেশের মানুষকে শ্রম (পুণ্য)  
করুন (করুন) আর, নিম্নকর্মচারের জাত হওয়া আর কিছু করেন না, অন্য  
কিছু করেন না যিনি, তার সাথে যখন কেউ যোগে যোগে সাত পোষাক যদি  
কমতে পেতেন, এদেশের আরো একটি মানুষ একজনই প্রধানমন্ত্রীর নিষ্ঠুর হয়ে  
পেছে আরো খুশিতে আরোহণ। হতে বস্ত্রীয় যিনি, মনোবর্ত এদেশের মানুষের  
অনিষ্ট-অসুখ হওয়া আর কিছু জিজ্ঞাসা-এবং কামনা করেন না যিনি, তিনি আর  
কোন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর জন্য বস্ত্রীয় শেখ মুজিবের সহকারী এত কম  
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগের ছোট্ট সোম শের বস্ত্র। এই ত্রুটি ১৯৯৬-  
এবং অপর্যন্ত তিনি এদেশে বসতবসেন। তারই বড় বোন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার  
করে। এদেশে সরকারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিরকাল করে বসতবসেন, এই,  
শেখ মুজিব কি একে প্রেমের ব্যাপ? শেখ মুজিব কি আরো ব্যাপ না? আরো  
ব্যাপ ও? আমি কি শুধু শাই না? তুমি শুধু একা খাওয়া? আরো সত্য ব্যাপ  
শাই। সমান ব্যাপ চাই। আরো ব্যাপ কই? আরো এটা বই নিয়ে ছাড়া।

অবাস্যতঃ শিব হামিল্টন তাঁর কটকট করে দশাভাষ্য, কুই মটী নিয়ম কি কংক্রিট টাকার খাস দে। নিজ পোকে ফলি।

[illegible]

এশাশতাব্দী শেষে হাঙ্গেরি, বেলেন, মল্লী, শারি, না, কোমাইকেউ, জমাইতে, পোয়া।  
 ইতি টাকার চরিত্রের শারি। সব কই নে।

দুই মাসের চিকিৎসার ফলে প্রধানমন্ত্রী ১৪ বছর বার্ধক্যবৃত্ত নিরূপণের  
 মাধ্যমে নিরুচ্ছিন্ন বেনমোহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর ৬৪ (ছয়টি)  
 কক্ষ পরিচালনার সমন্বয় পরিচালনা করে, এবং, এবং, এবং (স্বপ্নবিদ্যালয় শিক্ষিত) এবং  
 এবং, বেনমোহিনীর ১৩শ (গোলন্দাজ) সমন্বয় একটি বিশেষ নব বি, বি, এবং  
 (প্রাইমারি) গার্ড (প্রাইমারি) এবং এই দিন ডিউটি-বৃত্ত সমন্বয় তৎপরে পরিচালনা



শালমে কন্সল্টেবলবিদ্যুৎ হলে নৈতিকতা প্রকট প্রকাশিত হয়। শেখ হাসিনার জেথের ইশারায় ভাস্করকে মর্মেতে করেন, এটা প্রধানমন্ত্রীর একমুখী নৈতিক এবং পাবলিক ব্যাপার বলে ওজাহসুত (মুষ্টি এড়িয়ে যাওয়া) করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

আজই যদি আমার পাঠ্যক্রমে মন্ত্রী না করত। তবে আমি আবেগিত হয়ে যাই। হবার আমেরা তবিলে সময় লাগে নিয়ে আসব। হলে ঠিক। ও কথা বলে চলেছে অন্য শেখ রেহানা চলে গেছেন।

পরবর্তী পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবেগিত হয়ে হুজুর করিয়ে লাগাতার এবং আশেপাশ বক করে তার ফেটে পোন শেখ রেহানাও লোশে নিয়ে আসেন এই শর্ত যে, শেখ রেহানাই হবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যাপারে। সমস্ত লিখা পাসে। শেখ রেহানাও হাত দিতে আসতে হবে। তবে শেখ হাসিনার পর শেখ রেহানাই হবেন শেখ মুজিবুর উদ্দারসুত।



শেখ রেহানা, মুক্তিযোদ্ধা মতিবুত হুজুর, শ্রী মনো হুজুর এবং কন্যা শ্রীমতী।

## শেয়ার বাজার কেলেকারী

[illegible]

কখন শক্তিক সিঁড়ি বলা হয়, বর্তমানে শেয়ার বাবল বুদ ভাল বাবল, শেয়ার বাবল কতটুকু, শেয়ার কিনবেন, আর্থী-বজ্রহাটের কলকেন, বটু-বাকু-বাড়ী প্রতিদ্বন্দী নয়টুকু কলকেন শেয়ার কিনতে। শেয়ার কিনতেই লাভ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্রস্বাক্ষরিত। স্বাক্ষর ১ নম্বর টেবিলকমানার  
 প্রতি নকশা। উক্ত মালিকদের সাথে মিটিং-এর ফলাফল হটল মালিকদের আয়োজিত  
 নগরিক মিটিংয়ের একটি প্রশ্ন, শেখার মার্কটি স্বাক্ষরকৃত কত প্রতীক হয়েছে?

মটর সাইকেল আতাইয় ঈদর, অনেক লোক হয়েছে, মতিখিলের বাড়ী।  
আলো দেখে।

শক্তিক সিন্ডিকীত একই কথা, সবাইকে শেয়ার কিনতে বলবেন। শেয়ার কেনা খুবই লাভজনক ব্যবসা। কিনলেই লাভ। একত্রে দিন বেড়ে যাবে, এক পর্যায়ে, প্রতিদিন সহস্রাধিক শেয়ার মার্কেটের প্রকৃত অবস্থা দেখে সহস্রাধিক লাভবান হয়ে তা জানানোর জন্য মটর সাইকেল আরোহীকে শক্তিক সিন্ডিকী দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছেন। মটর সাইকেল আরোহী প্রতি সহস্রা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারী বাসভবন দখলবনে যায়। শক্তিক সিন্ডিকীকে শেয়ার মার্কেটের স্বতন্ত্র অবস্থা জানাতে লাগলো। আর শক্তিক সিন্ডিকী তা শুনেও পর সরকারী বিশ্ব, মার্কোমারী এবং বাঙালি ব্যবসায়ীদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করতে থাকলেন।

সজিই, শেয়ার কিনলেই লাভ। শেয়ার কিনেই করাচী কোন ব্যাপার না। কেনাকাটাই আমল ব্যাপার। অল্প কোনহতে শেয়ার কিনতে পারলে, আগামী কাল আসতে না আসতেই তা চড়া লাভে বিক্রি হয়ে যাবে। শেয়ার কেনা নিজে প্রায় সারা দেশেই হই হই বই বই করে গেছে। বাংলায় প্রচুর ফ্রেন্ড আছে। কিন্তু শেয়ার বিক্রয়কর নেই। ফ্রেন্ডরা শেয়ার কেনার জন্য হাফ-ডিন ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিন মটর সাইকেল আরোহী শক্তিক নিম্বিকীকে জ্ঞানলো, শেয়ার মার্কেটে আজ সবচেয়ে বেশি ফ্রেন্ড এসেছে। ইন্ডেক্সফরম মোড়, হাটপোলা, অভিসার সিনেমা হল ফেরে ফের করে পুরো ব্যক্তিগুলি, শ্রাবণা চন্দ্র, পাব হয়ে নটরডেন কলেজ ছাড়াই গেছে। এই সকল এলাকায় মানবাহন বন্ধ হয়েছে। শুধু ফ্রেন্ডরা

আত্ম ক্রোড়া । বিব্রতভাৱে সেই । শক্তিক শিকিৰী তৰে ভাৱলীয়া বাহনায়ীনেৰে নিচা  
 যপতৰনেৰে ৫ নাথায় বৈঠকৰূপায় শিকিৰীত মিটিং-এ বনলেন । অন্যান্য দিনেৰ  
 ভুলনাৰ আভাৱক মিটিং অনেক বেশি সময় নিজে চললো । অন্যান্য দিনেৰে  
 মিটিং হয় কেৱল দুই বটৰ ভেৰানে আভাৱক মিটিং হলো আৰু সাঙু পাট খট্টা ।  
 পড়ৰ দিনেৰে শেয়াৰ কভাৰক আয়ো বেশি গোক হলো এখং শক্তিক শিকিৰী তৰে  
 ভাৱলীয়া বাহনায়ী বন্ধুদেৱে নিজে দুপুৰ ভিনটা খেৰেই খণ্ডবনে মিটিং-এ  
 বনলেন । মাত্ৰ দশটা পৰ্যন্ত একটোনা মিটিং চললো । মিটিং শেষে ভাৱলীয়া  
 শক্তিক শিকিৰীত লহণে এমন কৰে কৰমৰ্মৰ ও কুতে বৃত্ত মিটিংয়ে বিনয় নিম্ন  
 কৰে মনে হলো এ বিনয় অন্যান্য দিনেৰে মহতা বিদায় নেওয়া নয় । তৰে পৰমিত  
 মতিগৰেৰে শেয়াৰ বাহনায় ৩৩ বিক্ৰমলেনেৰ পাৰাধক্তি লাভ বিক্ৰম শোনা  
 মেন । কিন্তু শেয়াৰ ক্রোড়া কুতে লাগায় বেশ না । শেয়াৰমহী বেশ হামিনা  
 সৰকাৰী বাহনায় ৩৩বনে শক্তিক শিকিৰী ও তাৰ ভাৱলীয়া বাহনায়ীনেৰেও  
 দেখা দেব না



শেয়াৰ শেয়াৰমহীৰ বাহনায় ৩৩ কৰে শক্তিক শিকিৰী তৰে পৰমিত  
 মতিগৰেৰে শেয়াৰ বাহনায় ৩৩ বিক্ৰমলেনেৰ পাৰাধক্তি লাভ বিক্ৰম শোনা  
 মেন

'৭৫-এর ১৫ই আগস্ট শেষ মুক্তিযুদ্ধের রহমান নিহত হওয়ার পর ঐ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কাদের সিদ্দিকীত সঙ্গে যিলে যে সকল মুক্তিযোদ্ধা ২য় কাও যুদ্ধ করেছিল, সেই সকল মুক্তিযোদ্ধা ১২ আগস্ট ১৯৯৬ ঢাকার পুরানা পল্টনে এক বৈঠকে বসে। মারাদিন বৈঠক চলে। বৈঠকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 'অমরতায় আসন্ন' আরেক-এক ভাবে সন্তোষভরে কিতানে সহযোগীতা করা যায় এই নিয়ে দিনভর আলোচনা চলে। হালুয়াঘাট এবং নালিতাবাড়ি থানার প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা বৈদ্যনাথ কদর তাঁর বক্তব্যের কোন জানি বুঝই আরোপ প্রাপ্ত হয়ে বসতে লাগলো, '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। দেশ স্বাধীন করেছি। কিন্তু মরি নাই।' '৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে যুদ্ধ করেছি। যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি। কিন্তু মরি নাই। অবশেষে এক বিধবা বুড়ীকে দিয়ে করেছি। আমলের ঘরে একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। আমি এখন এক বিধবা পুরাতীরা স্বামী এবং এক ছেলের পিতা। আমি আর ভাল-মন্দ কোন কিছুতেই জড়িত হতে চাই না। আশান্বিতা এখন কিছু করতেই চাই। আমার বিধবা স্ত্রী আমার ২য় কাও বিধবা না হয়। আমার ছেলে পিতৃহারা এটিম না হয়।

সম্মা সাতটায় বৈঠক শেষ হলে যে দাপ্তর বাড়ির নিকে বণ্ডানা হয়। নালিতাবাড়ি থানা থেকে আসা বৈদ্যনাথকর, জসিমউদ্দিন, একা একটি হাউজোথাল জড় করে খোনা হারোজা নলে নালিতাবাড়ির নিকে বণ্ডানা হয়ে যায়। পরদিন সকাল ৭টার (সাত) সময় আমার কাছে মুক্তিযোদ্ধা হালেনা মামুদ জামিল মুসোল-এক একটি ফোন আসে। কোনে আমাকে বলা হয় বৈদ্যনাথ কর, জসিম সহ করা হয় (৬) জন মুক্তিযোদ্ধা ফারা গেছে।

কথাটা শুনে হুটী এটাকর্মী করতে হয়ে গেল। কিছুকন কোন কক দেব হলো না। গড় রাতে মানে এখন থেকে ১০/১২ ঘণ্টা আগে যানত সরে নেবা হলো, কথা হলো 'ফারা ফারা গেছে?' এটা কি অনন্তর কথা। নিজেদের একটুখানি সামলে নিয়ে বললাম, 'কি বলছেন? কিতানে কথা গেছে?'

মুক্তিযোদ্ধা হালেনা মামুদ জামিল মুসোল আনাশেন, গড় রাতে ঢাকা পুরানা পল্টনে উলফাত ভাইয়ের অফিস থেকে বিভিন্ন শেষে নালিতাবাড়ি হাওয়ায় সময় সকল বুঝিনা এই ছয় জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়। অর্থাৎ আমলের কাছ থেকে কিনা নেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গিল।

শোক-মুগ্ধের মনটা বিষম ভাবাজনক হলো। বাসা থেকে বেশিরে কাঁচতে কাঁচতে মোতা গণভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শোক সংবাদটা জমালায়। তিনি ভাবনেশহীন ভাবে কনলেন। পরে তাঁর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চলে গেলেন।



মনে মনে একটা ভাবনা ছিল; প্রধানমন্ত্রী যদি তাঁর শব্দ থেকে সাহসনা নেওয়ায় ছাড়া কাজকে নিহত হয়, জন মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের কাছে পাঠান। তাই সুপুর্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে দিগে এসে পুনরায় তাঁকে হয় জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হওয়ার কথা বলানায়।

জনাব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, তাকে কি হয়েছে? প্রতিদিনই কো কত বোকামা হয়ে। এর ঘটনার অনেক পরে বিকল ভাঁয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাবার মুহূর্তনার্থী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু পরিষদ-এর আয়োজনা সভায় যোগদানের জন্য ইজিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট চলে গেলেন। এবং সেখানে তিনি আমার পিতা, আমার মা, আমার জাই বসে কানতে লাগলেন।

অনেক পিতাকে যদি নিজের পিতার মতো মনে না হয়, অনেক মাতাকে যদি নিজের মাতার মতো মনে না হয়, অনেক নতুনকে যদি নিজের নতুনদের মতো মনে না হয়, অনেক শোক দুঃখে যদি নিজের শোক দুঃখে মনে না হয়, তাহলে, এমন হাটপতি, প্রধানমন্ত্রী নেতা দিয়ে দেশের কোন লাভ হবে? মানুষের কোন লাভ হবে? নিজের বাবা-মা জাইদের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কান্না ঘেঁষে শুধু মনে হয় যে আল্লাহ, তুমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কি একেই বিনষ্ট করবে? একেই কামাল করবে? যার কেবলি নিজের ছাড়া অন্যের দুঃখে বিদ্রোহ অনুভূতি হলে না? হে আল্লাহ, তুমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মানুষের জন্য ননকুশোখের কান্না নাও। মানুষকে কান্নাবান্নার কান্না নাও। মানুষের প্রতি অনুভূতি নাও। অপেক্ষা পূর্ণ দুঃখকে নিজের করে গ্রহণের ভৌতিক নাও। আমি।

## ডঃ ডিহী পাওয়া

৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭। মুজিবাবাদের বেস্টন বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডিহী ৮ ডিহী প্রদান করে। এই ডিহীটি ডিহী প্রদানের আগে, ১৯৬ সালের শেষ-প্রান্তে, অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বেস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমিস্ট্রেট জন ওয়েসলিং বাংলাদেশে এসেছিলেন। জন ওয়েসলিং ৪/৫ (জর/পার) দিন বাংলাদেশে ছিলেন। বাংলাদেশে অবস্থানকালে জন ওয়েসলিং ৩ দিন ছিলেন ঢাকায় এবং ১দিন ছিলেন শোণগঞ্জ। ঢাকার অবস্থানকালে জন ওয়েসলিং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনেই থাকতেন। গণভবন থেকেই জন ওয়েসলিং ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখান হতো। শ্রমশক্তি ৩২ নাম্বারে বঙ্গবন্ধু হাদুঘর, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, সংসদ ভবন, মুক্তিযোদ্ধা ইত্যাদি জায়গায় দেখান হলো। এবং ঐতিহাসিক চকুদা মাথা করে জন ওয়েসলিংকে বুঝানো হলো। একদিনের সফরে টুপি পাড়ারও নেওয়া হলো। টুপিপাড়ায় শেখ মুজিবুর রহমান এর মাজার দেখান

হলো। গোপালগঞ্জ নারীরা হাটেরে ঘুরে ঘাপন করার পরদিন আবার ঢাকায় নিয়ে এসে বহুবলু মানুষদের সমস্ত ছবি এবং নিদর্শনগুলো বুধই জলজায়ে বর্ষাখা করে জান জয়েসলিগকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো। তখন বুঝিয়েই দেওয়া হলো না, একেবারে তোঁহা খাখি ন্যায় মুখের করে দেওয়া হলো। জন জয়েসলিগকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বুঝত করে দেওয়ার সত্যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংসদ বিশ্বক উপদেশটা স্মৃতিস্ত সেন ওও। স্মৃতিস্ত সেন ওও জন জয়েসলিগকে সব কিছু বুঝিয়ে বুঝত করে দেওয়ার সত্যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে "ভইর অকল" প্রদানের বিষয়টিও জান ভাবে বুঝিয়ে গিলেন।

দোউন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জন জয়েসলিং নলন এবং খাখি গিলিয়ে অনেক উপদেষ্টকন নিয়ে বাংলাদেশ থেকে চলে গেছেন। কিন্তু গণভবন যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারী বাসভবন এটা সেন ন্যায় জন জয়েসলিংকে বলেন নাই। কারণ জন জয়েসলিং ঘরে গিলেন প্রেসিডি ওও শের টেটা বহুবলু মিউজিয়াম (বাড়িঘর)। টুপিপাড়টা নলনকর প্রানের খাখি আত বিশাল দুর্গের ন্যায় গণভবনটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতার শেখ মুজিবের বাড়ি। আই ওই ফেল্ডারী ১৯৯৭ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে "ভইর অকল" ডিগ্রি প্রদান কারণ দুজবারের বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জন জয়েসলিং যে মানপত্র পাঠ করেন, তার এক জায়গায় লিখেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনাকে আপনার পিতার বিশাল দুর্গের মতো পৈত্রিক দাসভবনে বসি করে ঢাবলেও আপনার উদ্যমকে, আপনার চেতনাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। বিশাল দুর্গের প্রকা পৈত্রিক বাড়ি ও তার উত্তরাধিকারের প্রকা আটকে থানললেও ..... ইত্যাদি-ইত্যাদি।

জন জয়েসলিং তার মানপত্রে যে বিশাল দুর্গের মতো পৈত্রিক বাড়ির উল্লেখ করেছেন সেটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতার বাড়ি নয়, সেটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারী বাসভবন গণভবন। একমাত্র গণভবনেই বিশাল দুর্গের মতো অফিস শেখ মুজিবর রহমানের বিশাল দুর্গের মতো কোন বাড়ি কোথাও নেই।

## প্রথম আমেরিকা সফর

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা এই প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছেন। আতীয়ত্বজনের এক বিশাল সহর নিয়ে সন্ধ্যার আগেই গণভবন থেকে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের উল্লেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হওয়ারা হয়ে গেলেন। তিনি গিলিট সময়ে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ডি, ডি, আই, পি লাউন্ড্রে গৌছলেন। এবং আতীয়ত্বজনের কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে দীর্ঘকাল চা ও নানান পদের নাস্তা খেতে লাগলেন, হাসি টাটারে মেতে থাকলেন। মন্ত্রী সভার সদস্যগণ, গিলি বাহিনী প্রধান গণসং ইক পদত সাময়িক বেসামরিক কর্মকর্তা

এবং বিশিষ্ট নাগজিকরণ নিয়ম বন্দরের ডি. ডি. আই. পি টারমার্ক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে বাধ্যতামূলক। এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যবহার কুমারের ডাইরেক্টর ছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ. পি. এস. বাহাউদ্দিন নাসিম নতুন দফতর স্থাপন করার জন্য, বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষকে, প্রধানমন্ত্রীকে বহন করার চার্জ বিমানটিতে প্যাসেঞ্জার টারমার্কের লাউঞ্জ) নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ ছিল। বাহাউদ্দিন নাসিম বললো, আমাদের প্রধানমন্ত্রী একই অতি লম্বাঙ্গ যে, ডি. ডি. ডি. ডি. আই. পি টারমার্কের পরিবর্তে সম্ভাব্য ধারীদের (প্যাসেঞ্জার) টারমার্ক (লাউঞ্জ) দিয়ে বিমান উঠে এক নতুন দফতর স্থাপন করবেন।

কাজেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যবহার কুমারের ডাইরেক্টর ছিল এ. পি. এস. নাসিম বিমানকে প্যাসেঞ্জার টারমার্ক নিয়ে যাওয়ার হুকুম ছিল। যথার্থি বিমান কর্তৃপক্ষ বিমানের পাইলটকে ঐ নির্দেশ দিলে, পাইলট প্যাসেঞ্জার টারমার্ক বিমান নিয়ে এলো। একই পক্ষে এলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যবহার আরেক কুমারের ডাইরেক্টর ছিল এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীফ সিকিউরিটি নজির আহমেদ নজির। নাসিমের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর বিমান প্যাসেঞ্জার টারমার্ক নেওয়া হয়েছে এই কথা কুমার নজির বললো, প্রধানমন্ত্রী ডি. ডি. আই. পি. টারমার্ক নিয়ে বিমানে উঠবে, বিমান ডি. ডি. আই. পি. টারমার্ক ফেরত আনা হোক।

যথার্থি বিমানকে ডি. ডি. আই. পি টারমার্ক ফেরত আনা হলো। কিছুক্ষণ পরে প্রধানমন্ত্রীর এ. পি. এস. বাহাউদ্দিন নাসিম এসে তখন তার চাচার ডাইরেক্টর নজির বিমান ডি. ডি. আই. পি টারমার্ক ফেরত এনেছে। তখন নাসিম বিমান কর্তৃপক্ষকে বললো, আমি প্রধানমন্ত্রীর এ. পি. এস. আমি প্রধানমন্ত্রীর সংরক্ষণ গড়ে তুলি, আমি প্রধানমন্ত্রীর প্রোগ্রাম উন্নয়ন করি। আপনার কি আমার চাইতে বেশি বুঝেন?

সমস্ত সংবাদিকদের আমি প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে পাঠিয়েছি। আমি যা বলি সেইভাবে কাজ করুন। প্রধানমন্ত্রীর বিমান প্যাসেঞ্জার টারমার্ক পায়ন। বিমান কর্তৃপক্ষের যৌথিক নির্দেশে পাইলট আবার বিমান প্যাসেঞ্জার টারমার্ক নিয়ে এলো। প্রধানমন্ত্রীর এ. পি. এস. বাহাউদ্দিন নাসিমের চাচার ডাইরেক্টর প্রধানমন্ত্রীর চীফ সিকিউরিটি নজির আহমেদ নজির প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিমান রেডি বসে এসে, বিমান আবার প্যাসেঞ্জার টারমার্ক লাগানে হয়েছে তখনই হাবাকজা কুমার কাটা বলে গালাগালি দিতে দিতে কয়েক নির্দেশে বিমান সরানো হয়েছে জিজ্ঞাস করলে নাসিম বললো, আমার নির্দেশে বিমান সরানো হয়েছে। আমি বিমান প্যাসেঞ্জার টারমার্ক নিয়েছি।

নজিব বললো, দুই বিমান সরাসরি কে?

আমি চীফ সিকিউরিটি, আমার নির্দেশে বিমান চলবে।

নাসিম বললো, আমার নির্দেশে বিমান চলবে।

নজিব বললো, তেজ বেশি কথা বলছি না কারণ হইয়া যাইব।

নাসিম বললো, আমি কি তোমার কথা কামুক খাই যে, আমাকে উড়  
বেঁধে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাবার দুই ছুফাতো ভাইয়ের দুই ছেলে এ. পি,  
এন বাহাউদ্দিন নাসিম এবং চীফ সিকিউরিটি নজিব আহমেদ নজিবের মধ্যকার  
কণ্ঠস্বর মূখে বিমান কর্তৃপক্ষ অসহ্যের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইল। এমনভাবে মিনিট  
বিশ পচিশের চলে গেল। তৃতিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমানে উঠার জন্য ডি,  
ডি, আই, পি রেডি কুম থেকে বাইরের এসে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং বললেন, কি  
হাপাস আমাকে একনা বিমানে ফুলছে না কেন?

দুই সাতাতো ভাই নজিব নাসিমের কণ্ঠস্বর কামালো, দুই সাতাতো  
ভাইয়ের চাইতেও অনেক অনেক বেশি কুমতা মর ব্যক্তি, বলতে গেলে কুমতার  
নীচের তিন/চার (৩/৪) নজিব ব্যক্তি, তিনি সাতাতো নজিব-নাসিমের হাপাসের  
কুমতের করে না, কিন্তু যাকে দেখলে নজিব-নাসিম ভয়ে এবং কৌশলগত  
কারণে নেতিয়ে পড়ে, পাগলের মতো টাকা-পয়সার নিকে জেটা ছাড়া আর অন্য  
কোন কাজ নেই যার, তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাতাতো ভাই (শেখ  
নাসিরের বড় ছেলে) শেখ হেলাল এম.পি এসে উপস্থিত হলো। নজিব, নাসিম  
ভয়ে এবং কৌশলগত কারণে নেতিয়ে গেল। শেখ হেলাল এম. পি বললো,  
প্রধানমন্ত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছে আর একনা বিমানের ব্যবস্থা হক নাই? কন, ডি, ডি,  
আই শিতে বিমান পাশান।

কর্তৃপক্ষ ডি, ডি, আই পি টারমার্ক বিমান দেওয়ার মৌখিক নির্দেশ দিলে  
ডি, ডি, আই, পি আর প্যাসেঞ্জার টারমার্ক কত বার বিমান মেওকা এবং জানার  
পরিপ্রেক্ষিতে এবার বিমানের পাইলট ডি ডি, আই, পি এবং প্যাসেঞ্জার  
টারমার্কের মাঝখানে বিমান রেখে নিয়ে কর্তৃপক্ষকে বললো, আমাকে লিখিত  
দিয়ে হবে। লিখিত ছাড়া বিমানের চাক একবার ও বুঝবে না।

এবার বিমান কর্তৃপক্ষ আরো বিগড়ে গড়লো। কর্তৃপক্ষ লিখিত দেওয়ার পর  
পাইলট ডি, ডি, আই, পি টারমার্ক বিমান নিয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার  
উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। যদিও এই সবটুকু কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার  
যাত্রা শুরু করতে খটা দেড়েক দেরী হলো। এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা  
অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর উপর অসন্তোষ  
প্রকাশ করলেন আ বুঝা গেল না।



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিদ্যায় সামান্যে আসা সকল মন্ত্রী, চিনি কাহিনী প্রধান, উচ্চ পদস্থ সামরিক-বৈমানিক কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ যাত্রা করায় এই বিলম্বের সময় চেতনার মধ্যে নীড়িয়ে ছিল। পরের দিন সৈশবের সমস্ত পত্র-পত্রিকায় নানান ভাষায় প্রধানমন্ত্রীর যাত্রা শুরু করতে বিলম্বের সংবাদ পরিবেশন করলে। কিন্তু কোন যাত্রা বিলম্ব হলো, যা কোন পত্রিকাতেই জানা গেল না। প্রকাশ করা হলো না। শুধু বিলম্ব হলো এটাই প্রকাশ করা হলো। শুধু তাই নয়, প্রকাশিত এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক, কলাম লেখক, আবেদন খান ভোক্তার কাগজে “প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা কি বিপ্লিত” শিরোনামে ধারাবাহিক ভাবে সারেকমিন তদন্ত দিগলেন। আবেদন খান ফার প্রকিবেদনে বিমানের অভ্যন্তরে ভাঙলোনের সকল পাওয়ালহ আরও কত কিছু পেলে। কত কিছু লিখলেন। বিমান প্রশাসনের অনেক বন বদল হলো। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যাত্রা বিলম্বের প্রকৃত কারণ আরও অনেক জনের জননে এলো না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমেরিকা সফর করে যুক্তরাষ্ট্রের বোইন বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে উত্তর অফ ৭ ডিগ্রির সাথে তাঁর একমাত্র ছেলে শেখ রেহানকে সঙ্গে, কিছুতে (পৌত্রিক সূত্রে) অর্থেক জাপ নেওয়ার থাকাপ্রাক ব্যবস্থার শর্তে সঙ্গে নিয়ে এলেন। জাপ-বাংলায় নিয়ে দুই বোনের স্বল্পের অবস্থান ঘটিয়ে শেখ রেহানা কাশিয়াতের দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশে আসার ফিরে এলেন। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত তহবিলে যা কিছু জমা হবে তার সব কিছুই শেখ রেহানায় হাত দিয়া হতে হবে। এই শর্তে শেখ রেহান দেশ ফিরে এলেন।

## যুদ্ধ বিমান ক্রয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাশিয়াত বঙ্গবন্ধু তনয় শেখ রেহান তার স্বামী শফিক সিদ্দিকীকে সঙ্গে নিয়ে এক বিহরলে প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন লগতবনে এসে প্রধানমন্ত্রীকে রাশিয়ার মিগ-২৯ জোনাফ বিমান (যুদ্ধ বিমান) ক্রয় করার পরামর্শ দিয়ে বললেন, এই যুদ্ধ বিমান ক্রয় করলে উত্তর পাকিস্তান কোয়েরাও (ঢাকা কান্টনমেন্টের সৈনিকেরা) পুলিশ বাকর এবং আগর্য কাব্যতর মানান না এটাও কিনাথ মনে করবে। উপস্থিত মন্ত্রী কাইফজা আরোহী বললেন, স্ববদায় নেত্রী (প্রধানমন্ত্রী) এই কাজও করবেন না। সৈশবের কোটি কোটি মানুষ বেকার, যুদ্ধ বিমান ক্রয় না করে, যে টাকা দিয়ে যুদ্ধ বিমান ক্রয় করবেন, সেই টাকা বেকারদের কর্মসংস্থানে ব্যয় করবেন।

শেখ রেহানা ও তার স্বামী শফিক সিদ্দিকীর চেহারায় কেতাবে ভেতরে প্রচল জাপ হওয়ার ছাপ ফুটে উঠলো। এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, বিমান কো বাকিবে কিনবো।

মটির সাইকেল আরোহী বললো, তুমিই বাকিও কিনিবে, এই টাকা তে এদেশকেই শোধ করতে হবে। নেত্ৰী (প্রধানমন্ত্রী) একটা কথা খেয়াল রাখবেন, যদি বেলাজনের কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করতে পারেন, দেশের উন্নতি করতে পারেন, তাহলে এদেশের মানুষ তুমি আপনারও-ই না, আপনার লাভি পুত্রিত্বও অর্জন করে রাখবে।

বসবন্ধু তন্যা শেখ রেহানা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে বললেন, জেমার মাঝে কি একটু একাকী কথা বলা যাবে? না তোমার লোকজন কথাও মধ্যে কাঁ-হাত দিতেই থাকবে?

মটির সাইকেল আরোহী বাইরে চলে এলো।

কথা হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আর ছোট্ট কোন শেখ রেহানা ও তার স্বামী শক্তিক সিন্ধিকী বাংলাদেশের মধ্যে একটি দীনহীন দলীল দেশের কর্মচার হয়ে কোন বুদ্ধ বিমান ক্রয় করেন? ভারতের সাথে বুদ্ধ ক্রয়ও জায়া? মনস্তাত্ত্বিক (সাইকেলজিক্যালি) 'তাবে শেখ হাসিনা শেখ রেহানা গথেরা কি কখনই ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের কথা চিন্তা করতে পারেন? নিশ্চয়ই না। শেখ পুত্রিত্ব কখনই ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের কথা চিন্তা করতে পারে না। বরং শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা'রা কনা সর্বদা ভারতকে তাদের ব্যক্তিগত ও পরিবারগত অভিমানকেই মনে করেন। তারা সব সময়ই ভারতের রাজনীতিবিদদের বিপক্ষে করে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে পিতৃভুলাই মনে করেন। ভারতের সাথে বুদ্ধ করবেন না। ভারতেরও বুদ্ধ বিমান ক্রয় করেন, বহুসংখ্যক 'কি' তাহলে কি হাসিনা-রেহানা গথেরা জানেন না যে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে প্রায় সবসময়ে দলীল দেশ? এদেশের মানুষের নিজে আধপেট আহর জোটে না? বৃত্ত নেই, শিক্কা নেই, কানছান নেই, এমন কি তারা জানেন না? নিশ্চয়ই জানেন। তারা সবই জানেন। জায়া এটাও নিশ্চিত যে, অর কাই হোক শেখ হাসিনা-রেহানা'রা তাদের অভিভাবক ভারতের বিরুদ্ধে বুদ্ধ ক্রয়ও তারা কখনই বুদ্ধ বিমান ক্রয় করবেন না। তাহলে তারা বুদ্ধ বিমান ক্রয় করেন কেন? একটা কথা মনে রাখতে হবে, দেশের প্রতিরক্ষা খাত হচ্ছে এমন একটা খাত, যে খাতেও খয় (ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্ক) সম্পর্কে মহান জাতীয় সংসদেও কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন করেবেই প্রতিরক্ষা খয় সম্পর্কে কোথাও কোন প্রশ্ন কোলা যাবে না। তুমি আমাদের দেশেই না। অব্যাহা দেশেও একই নিয়ম। সেই জন্যই ভারতের খয়ত প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধির বোম্বার্স কেল্লাবিতে স্পষ্ট জড়িত থাকে বড়ো ভারতের পার্লামেন্টে এই নিয়ে ভেদন হই-ছোড় হয়নি। এই প্রতিরক্ষা খাত গোলকই বর্তমান নিজে সবসময়ে বেশি দলীতি হচ্ছে। প্রতিরক্ষা খয়ের ফেহত কোন জবাবদিহিতা নেই। সেহেতু এই

বাতেই দুর্নীতি করা বা কমিশন নেওয়া জরুরি হয়। এখন হচ্ছে, ভারতের নিকটে মুক্ত করা হবে না, তথাপি শেষ হাসিনা, শেষ রেহানা গং কর্তৃকনে মুক্ত অকার্যকর পুরনো নেতৃত্বের রাশিয়ান মিশন ২৯ মুক্ত বিমান কোন করা করেন? এর উত্তর-অধু কমিশন। অধু কমিশন পাওয়ার জন্যই এই অত্যাধুনিক যুগে অত্যাধুনিক কার্যকর ডিটি বিমানের পরিবারে, অকার্যকর সেতবে পুরোনো ধাতা ভাতা বোম্বার্ড বিমান করা করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার কাশিয়ার শেখ রেহানা এই রকম-এক একটি ছিল-এ কম করে হলেও শত শত ফেটি টাকা পেয়ে থাকেন।

## কাদের সিদ্দিকী বনাম শেখ হাসিনা

দেশের মাটিতে বোকামি একমাত্র যিনি কাদেরীয়া কাহিনী নামে বিশাল এক মুক্তিযোদ্ধার গড়ে তুলেছিলেন, বৃহত্তর টাঙ্গাইল জেলা, বৃহত্তর মহম্মদসিং জেলা এবং বৃহত্তর পাবনা জেলার অধিকাংশ অঞ্চল তিনি নিজের দখলে ও নিয়ন্ত্রণে রেখে সৃষ্টি করেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত অঞ্চল। দেশ ত্যাগ করে ভারতে না গেয়ে বৃহত্তর টাঙ্গাইল, মহম্মদসিং, পাবনা ইত্যাদি অঞ্চল ছাড়ে গড়ে তোলা হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। এই স্বাধীন বাংলাদেশের ইমানদার মুক্ত অঞ্চলে পাকিস্তানী ইমানদার বাহিনী কখনোই ঢুকতে পারেনি। পাকিস্তানী খান সেনারা যখনই মুক্তাঞ্চল প্রবেশের চেষ্টা করেছে, তখনই প্রচণ্ড নার ঘেরে ফেরত এনেছে। এই মুক্তাঞ্চল মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি গড়ে তোলা হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের বৈষয়িক প্রশাসন। এখানে মুক্তের সাথে চাকরী কাজের (স্বজনা টেক্স) আদায়। নিয়োগ দেওয়া হতো রক্ত কর্মচারী (চৌকিদার, দফতরার জনিগদার, এস ডিও) ও কর্মকর্তাদের। গড়ে তোলা প্রচলিত বিচার বিভাগ। সাংস্কৃতিক বিভাগ। অধু বাংলাদেশেরই নয়, সারা বিশ্বের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এমন নাজির বুজে পাওয়া যাবে না। মুক্তিযুদ্ধের বিশ্ব ইতিহাসে নাজিরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন তিনি, তিনি হলেন মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তির নায়ক বঙ্গবীর আবুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্লোক যাকে বাবা সিদ্দিকী বলে জানতো। যার নাম শুনে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর জেনারেলদের পর্যন্ত আতঙ্কিত হবার হয়ে তোলে।

১৯৭৬ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সপত্নিভাবে হত্যা করলে একমাত্র বঙ্গবীর আবুল কাদের সিদ্দিকীই এই হত্যার প্রতিবাদ করে। শেখ মুজিব হত্যার পর কাদের সিদ্দিকী নিজেকে শেখ মুজিবের চতুর্থ পুত্র ঘাটা করে, '৭১-এর ন্যায় পুনরায় দুই তরু করেন। এই যুদ্ধ ছিল কাদের সিদ্দিকীর জীবনে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচাইতে

বড় রাজনৈতিক কুল। এই যুদ্ধে কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে জনগনের অংশ গ্রহণ ভেদে দু'রকম কথা, সামান্যতম সমর্থনও ছিল না। '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট শেষ মুজিব হত্যাকাণ্ডকে জনগণ সমর্থন করেছিল কিনা যদিও এটা গবেষণার বিষয়, তথাপি এটা নিশ্চিত কথা যায় ঐ হত্যাকাণ্ড জনগণ নিতবে গ্রহণ করেছিল। সেই জন্যই শেষ মুজিব হত্যার প্রতিবাদে কাদের সিদ্দিকীর ২য় তার যুদ্ধ জনগণ প্রত্যক্ষান করেছেন। শেষ মুজিব হত্যার প্রতিবাদে যুদ্ধে জনগণ সামিল হওয়া হয়ইনি, এবং যে-রাজ্যের ভিতরক ঘোষণা কাদের সিদ্দিকীর সাথে যুদ্ধে অংশ নিমোছিল, জনগণ তাদের বাংলাদেশ সরকার ও সেনাবাহিনীর কাছে পকিয়ে দিতে চেয়েছিল। ঐ যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শেষ মুজিব হত্যা পতনভী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের আপামর জনগণের বিরুদ্ধে।

ফলে '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বিজয়ী হলেও, '৭৫-এর শেষ মুজিব হত্যার প্রতিবাদে যুদ্ধে কাদের সিদ্দিকী এবং তার বাহিনী গোচরীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কাদের সিদ্দিকী নির্বাসনে আসতে চলে গেলে শেষ মুজিব কন্যা শেষ হাসিনা তাতে ধর্মের ভাই ডাকে। সেই থেকেই তাদের ধর্মের ভাই মোদের সম্পর্ক একেই গভীর ছিল যে, কাদের সিদ্দিকী মাংস খেতেন না বিধায় শেষ হাসিনা ইলেকট্রিক হিটাত এবং মাছ কিনে কাদের সিদ্দিকী যে হোটেলে থাকতেন সেখানে গিড়ে নিজে রান্না করে কাদের সিদ্দিকীকে বাওয়াতেন। শেষ হাসিনা প্রকাশ্যেই বলতেন একমাত্র কাদের সিদ্দিকী ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই। এবং কাদের সিদ্দিকীই তার পিতা শেষ মুজিবের একমাত্র উত্তরসূরী। শেষ হাসিনা বলতেন মারা জীবন কাদের সিদ্দিকীর বি-চাকরপীর কাজ করায় কাদের সিদ্দিকীর ছব্ব তিনি শেষ করতে পারবেন না।

১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেষ হাসিনা ভারত থেকে বাংলাদেশ ফিরে আসার প্রাক্কালে কলকাতা বঙ্গবীর বিমান বন্দরে যতান, দেশে ফিরে তার একমাত্র কাজ হবে বঙ্গবীর উত্তরসূরী তার ধর্মের ভাই কাদের সিদ্দিকী ও তার সোকাজনকে দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। কিন্তু দেশে ফিরে এসে শেষ হাসিনা তার ধর্মের ভাই শেষ মুজিবের উত্তরসূরী কাদের সিদ্দিকীকে চিরিয়ে আনতে কার্যকর কোন ব্যবস্থা না নিলে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর সহধর্মিণী নাসরিন সিদ্দিকী "বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম দলেশ অত্যাচারিত সংগ্রাম প্রতিদ্বন্দ্ব" নামে একটি নতুন সংগঠন করে ক্ষতের ঘোণাতা ও নক্ষতার সাথে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ঝটিকা সফর করে কাদের সিদ্দিকীকে দেশে ফিরিয়ে আনার পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করলে, শেষ হাসিনা এটাকে ভাল দৃষ্টিতে না দেখে চেনেলত্র হিসেবে মনে করেন এবং নাসরিন সিদ্দিকী ও ঐ সংগঠনকে কুদৃষ্টিতে দেখতে থাকেন। শেষ হাসিনা প্রকাশ্যে কিছু না বললেও ভেতরে ভেতরে তার



সংশয়িত আওয়ামী লীগকে কাদের সিদ্দিকীর এই সংশ্লিষ্টতার সাথে সম্পর্ক না রাখার  
একটি বিরোধিতা করার নির্দেশ দেন।

১৯৯০ সালে তীব্র শব্দভাষ্যে সার্বজনীন হৈরাচাত ভোটারের ভোটাভাষ্য  
মোহাম্মদ এরশাদ-এর পতন হলে, ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে শেখ  
মুজিবের চতুর্থ পুত্রের দাবীদার শেখ হাসিনার ধর্মের ভাই, বহরীর কাদের  
সিদ্দিকী বীর উত্তম বাংলাদেশে দিতে আনার চুক্তি দিকান্ত ও প্রকৃতি নেন। এবং  
যথাযথিতি শেখ হাসিনার সাথে টেলিফোনে কাদের সিদ্দিকী তাঁর স্বদেশ  
প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে আলোচনা করেন শেখ হাসিনা সরকারি কাদের সিদ্দিকীর  
বালেশ্বর প্রত্যাবর্তনের বিরোধিতা করেন। এরপরও কাদের সিদ্দিকী স্বদেশ  
প্রত্যাবর্তনে দৃঢ় থাকলে শেখ হাসিনা তাঁর দল আওয়ামী লীগকে কাদের  
সিদ্দিকীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কর্মসূচী জুড়ুল (মারোটাস) করার নির্দেশ দেন।

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে বহরীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম স্বদেশ  
প্রত্যাবর্তন করলে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে  
স্বাগতনা দিলেও শেখ হাসিনাধর্ম আওয়ামী লীগের কোন নেতা-কর্মী এই লাইবেরার  
যোগদান করেননি এবং এখন থেকেই শেখ মুজিবের চতুর্থ পুত্রের দাবীদার,  
শেখ হাসিনার ধর্মের ভাই, কাদের সিদ্দিকীর সাথে শেখ হাসিনার প্রকাশ্য বিরোধ  
ভরু হয়। এরপর থেকে শেখ হাসিনা তাঁর ধর্মের ভাই কাদের সিদ্দিকীকে এক  
মুহুর্তও সহ্য করতে পারতেন না। শেখ হাসিনা প্রকাশ্যেই বলতেন আমি আমি  
বলেই কাদের সিদ্দিকী আছে। আমি না থাকলে কাদের সিদ্দিকীও থাকবে না।  
কাদের সিদ্দিকীর অবস্থা হবে ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির পুত্র  
লক্ষ্য গান্ধীর স্ত্রী মেনকা গান্ধীর মতো। বর্তমান ইন্দিরা গান্ধী ছিল, মেনকা  
গান্ধীও অতক্ষণ ছিল। এখন ইন্দিরা গান্ধীও নাই, আর মেনকা গান্ধীও বরং  
নাই। আমি না থাকলে কাদের সিদ্দিকীও ঐ অবস্থা হবে। কোন কবর থাকবে  
না।

আর কাদের সিদ্দিকীও মাশআল্লাহ্ কখনই শেখ হাসিনাকে নেত্রী বলে  
স্বাগতেন না। স্বীকৃতি কবলেন না। কাদের সিদ্দিকীর ঐ একই কথা, শেখ হাসিনা  
আমার বোন আমি শেখ হাসিনার ধর্মের ভাই, আমিই শেখ মুজিবের প্রাগৈতিহাসিক  
উত্তরসূরী। নামাযের কারণে বিশেষত কৌশলগত কারণেই শেখ হাসিনা কাদের  
সিদ্দিকীকে আওয়ামী লীগে রাখেন, আওয়ামী লীগের এক, পি বানান। কাদের  
সিদ্দিকীও একই কারণে আওয়ামী লীগে থাকেন, আওয়ামী লীগের এক, পি হন।  
শেখ হাসিনার ভাবনা হলো কাদের সিদ্দিকীকে আওয়ামী লীগ থেকে বের করে  
দিলে আওয়ামী লীগের কিছু ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া কাদের সিদ্দিকীও  
প্রকাশ্যে সরকারি উঠে পড়ে তাঁর (শেখ হাসিনার) দেহভেতর বিরোধিতা লিখ  
হয়ে পড়বে। আর চেয়ে নিজেই পৈত্রিক দল আওয়ামী লীগে বেবেই কাদের  
সিদ্দিকীকে পড়িয়ে দিতে হবে। কাদের সিদ্দিকীকে পড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই  
শেখ হাসিনা কাদের সিদ্দিকীকে আওয়ামী লীগে রেখেছেন। কাদের সিদ্দিকীও

আশাত্ত নিম্নে আওয়ামী লীগে অংশগ্রহণ করার কৌশলগত অবস্থান নিম্নোক্ত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হেড কয়ার ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় চরিতার্থ করার জন্য কাদের সিদ্দিকীর বাড়ীতে পুলিশ পাঠানোর পরিকল্পনা করেন। মটর সাইকেল আরোহী এর বিরোধিতা করে বলেন, সামান্যতম কুতূহলতা বোধ থাকলে আপনি এটা করতে পারেন না। কুলে যাবেন না, আপনার পিতা-মাতা-ভাইদের মেয়ে যখন সিঁড়িতে লাশ ফেলে রেখেছিল, তখন সাধা পুলিশীতে একমাত্র কাদের সিদ্দিকী বাড়ী অন্য আর কেউ এর প্রতিবাদ করেনি। আর আজ আপনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে হাও বাড়িতে পুলিশ পাঠালে তা হবে চরম অকৃতজ্ঞতার কাজ। আপনি এত বড় অকৃতজ্ঞের কাজ করতে পারেন না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, ওর (কাদের সিদ্দিকীর) ভাইরা সন্ত্রাসী। ওর ভাইদের দরার জন্য ওর বাড়ীতে পুলিশ যাবে।

মটর সাইকেল আরোহী বললো, কাদের সিদ্দিকীর ভাই মুরাদ সিদ্দিকী ও আজাদ সিদ্দিকী সন্ত্রাসীই হোক আর মাই হোক, তারা আপনার অমলে কোন সন্ত্রাস করেনি, কোন অপরাধ করেনি।

অতীত দু'দিনে যখন আপনার পিতা-মাতা-মিহত করেছিলেন, কাদের সিদ্দিকী, নতিফ সিদ্দিকী দেশের বাইরে নির্বাসনে ছিলেন, শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের নাম নেওয়ার কোন লোক ছিল না তখন নিম্নোক্ত দৈবী পরিকল্পনা মুরাদ সিদ্দিকী ও আজাদ সিদ্দিকী এই দুই ভাই টাঙ্গাইলের মাটিতে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের নাম নেওয়ার জন্য মুরাদদের সংগঠিত করতে করতে এবং শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ বিরোধি প্রশাসনের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হতে এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীদের স্বাক্ষর নাম চলে যায়। এবং বহু মাঘনা তাদের বিকৃত হই। যেহেতু প্রশাসন দুর্নীতিপরায়ণ তাই কঠোর বাধ্যতা না নিয়ে প্রশাসন এদের সাথে তাগতাবিহীন হলে যায়। তাছাড়া আজাদ-মুরাদ এখন আর কোন দরনের অপরাধের সাথে যুক্ত নয়। এসব কোন কিছুই আপনার জ্ঞান না। আপনি সবই ভালভাবে জানেন। আপনার শাসন আমলে তরা কোন দরনের বেসাইনি কাজের সাথে জড়িত থাকলে খেপ্তার করে জেলে পাঠিয়ে দেওয়ার কঠোর হুঁশিয়ারী দিয়ে তাদের সতর্ক করে দেন।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, না, কাদের সিদ্দিকীর বাড়ীতেই পুলিশ পাঠিয়ে জনের দরতে হবে।

মটর সাইকেল আরোহী বললো, শুধুমাত্র হেড কয়ার জন্য যদি কাদের সিদ্দিকীর বাড়ীতে পুলিশ পাঠান, তাহলে পুলিশীতে কুতূহলতা বলে কিছু থাকবে না।

রাজ্যীয় কয়েক হুঁশি সাধা নিতে পার না, তবুওবর্তে এই কথা বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেহুসলমে চলে গেলেন এবং কিংবদন্তি কাদের সিদ্দিকীর বাড়ীতে পুলিশ পাঠানেন।

# বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের রাষ্ট্রপতি হওয়া

২৩শে জুন '৯৬, প্রচলনকারী হিসেবে শপথ নেওয়ার আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার কনের একজনকে মনোনীত রাষ্ট্রপতি করা নিয়ে বেশ বিপাকে পড়ে গেলেন। কারণ যে নেতাকেই তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ায় প্রস্তাব করেন সেই নেতাই কোঁচ কোঁচন : কোন কোন নেত্রী আমার সহচরনী শেখ হাসিনার পা জড়িয়ে ধরে নেতারা মনোনীত রাষ্ট্রপতি হওয়ার থেকে মুক্তি চান। এই অবস্থায় মতিবুর রহমান রেজু ও মিসেস মতিবুর রহমান রেজু (মোনা) সুপ্রীম কোর্টের সাধারণ প্রধান বিচারপতি ১৯৯০ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে মনোনীত রাষ্ট্রপতি করার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে এই বলে পরামর্শ দেন যে, কেউ-ই যখন রাষ্ট্রপতি হয়ে উঠুক নয়, তখন বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকেই মনোনীত রাষ্ট্রপতি করেন। সাধারণ মানুষের কাছে সাহাবুদ্দিন আহমেদ-এর একটি জনপ্রিয়তা আছে, গ্রহণযোগ্যতা আছে। তাকে রাষ্ট্রপতি করলে আপনার (শেখ হাসিনার) জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পাবে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, না। সাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি করা যাবে না। কারণ আমি (শেখ হাসিনা) চকন '৯১ সালের নির্বাচনের পর বঙ্গবন্ধুকে নির্বাচনে মুক্তি কার্যক্রম হয়েছে, তখন সাহাবুদ্দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসেবে আসেন। জিয়ার সাথে সুপ্রিমিয়ার বণেছিল নির্বাচন সম্পূর্ণ বৃষ্ ও নিরপেক্ষ হয়েছে। এইটা কোন বিচারপতি হলে? এইটাকে রাষ্ট্রপতি করলে না।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রথমে জিতুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব করলেন। জিতুর রহমান বললেন, নেত্রী আপনি আমাকে করা করে আওয়ামী লীগের জনগণের সেরেকটরী বানিয়েছেন। এখন যদি কথা করে আমাকে রাষ্ট্রীয় কোন এককিউটিভ (নির্বাচী) পদে না দেন তাহলে নগের সেরেকটরী হিসেবে আমার কোন চরুইই থাকে না। কোন মূল্যই থাকে না। আমাকে করা করে রাষ্ট্রপতি না বানিয়ে আপনার কাছে-কাছি একটি মন্ত্রণালয় দেন, যাকে আমি সব সময় আগলায় করছি থাকতে পারি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এরপর প্রেনিভিয়ার সদস্য সালাউদ্দিন ইউসুফকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব করলে সালাউদ্দিন ইউসুফ বলেন, নেত্রী, আমার স্বাস্থ্য ভাল না।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, বেশ কো রাষ্ট্রপতি হন। রাষ্ট্রপতিত কোন কামকাজ নেই, শুধু কসে কসে সরকারী পরচে আগ্রাম আবেশ করবেন।

এই কথা শুনে সালাউদ্দিন ইউসুফ সোজা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পা জড়িয়ে ধরে বলেন, নেত্রী আমার এলাকায় জনগণের জন্য কিছু কাজ করার সুযোগ দেন।

এই সুযোগে মাক্কায রহমান কেই ও মিসেস মতিহুর রহমান কেই (ময়না) সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে নতুন রাষ্ট্রপতি করার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে পুনরায় চাপ দিতে থাকে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এরপর প্রেসিডেন্সি মন্ডল কর্তৃক পুনরায় রাষ্ট্রপতি মণ্ডলী আদালত সামান্য আত্মদায়ক রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব করলে আদালত সামান্য আত্মদায়ক বলেন, নেত্রী আমাকে রহম করুন, না! করে আমাকে শেখ বাকেরে বাতিল করবেন না। আমি বঙ্গবন্ধুর ফরেন মিনিষ্টার (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) ছিলাম। আমাকে কাজ করার সুযোগ দেন। আমি সেখানে সে বঙ্গবন্ধুর মণ্ডলীর কত যোগ্যতা ছিল।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি করার জন্য কতকিছুই বুঝে পাচ্ছিলেন না। অর্থাৎ যাকেই রাষ্ট্রপতি করতে চান তিনিই মাক্কা চোয়ে পাচ্ছিলেন যান। এমনই সময় এসে উপস্থিত হলেন ৯১ সালের আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী বর্তমানে খানমজি মোহাম্মদপুর এবং আওয়ামী লীগ এম.পি হাজী মকবুল হোসেন। হাজী মকবুল হোসেন এম.পি বঙ্গবন্ধু হলো আমি ৯১ সালে আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী ছিলাম। আপনিই (শেখ হাসিনা) আমাকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করেছিলেন। এখন কেই রাষ্ট্রপতি হতে চাচ্ছেন না, তখন আমাকেই রাষ্ট্রপতি করে। বইলে মণ্ডলী করেন। কিছু একটা করেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু, না, আপনাকে কিছুই করা হবে না। মনে সেই, ৯১-এ আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। আমার সম্পর্কে নানা কথা প্রকাশ করেছিলেন। আপনাকে কিছুই করা হবে না। এম.পি করছি এটাই ফল।

এই পরিস্থিতিতে ২১শে জুন ১৯৯১ মতিহুর রহমান কেই ও মিসেস মতিহুর রহমান কেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে দুজনের রাষ্ট্রপতির জো করে বসে আদালত আবেদন করা আর চাপ দেওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই। রাষ্ট্রপতির হাতে কোন নির্ধারী ক্ষমতা নেই। মণ্ডলী শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি হলে নাটক পুতুল। কেহবে আপনি নাচাবেন সেইভাবেই রাষ্ট্রপতিতে নাচতে হবে। এই সুযোগ আপনি হাত ছাড়া করেন কেন? সাবেক রাষ্ট্রপতি, বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে নতুন রাষ্ট্রপতি বানিয়ে আবেদন: সাহাবু কেন নেবেন না? বাহবা নেওয়া সুযোগ ভাল পেলে কিন্তু আর বাহবা নিয়ে পারবেন না।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তখন বলেন, ঠিক আছে তাহলে সাহাবুদ্দিনকেই রাষ্ট্রপতি করি। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ২৩শে জুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে বঙ্গবন্ধবন থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ এবং বাসার গিয়ে তাকে নতুন রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব করেন এবং রাষ্ট্রপতি আদালত রহমান বিচারদেহ মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন।



## বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলা

১৬ নাসির নভেম্বর মাসের ১ম তারিখের এক বিবরণে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারী কার্যকরন গণতন্ত্রের নীতিমূল্য পূর্ব বিবেচনা এবং ত্রুটিং সূচক প্রধানমন্ত্রী এবং তার আত্মীয়স্বজন মিলে পত্র প্রকাশ করছেন। শেখ রেহানা এবং তার স্বামী শক্তি সিদ্দিকী, চাচারো ফোন লুনা, মিনা এবং সবাই পুলিশের মার-ইসপেটের পলে চাকরী দেওয়ার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলা দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সমাপ্রদর্শন দেয়।

অর্থাৎ ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় এসে বেগম খালেদা জিয়া এবং তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী নাকি তাদের পছন্দ মতো ৭৪৫ জনকে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে লাক-ইসপেটের পলে চাকরী দিয়েছে। আর এই অভিযোগে বেগম জিয়া ও মতিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে স্বজনশ্রীতি ও দুর্নীতির মামলা দায়ের করতে দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উল্লেখিত আত্মীয় স্বজনরা পিড়িপিড়ি কথাত থাকলে, মতিমুত রহমান বাবু ও রিসেস মতিমুত রহমান বেবু (মামলা) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারই তার আত্মীয়দের মুক্তি দেবেন যে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ারের না বুঝিতে বরং তাঁদের মাথায় হাত বুঝিয়ে চেঁচা করে দিবেন, দেশের উন্নতি করতে পারেন কিনা। যদি একবার কোন মতে বেশ পরন করতে পারেন, তাহলে সেসবের শুধু আপনাকেই না, আপনার স্ত্রী পুত্রকেই একশেষ মানুষ মাথায় করে রাখল। বি, এম, সি ও বেগম খালেদা জিয়াকে মেট্রাইল করে আপনি দেশ ত্যাগের পায়েরন না। আরও আপনাকে এবং আওয়ামী লীগকে তার দিকে কেউ দেশ গড়তে পারবে না। আপনি এবং খালেদা জিয়া এই দুই শক্তির একা ছাড়া কিছুকেই দেশের মঙ্গল করা যাবে না, দেশের উন্নয়ন করা যাবে না। বিতর্ক, অসৈন্য, শত্রুতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শুধুমাত্র হাত বাড়িয়ে দেন। বেগম জিয়া আপনার আগের প্রধানমন্ত্রী, তাকে (বেগম জিয়াকে) বড় কোন ভেতক বুকে টেনে নিজে, দেশের উন্নয়নের চেঁচা করেন। তাকে আপনারই লায় হয়ে অনেক বেশি। মহলা করলে আপনার (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার) স্ত্রী হবে, দেশের স্ত্রী হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলছেন, তুমি জান না, খালেদা জিয়া ছাত্রলীগ আর যুবলীগের লোকদের পুলিশে চাকরি দিয়েছে।

মতিমুত রহমান বেবু বললো, এটা আংশিক সত্য। আসল সত্য হলো টাকা দিয়ে এরা পুলিশে চাকরী নিয়েছে। তারপর যদি ধরে নেই চাকরী পাওয়া সকলেই স্বয়ংস্বল, সুবদলের লোক, তবুও তের তারা এদেশেরই মানুষ। বেগম জিয়া ৭৪৫ জনকে চাকরী দিয়েছে। সেই পথ ধরে আপনি (শেখ হাসিনা)

স্বাভাবিকভাবেই যুব শীর্ষে ৭,০০০ (সাত হাজার) জনকে চাকরী দেন। কিন্তু মাফলা করবেন না। মানসাত কোন কল হবে না। মাফলা করলে বরং আপনি ছোট হয়ে যাবেন।

সব কাজেই তোমাদের বাধা, তোমাদের আপত্তি। এই কথা বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপরে আর শয়ন করে চলে গেলেন। এবং প্রধানমন্ত্রীর ছোট কোন শেখ রেহানা, তাঁর বানী শক্তিক সিদ্ধিকী এবং তাদের চাকী ও চাকাতো মোনেরা মতিহুর রহমান রেটু, মিলেস মতিহুর রহমান রেটুকে সীমণ তির্যাক্ত করলো।

পরে ত্রিকই পুলিশের এই চাকরী দেওয়ারকে স্বজনপ্রতি ও দুর্নীতি আখ্যায়িত করে দুর্নীতি দমন বৃজে ১৯৯৬ সালের ২১শে ডিসেম্বর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম কালেরা জিহা ও প্রাক্তন মন্ত্রী নব্বী আব্দুল মতিন টৌধুদী বিতর্কে একটি মাফলা দাতার করে।



শেখ হাসিনার ছোট কোন শেখ রেহানার বামী শক্তিক সিদ্ধিকী এবং শেখ হাসিনা, রেহানা ও চাকাতো মোন পুত্র ও মিনা।

# গঙ্গা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ট্রানজিট চুক্তি

ভারতের পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ১৯৬৬ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বাংলাদেশে এসেই সড়ক পরিবহন মন্ত্রীর শেখ হাসিনার সৎকারী বাসভবন গণভবনে চলে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বসুভবন ভিতরকার অতিথ্যবক আসছেন, পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাদের মধ্যে অন্যতম। শুধু অন্যতমই নয়, শেখ হাসিনা পরিবারের ভারতীয় অতিথ্যবকদের মধ্যে জ্যোতি বসু সবার শীর্ষে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা সপরিবারে যখন ভারতে ছিলেন তখন ভারতীয় মুক্তকণী বা অতিথ্যবকদের মধ্যে জ্যোতি বসুর সান্নিধ্য ও প্রেম দেখেছেন সবাইকেই বেশী। জ্যোতি বসু পিতৃহারা স্নেহ মমতায় ও সান্নিধ্য নিয়ে গড়ে কুলাছেন শেখ হাসিনা ও রেহানাকে। ১৯৬১ সালের ১৭ই মে বাংলাদেশে ঘিরে আসার পর শেখ হাসিনা হত ব্যর্থ ভারতে গিয়েছেন (প্রতি বছর ৩/৪ বার তো যেতেনই), মুন্সীর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সাথে শলাপসানর্পণ জানাই গিয়েছেন। জ্যোতি বসুদের বহু সাদরতর কসল আত্ম শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। ভারতের পশ্চিম বাংলা রাজ্যের সেই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আর এসেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাসভবন গণভবনে। গণভবনের ঘরে ঢুকতেই আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নৌতে এসে জ্যোতি বসুর পায়ে পড়ে পদচুম্বী নিলেন। নীচদিন পর পিতা ঘরে এসে নামাশিকার কন্যা সেই ভাবে ছুটে এসে নিজের পায়ে পড়ে, ঠিক সেই ভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জ্যোতি বসুর পায়ে পড়লেন। অতঃপর দোতালার বাস কামরায় নিয়ে বসালেন এবং আগে থেকে তৈরী করে রাখা নানা ধরনের খাদ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই পরিবেশন করে জ্যোতি বসুদের খাওয়াতে লাগলেন। জ্যোতি বসু খেতে খেতে পারিবারিক, রাজনৈতিক এবং ভারত বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে কথা বলতে থাকলেন। এক পর্যায়ে জ্যোতি বসু বললেন, শেখ মা, গঙ্গার জলটল কিই গায়ে না। আমিই পাই না, আর কুমি কিভাবে পাবে?

আমি প্রধানমন্ত্রী লেব গৌড় এর মাঝে আলোচনা করে কেবেছি, কুমি গঙ্গা চুক্তি করে ফেল। আরে কবে কুমি জল না পোলেও, তোমার বিরোধীরা গঙ্গার জল, গঙ্গার জল বলে রাজনৈতিক ইস্যু আর তৈরী করতে পারবে না। এই সুবিধাটা কুমি পেয়ে যাবে। ২০/৩০ (বিশ তিরিশ) বছরের একটি চুক্তি করে দেব। কুমি আমার প্রথমেই ২০/৩০ বছর-এর কথা বলতে যেয়ো না। কুমি বলবে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদের গঙ্গাচুক্তি করতে হবে। তোমার বিরোধীরা এই ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদ নিয়ে চিন্তা ফিন্তা করতে থাকবে, পরে আমি ২০/৩০

(বিশ্ব/বিশ্ব) বছর মেয়াদ-এর চুক্তি করে দেবে। কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী ও জনমন্ত্রী  
সাথে আমার এই বক্তব্যই কথা হয়েছে। তুমি এভাবেই কাজ চালিয়ে যাও। আর  
একটা কথা মা, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের সাথে তুমি সহসা একটা চুক্তি  
করে ফেলবে। ওদের যেতিনিউ (বাজনা-টোল) ওদের থাকবে, ওদের কর্মচারী  
ওদের থাকবে। এবারে কখনো কিছু তুমি (সরকার) করতে চাইলে  
উপজাতীয়দের অনুমতি নিয়ে করবে। এটা আমি কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী,  
প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় নেতাদের কথা দিয়েছি। যখন  
শিখ সরকার তুমি পার্বত্য উপজাতীয়দের সাথে এই চুক্তি সম্পাদন করবে। এই  
চুক্তির নাম দেবে শান্তি চুক্তি।

এতে ভোনারও লাভ হবে। তুমি এতদূর করতে নীতিমেন্তে যুদ্ধ লড়াই আর  
অশান্তি বৃদ্ধ করে শান্তি চুক্তি করবে। নামা দুনিয়া তোমার পক্ষে শান্তি শান্তি বন  
উঠবে। তোমার বাহানা চলবে। বলা যায় না তুমি নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেতে  
পার।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার বালিকার মতো শুধু ছিঁ কাকা,  
জি কাকা, করতে লাগলেন।

জ্যোতি কাকা বনলেন, আর একটা লাভ তোমার হবে। বলা তো কি লাভ?  
ওরা খুশি হবে।

ওরা খুশি হলে কি হবে? পার্বত্য চট্টগ্রামের পাণ্ডামেন্টের তিন (৩) টি  
আসনই স্থায়ীভাবে তুমি পাবে। যেমন মোগলাগঞ্জের তিন (৩) আসন পাও।

আর অন্যকে করিভের দেওয়া ট্রেনসিভ ডেপুটি মৌবদর (পোর্ট) কেডরা  
এবং তো ভোনার পিতার সাথেই আমাদেব পাকা কথা হয়েছিল। তুমি এখন  
তোমার সুবিধাজনক সময়ে আমাদেব (ভারতকে) এতলো নিচে লাও। বেশি ফেরি  
কর না কিন্তু। বেশি দেবি করলে আমার দিকের দিকে তুমি ফেরাবুঝি হতে পারে  
কখনো?

পশ্চিম বাংলা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বাবু আজ শেবে চলে গেলেন।  
ভারতের ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড় বাংলাদেশ সরকার করে গেলেন।  
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লি সফরে গেলেন এবং পশ্চিম বাংলার  
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি কাকার সাক্ষাৎ ৩০ বছর মেয়াদ-এর পানিবিহীন বঙ্গাবুঝি  
করে এলেন। এতগতই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার কুলজো জাই প্রধান জাতীয়  
সংসদের বক্তব্য টিক হুইফ মাকাল আবুল হাসিনাত আবুল্লাহকে প্রধান করে,  
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি করলেন। এবং জ্যোতিবাবুর মিল নব্বা অনুযায়ী  
রাজহবিহীন, রাজ কর্মচারী বিহীন এবং রাজ কর্তৃবিহীন পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি  
চুক্তি করলেন।



এই শাস্তি চুক্তি অনুযায়ী (১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন কর্মকর্তা টেন্ডার পাবে না। এবং ঐ অঞ্চলের বাণিজ্যিক খসড়া টেন্ডার উপভোগ্যতাই সংগ্রহ করবে ও স্বত্ব করবে।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় কোন কর্মচারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মচারী হবে না। উপভোগ্যতাই উপভোগ্যতাদের হবে। থেকে ঐ নকল কর্মচারীদের নিয়োগ দিবে, পদোন্নতি দেবে এবং বরখাস্ত করবে।

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের অনাশ্রয়, ভূমি, বন ইত্যাদি যা কিছু আছে উপভোগ্যতারা যদি অনুমতি না দেয় তাহলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার যদি গ্রহণ বা একত্র করতে পারবে না।

## ডঃ মহিউদ্দিন মজী

১৯৯৬ সালের প্রমজান আস। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সবকালী রাসভবন গণভবনে দেশের মাননীয় নাস্তি, সরকারী কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, বিশেষী দূতাবাসের লোকজনদের ইফতার পাটি। গণভবনের ভেতরের বিশাল মাঠে বিশাল প্যাডেল, বিশাল আয়োজন। অধিকাংশ অতিথি এসে গেছেন। এমন সময় ডঃ কামাল হোসেন তার দুই তিনজন সার্থী নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে প্যাডেলের নিচে এগিয়ে আসছেন। প্যাডেলের পূর্ব দিকের শেষ প্রান্তে বসে থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটা দেখা মাত্র চিৎকার করে ডঃ কামাল হোসেনের নিচে হাত উঠিয়ে বলে উঠলেন, ও ও, ওঁ যে খর ভাঙ্গা আসছে, খর ভাঙ্গা আসছে। এই, এই, খর ভাঙ্গাকে ধরে বস। খর ভাঙ্গা যেন আমার কাছে না আসতে পারে। খর ভাঙ্গাকে ধরে বস।

এপিএস বাখাউদ্দিন নসিম ডঃ কামাল হোসেনকে প্যাডেলের পাঁচিম পাশের এক কোণে একটি টেবিলে নিয়ে বসালেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুঁচ খুঁচ ইফতার পাঁচিতে আগত অতিথিদের বোজা খবর নিচ্ছেন, মৌজান বিনিময় করছেন। কিন্তু ডঃ কামাল হোসেনের দিকে গেলেন না। প্যাডেলের এক টেবিলে অন্যান্য ইফতার সার্থী মাথা নিচু করে বসে আছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখা সড়িড ডঃ মহিউদ্দিন রান আলমগীর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন ওই দিকে এসেন ডঃ মহিউদ্দিন রান আলমগীর মাগুফা ছেড়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গরকেন। এক এমনভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সালাম দিলেন যে, এটা সালাম, না পারে হাত দিয়ে কনমকুনি একবারে ধারে কাছের লোক ছাড়া অন্য কেউ তা বুঝতেই পারতো না।

ইফতার পার্টিতে অনুষ্ঠান শেষে শব্দভবনের দীর্ঘ ভাগর ৩ (নাঁচ) বাধার দুইপাশে বসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইফতার পার্টিতে আসা তার ভ্রাতুষ্পুত্র অরুণের সাথে আলাপ করতে যোগ্য হলেন, ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে মন্ত্রী বানাতে হবে। মটর সাইকেল আরোহী বলাঙ্গী, মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে মন্ত্রী বানাওবেন কি জন্য?

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, আমার কর্মতরঙ্গ আমার পেশনে মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে অনেক অধোম হারিয়েছে।

মটর সাইকেল আরোহী বলাঙ্গী, ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর আজমোদী। মাত্র কিছু দিন আগে সরকারের একজন কর্মকর্তা হঠাৎ মহিউদ্দিন খান আলমগীর সম্মানের সাথে বিদ্রোহ করেছে। তাঁকে মন্ত্রী করলে তা সরকারের সাথে বিদ্রোহের গুণ্ডাগার হিসেবে পরিগণিত হবে। এটা সরকারের সাথে বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তির উদাহরণ হয়ে থাকবে। আপনার সরকারের অনেক সরকারী কর্মকর্তা আছে, যারা আপনাকে পছন্দ করে না। সরকারের সাথে বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তির এই উদাহরণ হটাৎ থাকলে, সুযোগ পেলেই তারাও আপনার সরকারের সাথে বিদ্রোহ করবে। মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে মন্ত্রী করার আগে এই বিষয়টা কেয়ালে রাখতে হবে। আপনি যদি সত্যিই মনে করেন আপনার কর্মতরঙ্গ আমার পিছনে মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে অসমান আছে এবং আপনি তাঁকে পুনরুদ্ধার করবেন। তাহলে আগে তাকে চাকরী থেকে অবসর দিয়ে আপনার উপনির্ভর করেন। কমান্ডি মন্ত্রী না করে মন্ত্রীত মর্যাদা দেন। অকৃত্রিমী কীভাবে সেনিটরিয়াম দেখার করেন। পদের টার্মে মন্ত্রী করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, আস্তে আস্তে তুমি কি আমার সরকারী কাজে কর্মে বাধা দিতেই থাকবে? না আমারে কাজ করতে দিবে।

না, মন্ত্রী আমি আপনাকে বাধা দিতে যাবো কেন?

তাহলে তুমি এতো কথা বলছো কেন?

আপনি বললেন তাই বললাম।

এখানে তো আরো অনেকই আছে, কই কেউ তো তোমার মতো বাধা দিলে না? তুমি এত কথা বলছ কেন?

আগে থেকেই বলে এসেছি, পুরোনো অভিযোগ তাই বলি।

আগে বলছে, তখন আমি শেখ হাসিনা ছিলাম। এখন আমি প্রধানমন্ত্রী।

হাসিনা আমি আপনার সাথে আছি, জালো-মক বলে ঘাব্দোনা না খোনা, করা না করা আপনার ব্যাপার।

এখনো প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কো লেব নাই। দেবতা। এই কথা বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লোডবার চলে গেলেন। সরকারপ্রতীকী ৬২ মহিউদ্দিন খান আলমগীর মন্ত্রী হলেন।



- (ক) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনে বসন্ত শেখ মুজিবের ছবির পাশে মাননীয় প্রধান ও তার কন্যা বর্ণনাত্মক।  
 (খ) গণভবনের গার্ড অফ অনার অর্কে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান সেন্সর কন্যা বর্ণনাত্মক।



- (গ) গণভবনের ভিতরে মাননীয় প্রধান, বর্ণনাত্মক শেখ হাসিনার স্বামী চাকর আলম, সানি হোসেন এক, শফাহদে।

# অবাস্তিত ঘোষণা

মতিঘুর রহমান রেবু ও মিসেস মতিঘুর রহমান রেবু (মহনা) অবাস্তিত হলো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মতিঘুর রহমান রেবু ও মিসেস মতিঘুর রহমান রেবু (মহনা) কে অবাস্তিত ঘোষণা করে পুলিশ, এস বি, এন এস আই, ডি এফ আই, সি আই ডি, টি বি দহ রাষ্ট্রের বক্ত আইন প্রচোপকারী সংস্থা আছে সকল সংস্থার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন। নির্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লগলেন, এই অবাস্তিতরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, এবং প্রধানমন্ত্রী যে সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন সেই সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারবেন না। এরা যাকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, কার্যালয় এবং অনুষ্ঠানে যোগদান করতে না পারে সেই দিকে সতর্ক মূঠি রাখার নির্দেশ দেওয়া হলো। এবং এই অবাস্তিত ঘোষণা বঙ্গ পত্রিকায়ও প্রকাশ করা হলো।

## দৈনিক দিনকাল

প্রধানমন্ত্রীর মতিঘুর অবাস্তিত এক প্রবন্ধে

### এ জনোই কি জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম?

মুক্তিযুদ্ধের সময়। প্রথমবার।  
মতিঘুর ও মিসেস মতিঘুর  
রহমান রেবু মতিঘুর রহমান রেবু  
মতিঘুর রেবু মতিঘুর রেবু  
মতিঘুর রেবু মতিঘুর রেবু  
মতিঘুর রেবু মতিঘুর রেবু  
মতিঘুর রেবু মতিঘুর রেবু

মতিঘুর রেবু মতিঘুর রেবু  
মতিঘুর রেবু মতিঘুর রেবু  
মতিঘুর রেবু মতিঘুর রেবু  
মতিঘুর রেবু মতিঘুর রেবু  
মতিঘুর রেবু মতিঘুর রেবু  
মতিঘুর রেবু মতিঘুর রেবু  
মতিঘুর রেবু মতিঘুর রেবু

মতিঘুর রেবু মতিঘুর রেবু  
মতিঘুর রেবু মতিঘুর রেবু

মতিঘুর রেবু মতিঘুর রেবু  
মতিঘুর রেবু মতিঘুর রেবু  
মতিঘুর রেবু মতিঘুর রেবু  
মতিঘুর রেবু মতিঘুর রেবু  
মতিঘুর রেবু মতিঘুর রেবু  
মতিঘুর রেবু মতিঘুর রেবু  
মতিঘুর রেবু মতিঘুর রেবু

(১) - ১৯৭১ - ১৯৭২

প্রকাশিত এই খবরটি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ১৪০৪ বঙ্গাব্দ ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ ইং

জৈষ্ঠ মাসের ১২ তারিখ থেকে



# দৈনিক ইত্তেফাক

THE DAILY ITTEFAK

পত্রিকা: ইত্তেফাক (দৈনিক) প্রতিদিন প্রকাশিত হয়।



পত্রিকা: ইত্তেফাক (দৈনিক) প্রতিদিন প্রকাশিত হয়।  
 ক্রমিক: ১০০০  
 প্রকাশক: ইত্তেফাক প্রকাশন

১. প্রকাশক: ইত্তেফাক প্রকাশন, ১০০০ ক্রমিক, ১০০০  
 ২. প্রকাশক: ইত্তেফাক প্রকাশন, ১০০০ ক্রমিক, ১০০০  
 ৩. প্রকাশক: ইত্তেফাক প্রকাশন, ১০০০ ক্রমিক, ১০০০  
 ৪. প্রকাশক: ইত্তেফাক প্রকাশন, ১০০০ ক্রমিক, ১০০০  
 ৫. প্রকাশক: ইত্তেফাক প্রকাশন, ১০০০ ক্রমিক, ১০০০

১০০০ ক্রমিক, ১০০০ ক্রমিক, ১০০০ ক্রমিক, ১০০০ ক্রমিক, ১০০০ ক্রমিক

১০০০ ক্রমিক, ১০০০ ক্রমিক, ১০০০ ক্রমিক, ১০০০ ক্রমিক, ১০০০ ক্রমিক

## অবাস্থিত ঘোষণা

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ সমগ্রটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হইতে ৬ বার্ষিকে অবাস্থিত ঘোষণা করা হইয়াছে। বার্ষিকের ইতিমধ্যে: মতি-তার ব্যবসায় বিন্দু, বিশেষ মতিতার ব্যবসায় বিন্দু, বো: বিলাকিত হোলেব, বো: আব্বাল চারান, কেএম (বো: ৬-৬৬ ক: ৬৬)

## অবাস্থিত ঘোষণা

(১৬ পৃ: পঃ)

হোমোয়েট উল্লাহ আব্বাল এবং বো: বিনিল্ল বহমান মিলন (বহমান মিলন)। ইহারা বাহাতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাসভবন (গণভবন) এবং ভাষার ব্যবসায় অনুষ্ঠানান্তিতে উপস্থিত থাকিতে না পারেন সে ব্যাপারে সকলকে মতর্ক পুষ্টি বাণীর অনুবোধ জানান হইয়াছে।



## দশ টাকায় শেখ মুজিবের ছবি

এক শুক্রবার সকালে অর্থমন্ত্রী কিব্রিয়াত সি, এস, ডঃ পারভেজ, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণচবনে এসে দশ টাকায় শেখ মুজিবের ছবির লেআউট ডিজাইনের বসভা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেখান। নতুন এই দশ টাকার লেআউট ডিজাইনের বসভা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মৌখিকভাবে অনুমোদন করে দিলে তবেই তা ছেপে নতুন দশ টাকার নোট হিসেবে বাজারে ছাড়া হবে। এই দশ টাকার বসভা লেআউট ডিজাইনের উপরে ছিল আল্লাহর বর মসজিদেব ছবি। এবং নিচুনে ছিল শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবের ছবি।

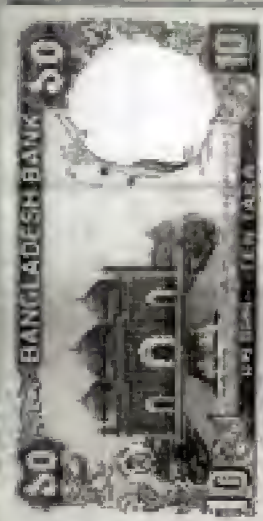
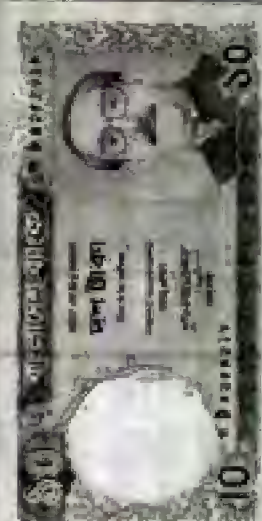
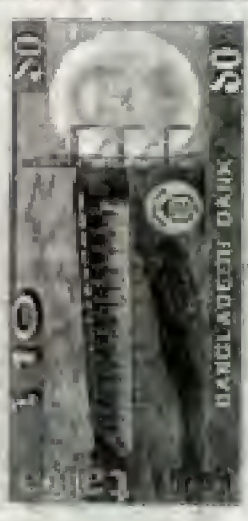
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লেআউট ডিজাইনের বসভাটি দেখে অর্থ মন্ত্রীর সি, এস, ডঃ পারভেজকে কিংবদন্তি হয়ে বলে উঠলেন, একটি জাতির পিতার ছবি নিচুনে কেন?

অর্থমন্ত্রী সি, এস, ডঃ পারভেজ কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, বাজারে প্রচুর বর্তমান দশ টাকার নোটের উপরে মসজিদেব ছবি আছে। ধর্মীয় অনুভূতির কথা বিবেচনা করে উপরের মসজিদ এক ছবিটা ঠিক রেখে, নিচুনে জাতির পিতার ছবি দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশঙ্কিত কণ্ঠে বললেন, ওসব মসজিদ-টমজিদ মুক্তি না, জাতির পিতার ছবি উপরে দিয়ে নতুন দশ টাকার নোট ছেপে বাজারে ছাড়বেন। আমার বাবা যে জাতির পিতা এটা শরাতচন্দ্রের জাতকে মিথ্যাবে হবে।

এরপর অন্য আরও একদিন ডঃ পারভেজ শেখ মুজিবের ছবি উপরে এবং মসজিদেব ছবি নিচুনে দিয়ে করা লেআউট ডিজাইন নিয়ে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা দেখেন ও খুশি হন এবং মৌখিক অনুমোদন করে দেন। বর্তমানে বাজারে শেখ মুজিবের ছবি সমালভ যে নতুন দশ টাকার নোট প্রচলিত এটা নোট।

অন্যদিক শি.এস.সি. নং: পঞ্চাশতক এইখানে এই করে শেষ করিলে হবে সিরি নম্বর দশ ইকর মোটে মোটটি ডিভাইস নিচে আসেন।



এই মোটটি ডিভাইস শেষ করলেই শেষ করিলে সিরি নং: পঞ্চাশতক এইখানে এই করে শেষ করিলে হবে সিরি নম্বর দশ ইকর মোটে মোটটি ডিভাইস নিচে আসেন।



## পুলিশের ওলিতে কেউ যারা যায়নি

তমু লাশ চাই। মানুষের লাশ। ১৯৯০ সালে সামরিক স্বৈরাচার নিপাত করত গণতন্ত্র মুক্ত করতে দেশের বহু লোককে জীবন দিতে হয়েছে। শহীদ নূর হোসেনের সঙ্গে ডেপুটি স্বৈরাচার নিপাত যাক গণতন্ত্র মুক্তি পাও আন্দোলনে সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল হোসেন মোহাম্মদ একশাহের পুলিশ বি, ডি, আর ও সেনাবাহিনীর ওলিতে রাজধানী ঢাকাসহ এদেশের অনেক জায়গা শ্রাব নিহত হয়েছে। কিন্তু ১৯৯০ সালে একশাহ পতনের পর বিজয়পতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নির্দেশীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে পরিচালিত ১৯৯১ সালের নির্বাচনে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বেগম বাসেদা জিয়া সরকারের পতন আন্দোলনে রাজধানী ঢাকা শহরে পুলিশ, বি, ডি, আর সেনাবাহিনীর ওলিতে একজন লোকও নিহত হয় নাই। যদিও ১৯৯১ সালের পর থেকেই বাসেদা জিয়া সরকারের পতনের লক্ষ্যে মানান ইয়াতে তরু হওয়া শেষ হাসিনার আন্দোলনে ঢাকা শহরে মোট ১০৩ (একশত তিন) জন লোক ওলিতে নিহত হয়েছে। তাপাশিও এই নিহত হওয়া ১০৩ জন লোকের মধ্যে ১ জন লোকও পুলিশের বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ওলিতে নিহত হয়নি।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে জনগণের ভোটে বিজয়ী হয়ে বেগম বাসেদা জিয়া কমতার আসার পর থেকে, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাসেদা জিয়াকে কমতায়ুত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন। তখনো ভাটি প্রজাতন্ত্রের আন্দোলন, কখনো সফিবাসর দেয়াও, কখনো বসেন্দ ভবন ধ্বংস, কখনো নির্বাচন কলিশর ঘোষণা, কখনো রাজস্ট ব্যক্তিরে মারী, কখনো প্রধানমন্ত্রীর কার্যগত দেয়াও ইত্যাদি নানা ইস্যুতে ১৯৯২ সাল থেকে শুরু হওয়া এবং ১৯৯৬ সালের ২৩শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল পাস করা পর্যন্ত, শেখ হাসিনার সতর্ক আন্দোলন, সংগ্রাম, ও স্বরভাষের প্রায় প্রতিটি কর্মসূচিতে ২ জন, ৩ জন, ৪ জন করে মানুষ ওলিতে নিহত হয়েছে। এই নিহত হওয়া মানুষেরা কেউই পুলিশ বি, ডি, আর বা সেনাবাহিনীর ওলিতে নিহত হয়নি। জবাব এই নিহত হওয়া ১০৩ জনের সকলেই নাম মোহাম্মদ, পরিচয়ইন, অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পরিচালিত বাসেদা জিয়া সরকার পতন আন্দোলনে আওয়ামী লীগের পরিচয় বহনকারী একজন কর্মীও নিহত হয়নি। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নিহত হওয়া ব্যক্তিদের আর নাম আওয়ামী লীগের কর্মী বলে দাবী করলেও, নিহতদের নাম পরিচয় বুঝে পাননি। এবং বেগম বাসেদা জিয়া সরকার বলেছেন নিহতরা নিরীহ পথচারী। আন্দোলনের সময় ওলিতে নিহত হওয়া ব্যক্তিরা নিরহ পথচারী, না, রাজনৈতিক কর্মী সেটা দুখ বিষয় না। যুব বিষয় হলো, ওলিতে নিহত ব্যক্তিরা, পুলিশের ওলিতে নিহত হলো না। বি, ডি,

আর-এর তলিতে নিহত হলো না, নিহত হলো না সেনাবাহিনীর তলিতে। তবে  
আনের তলিতে ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কেবল ঢাকা শহরেই ১০৩  
জন মানুষ নিহত হলো। হোক না নিহতের অজ্ঞাত পরিচয়। তবু নিহত  
হতভাগারা তো এমনশেষই মানুষ ছিল। কারা তাদের নির্বিচারে তলি করে হত্যা  
করলো? হত্যাকারীরা কারা? কি তাদের পরিচয়? কারা হত্যাকারীদের মানুষ বুন  
করার জন্য মরম মিল? কারা হত্যার আয়োজন করলো? আর স্বার্থে হতভাগ্য  
মানুষ বুন করা হলো? বসবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার জাফর নিহতের পুনর্নির্দেশ  
তলিতে নিহত না হলোও, বালেদা জিয়ার বি, এন, পির সন্তানীরা নিহতদের  
তলি করে বুন করেছে। প্রতিটি আন্দোলন, হরতাল, ঘেরাও কর্মসূচিতেই এভাবে  
নিরহ পঞ্চাঙ্গী মানুষ শেখ হাসিনার জাফর বি, এন, পির সন্তানীদের তলিতে  
নিহত হতে লাগলো।

যে কোন ঘটনের কর্মসূচীর নির্দিষ্ট দিনের পুই দিন আসে ঢাকা শহরের সকল  
পেশানারী শুনীদের কাছে, মানুষ বুন করার জন্য অগ্রিম টাকা পৌছে দেওয়া  
হতো। পেশানারী শুনীদের বলা হতো, আমাদের আগামী কর্মসূচীর নির্দিষ্ট দিনে  
লাশ চাই। মানুষের লাশ। হোক সে যে কোন মানুষের লাশ। এই দেওয়া হলো  
অগ্রিম টাকা। ব্যক্তি টাকা লাশ দেওয়ার পর। কর্মসূচীর নির্দিষ্ট দিনে কর্মসূচীর  
সকলতার দিকে নজর দেওয়া হতো না। শরীর উত্তেজনার সাথে তলিয়ে গান  
হতো মানুষের লাশ পড়ার সংবাদ দিকে। মানুষের লাশ পড়ার নিশ্চিত সংবাদ  
না আসা পর্যন্ত, বসবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার পানাহার সম্পূর্ণ বন্ধ  
থাকতো। রক্তক্ষয় পর্যন্ত মানুষ বুন হওয়ার মুকাত খবর না জানতে, বসবন্ধু  
কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা শুধু মাত্র চা আর সেই সাথে ফেনসিভিল হুকু অন্য  
কোন কিছু যেতেন তো নাই-ই, তবু হুটফুট হুটফুট করতেন-আর এখনো লাশ  
পড়লো না, এখনো লাশ পড়লো না, এরপর আমি কি করবো? কি কর্মসূচি নিব?  
এখনো লাশ পড়লো না বলে ইমদিনি পানেশীর ন্যায় প্রলাপ বকতে  
থাকতেন এবং ২৯ লাখের মিলে কোডের সোতলা, নিচকলা পাড়চাষী করতে  
থাকতেন।

যেই মুহুর্তে মানুষ বুন হওয়ার সংবাদ বা লাশের সংবাদ নিয়ে আসা হতো,  
বসবন্ধু কন্যা বক্তিতে বিজ্ঞানায় যা এলিয়ে দিয়ে বলতেন, আমার সুখা পেয়েছে,  
মানার লাগাও।

এক দেড়ঘণ্টা বক্তি ও সুখের নিশ্চা শেষে, বসবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ  
হাসিনা খুব খেতে উঠে, খাওয়া-দাওয়া করে তৈরী হয়ে হাতে ক্রমাল নিয়ে ঢাকা  
সেউকাল হাসপাতালের মর্গে লাশ দেখতে চলে যেতেন। হাসপাতালের মর্গে  
লাশ দেখে চোখে ক্রমাল চেপে খরতেন। ফটো সাংবাদিকেরা হবি তুলতো।

“লাশ দেবে বহুবহু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা অশ্রু সংযোগ করতে পারলেন না” এই আপদকাল নিয়ে সেই ছবি পত্রিকায় ছাপা হতো।

সচিবালয় ঘেরাওয়ের এক কর্মসূচীর দিনে দুপুর গড়িয়ে ২টা বেজে গেল। কিন্তু লাশ পড়ার কোন সংবাদ হলো না। এনিক-সেনিক কত লোক পারালাম। কিন্তু লাশের কোন সংবাদ নেই। বহুবহু কন্যা তাঁর উদ্বেগনার প্রায় উচ্চাদ হয়ে প্রলাপ করতে লাগলেন। সকাল দশটায় সচিবালয় ঘেরাও ফরাসি কথা। এখন পর্যন্ত একটি লাশও পড়েনি। পুলিশ একটি টিম্বার গ্যান্ড ছুঁড়েনি। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা বর্তমানে রাশিভ্যামস্ট্রী কোফায়েল আহমেদ বহু জাতীয় প্রেস ক্লাবের তাঁর নিকট এন, এস, আই বিলিংহেল নামের বিশাল কড়ই গাছের নিচে নাঁড়িয়ে নাঁড়িয়ে রক্তম্ন রাখছেন। আর পুলিশ অতিসাবধানের সাথে গল্প করছেন। এমিকে বিজয় নগরে শেখ হাসিনা ও শেখ বেহানার জাইনীজ বেইজের্ট মুখোয়ার্ডেন এর সাহায্যে কতক জনসুপ থাকেন কেন্দ্রীয় নেত্রী বর্তমান খানামস্ট্রী মতিয়া চৌধুরী। ১৯ নায়ার মিক্টো কোডের সহকারী রাসভরনে বহুবহু কন্যা জননেত্রী বিকোদী মলীজ নেত্রী শেখ হাসিনার কাছে সংবাদ হলো, লাশ ফেলার মধ্যে নিম্নাওতম কোন ফেরাও তাঁরী হয়েছ না। আর আই লাশ ফেলা যাচ্ছে না।

অর্থাৎ দুর্ভাগ্যের মানুষ খুন করতে যে খোলাখোলাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, তার নিম্নতম পরিবেশও সৃষ্টি হচ্ছে না। শেখ হাসিনা ও তার কল আওয়ামী লীগের অর্থাৎ নটিনালর ফেলও কর্মসূচী ব্যর্থ হয়েছে। কোন কল খোলাখোলা হচ্ছে না। সব কিছু শান্ত ও স্বাভাবিক হয়েছে। কল দুর্ভাগ্য মানুষ খুন করার সুযোগ পাচ্ছে না। এই কথা শুনে বহুবহু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন যাও, দ্রুত যাও, কোফায়েল জাইয়ের কাছে যাও, অতিয়া চৌধুরীর কাছে যাও। দেয়ো আশাও কথা বল। লামান্য একটা কিছু করতে বল। আর যদি কিছু না হয়, তাহলে আগামী দিনে কর্মসূচি নেওয়ার কোন পুঁজি থাকবে না। যাও ভাড়াভাটি যোগে বল লামান্য খোলাখোলা সৃষ্টি করবে।

ছুটে যাওয়া হলো, বেয়ে কোফায়েল আহমেদকে বলা হলো, কোফায়েল জাই নেত্রী সামান্য খোলাখোলা সৃষ্টি করতে বুঝেছেন.....।

তখনই ভয়ানক প্রেসে গিয়ে কোফায়েল আহমেদ বললেন, যাও এবান থেকে, আমি এসবে বিশ্বাস করি না। আমি নিয়মতান্ত্রিক প্রাকদীর্ঘিক বিশ্বাস করি। আমি এই সবে বিশ্বাস করি না। আর একবারও তুমি আমাকে এসব বলবে না। তুমি যাও এবান থেকে।

এই কথা শুনে কোফায়েল আহমেদ ডাড়িয়ে গেল।

এরপর আসা হলো মতিয়া চৌধুরীর কাছে। মতিয়া চৌধুরী সব শুনে প্রথমে চড়া গলায় বললো, আমি এইভাবে পারবো না।

সঙ্গে সঙ্গে চুপ করেন, বলে মতিরা চৌধুরীকে এটা ধমক দিতেই মতিরা চৌধুরী ভেঁজা বিড়ানোর মতো চুপ মেয়ে মেয়ে বললো, দেব আমি মহিলা মানুষ, আমি কি করতে পারি। তুমি বল, তুমি বল, বলে চেঁচায় খেঁচে চটে দাঁড়িয়ে কলনেন, চুপ যাও, সুপ যাও। এইলিকে একটা সুপ দেন, বলে সুপার্ভেন এর ব্যকে ইশারা করলেন।

১৯ নাকার মিটেটা ঘোড়ে ফেরে পরিস্থিতি বলা হলে, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নগদ এক লক্ষ টাকা দিয়ে বললেন, আমি লাশ চাই, যে করেছে হোক লাশ চাই।

বেলা তখন ৩টা। কাডান বাজারের উত্তর পাশে ওলিষ্টান বাসস্ট্যান্ডের কাছে মানুষ বুনের জন্য খুঁটিয়া অপেক্ষা করতে লাগলো। নাকার বাইরে থেকে একটা বাস এসে ডিঙলো। কক মায়ের সন্তান, কক মোনের গম্বী, কক সন্তানের পিতা বাস থেকে নামতে শুরু করলো। বাস থেকে নামা নাম না জানা মিটাই ২০/৩০ জন মাতীর সামান্য ভিড়। খুঁটিয়ের দেশে তৈরী পাইপ ধান গাছে উঠলেন। পাইপ ধানের এক কাক তুমি নাম না জানা মিটাই মাতীদের বিক্র করলো। ১৪/১৫ জন মাতী পিছ ঢালা বাজপথে গুটিয়ে পড়লো।

২৯ নাকার মিটেটা ঘোড়ে ককনের মতো অপেক্ষায় থাকা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে এই সংঘার হেওয়ার সাথে সাথে তিনি পুলকিত হয়ে বললেন, হঠাৎ তো? হঠাৎ-হ্যাঁ? যেভাবে ওলি করা হয়েছে তাতে না মনে দাঁটার কথা না। যাও, যাও, মেডিক্যাল হাসপাতালে যাও, দেব কচুটা লাশ পরছে। মেয়ে আমাকে স্বপ্ন পাও। এই কথা সেখানে, থাকত নাও।

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে বলা হলো তিনটা লাশ পরছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তৈরী হয়ে হাতে কমান দিয়ে টাকা মেডিক্যাল হাসপাতালের মর্গে গিয়ে ওলিতে মিহতদের কাশ নেবে মেয়ে কমান দিলেন। ফটো সাংবাদিকরা ছবি তুললেন। পরিকার সেই ছবি ছাপা হলো।

## নেতা ও উপনেতাদের সাথে সম্পর্ক

আওয়ামী লীগ নেতাদের বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাদের চাকর তুলার বদল করে দা। তাঁর কাছে তাঁর (শেখ হাসিনার) বাবার একটা চাকরেরা যে ইলা আছে, যে কদর আছে, যে মর্যাদা আছে আওয়ামী লীগের নেতাদের ডাও মেই। আওয়ামী লীগ নেতাদের শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ নেতাদের সম্পর্কে প্রকাশ্যেই বলতেন এরা সব ক্ষে প্রদাবাতি আর চন্দাবাতির জন্য আমার সাথে আওয়ামী লীগ করে।

আওয়ামী লীগের এমন কোন নেতা নেই যিনি, হয় শেখ হাসিনা এবং তাঁর চাকর-সাকর দ্বারা একবার না একবার অপমান অপনত হন নাই। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বর্তমান বাণিজ্য মন্ত্রী মোফায়েল আহমেদ এবং ডাক ও আর মন্ত্রী



মোহাম্মদ নাসিম ব্যক্তিগত। এই দুই আওয়ামী লীগ নেত্রী ব্যাখ্যায়ই শেখ হাসিনার সাথে একটি দৃষ্টান্ত বজায় রেখে চলতেন। হয়তো অপমান অপদত্ত হওয়ার ভয়েই, কৌশলগত কারণেই দৃষ্টান্ত বজায় রেখে চলতো। ভোফারেল আহমেদ সম্পর্কে কথিত আছে তিনি আওয়ামী লীগে মফিন (মুকব্বাউর) পবিত্র প্রতিনিধিত্ব করতেন। আর এই কারণেই শেখ হাসিনা ভোফারেল আহমেদকে পারতপক্ষে ঘাটীতে সাহস পেতেন না। ভোফারেল আহমেদও দলের রাজনৈতিক কর্মসূচীশীল ইত্যাদি ব্যাপারে শেখ হাসিনার প্রতিপক্ষ ভাবনই হতেন না। শেখ হাসিনা যা বলতেন, যা করতেন ভোফারেল আহমেদ কখনই তাড় কণ্ড নাধতেন না। যা বিরোধীতা না করে নিরব নিষ্কৃপ থাকতেন। এমন কি বাস্তবীভূত শেখ হাসিনা যে কব্র, বোনা, জ্বালাত পোড়াও চুপ-খারাবীর সৃষ্টি করে ছিলেন এবং জলাও জ্বরে যে চাদরাগ্নি জ্বল করে ছিলেন এর সবই ভোফারেল আহমেদ জানতেন। কিন্তু কখনই সরাসরি জড়িত হতেন না। ধরি মাদ্র না হুই পানি এমন একটি জ্বরে ভোফারেল আহমেদ থাকতেন। সত্য সমাবেশের হস্তে বসেই ভোফারেল আহমেদ খটীর জ্বরে শেখ হাসিনাকে বলতেন, নেত্রী আপনার গোদোন্দাজ বাহিনী ঠিক আছে তো?

শেখ হাসিনা ভোফারেল আহমেদের প্রশ্ন শুনে খুবই পুলকিত হতেন। এবং ঘর-ও দলের সাথে বলতেন, মিঠপুরে ৩ হাজার, নারায়নগঞ্জে ৫ হাজার, কামিগেট্টে ২ হাজার ..... ককটন, বোমা ও জাটা বাহিনেজ রেডি আছে, সার দেশ একেবারে ভাষা কানিয়া দিব।

ভোফারেল প্রশ্ন করতেন, আর এ্যাকশন বাহিনী (এ্যাকশন বাহিনী গানে অনুব পুর জতার জন্য পেশাদার খুনি)?

শেখ হাসিনা বলে, সারা ঢাকা শহরেই এ্যাকশন বাহিনী তৈরী আছে। হুজুদ দিলেই লাশ পাওয়া যাবে। নতুন কর্মসূচী দিতে অনুমতি হবে না।

এমন শুনে ভোফারেল আহমেদ বলতেন, ই্যা নেত্রী সব ঠিক ঠাকমজো কেসেন।

শেখ হাসিনা সভা সমাবেশ মিছিলে গেলেও চলার কার্যালয়ে ভেদান একটি খেওরেন না। কলে মাধ্য হয়েই শেখ হাসিনার বাসায় শেখ হাসিনার সাথে দেখা করার জন্য যখন যে নেতাই এসেছেন সে নেতাই হুচ জাকর থাকর ছাত্র, না হুচ শেখ হাসিনার পৌষা-আতীর দ্বারা অপমানিত হয়ে ফেরত গিয়েছেন। এক পর্যায়ে নেতারা শেখ হাসিনার বাসায় আসাই ছেড়ে দিয়েছিল। যে দু'একজন নেত্রী আসতো তারা মতিবুর রহমান রেহু অথবা মিসেন মতিবুর রহমান রেহু কে (মজনা) বিলম্বের সাথে অন্ত্যস্ত অন্তরালে বলতেন, একটু নেত্রীর সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম, দেখা করা কি সম্ভব হবে?

আপনি বসুন, দেখছি বলে মতিযুর রহমান রেফু সোভলার বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কাছে আসতো। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার আত্মীয় স্বজন নিয়ে টেনিভিশানে তিন প্রাকটিনার অথবা ভিসিয়ায়ে হিন্দি সিনেমার দেখছেন। সিনামত সাথে নাচছেন। খাইছেন। হাসি ঠাট্টা করছেন।

সভা, সমাবেশ, মিছিলের কর্মসূচী যা থাকলে বহুবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সাধারণত আত্মীয়ের নিয়ে হিন্দি সিনেমার দেখেই দিন কাটান। হিন্দি ছবিই মধ্যে যে ছবিতে অসং রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের খুন-খারাবী, ঘুর, আলো বাক্সার ইন চরিত্র জায়গে, বেছে বেছে সেই সকল হিন্দি সিনেমারলোই বহুবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সারা দিন বলে দেখতেন। এবং রক্ত করতেন। শুধু দেখা এবং রক্ত করার মধ্যেই বহুবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সীমাবদ্ধ থাকতেন না। হিন্দি সিনেমার রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর চরিত্রে নমাজে খুন, খারাবী, ঘুরনয় যত রক্তের রক্ত চরিত্র দেখানো হয় বহুবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তা রক্ত রক্তে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের জনগণের উপর আবার তা অনুপ্রাণন করত।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর সাফলতার প্রাণী নেতাকে নিচে ধসিয়ে কোন মতিযুর রহমানে রেফু সোভলার এসে থকন বলতো, আপা কেন্দ্রীয় অধিক নেতা আপনার সাথে দেখা করতে চায়, বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তখন হিন্দি ফিল্ম দেখছেন, সেই কেন্দ্রীয় নেতা দেখা করতে চান তখনোই অমনি দুই দুই খোদাও খোদাও বসে উঠতেন।

অথচ মতিযুর রহমান রেফু নিচে এসে কেন্দ্রীয় নেতাকে বলতো, নিজার আপনি বাসায় আছেন না? নেত্রী (শেখ হাসিনা) বলত বন্ধু কারে ভেবেছেন, কারেক বায় নরজার টেকা দেওয়ার পরও কোন সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। আপনি বাসায় আছেন না নিজার? নেত্রী নরজা বুনসেই আপনাকে বাসায় ফোন করে দেয়। ফোন করার পর আপনি চলে আসতেন। এইভাবে কৌশল করে নেতাদের বিচার করা হতো। নেতারার বুনতো যে, নেত্রীর কাছে তাদের কোন মূল্য নেই। নেতারার বলতো ঠিক আছে, ঠিক আছে, নেত্রী উঠলেই আমাকে ফোন করে দিও। আমি বাসায়ই আছি।

ফোন যে আর ঘাবে না এটাও নেতারার বুনতো। বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পৌষাআত্মীয়া থাকতে কেন নেতারার মতিযুর রহমান রেফুর কাছে আসতো? কারণ আত্মীয়ের অভিজ্ঞতা থেকে নেতারার জানতেন পৌষা আত্মীয়দের কাছে গেলে, নির্মাত অপমান অপনত্ব হওয়া ছাড়া অন্য কিছু হওয়া ভাগো নেই। শুধু পৌষা-আত্মীয়রাই নয়, বেকননত্ব চাকর থাকরের কাছে গেলেও একই অবস্থা। তাই নেতারার মতিযুর রহমান রেফুর কাছে আসতেন শুধু এই উন্নয়ন যে, সভানেত্রী

শেখ হামিদার মাথের ঘেঁষা কবচের না পাড়লেও, অল্পটুকু অগম্য অগম্য হতে শুরু  
 না। সেতাসের এই অগম্য অগম্য হওয়ার পিছনে বহুবলু কন্যা জননেত্রী শেখ  
 হামিদার অগম্যই সবচেয়ে বেশি। বহুবলু কন্যা জননেত্রী শেখ হামিদার  
 নিজের নিজস্বের দৃষ্টি দৃষ্টি করতেন, অগম্য অগম্য কবচের কবচের কবচের  
 মাথায় ও চাকর থাকতেনই তাই করতেন।

মহিলা প্রধান কেন্দ্র ও মিসেস মহিলা প্রধান কেন্দ্র (মহিলা) ছাড়া বহুবলু  
 কন্যা জননেত্রী শেখ হামিদার মাথের ঘেঁষা কবচের কবচের কবচের  
 কবচ এবং মিসেসের ছোটলোকের সন্তান ছোটলোক ছাড়া শেখ হামিদার  
 পাড়বোঁড়ের থাকতেন। অন্য এতদূর আরেহ। অগম্যের ব্যাপার হলে, মহিলা  
 ছোটলোকের সন্তান, ছোটলোকের অল্প ছোটলোকি আরেহ. আরেহ সম্পর্ক  
 বহুবলু কন্যা শেখ হামিদার আনন্দেহ না, তা না। তিনি (শেখ হামিদার) সবই  
 জানতেন। হু হু জানতেনই না, জানে তনেই এতদূর অগম্য, অল্প, ছোটলোকি  
 অগম্য. আরেহকে তিনি (শেখ হামিদার) বহুবলু পত্রের নিজেহ। আরেহ  
 অগম্য, অল্প, ছোটলোকি যে এক অগম্যই অগম্যের মাথায় দিত না। আরেহ  
 জানেহ মাথায় দিলে একা মাথায়ও দিতেন না।

আগাম্যের মাথায় উপস্থাপনের মাথায়ও একই আগাম্য. আরেহ  
 কেন্দ্র উপস্থাপনী কখনও বহুবলু কন্যা জননেত্রী শেখ হামিদার  
 হলে দৃষ্টি দৃষ্টি উপস্থাপন বোঁড়, উপস্থাপন বোঁড় যত তিনি (শেখ হামিদার)  
 মাথায় কবচের।

## কবচের কবচ

মহিলা আগাম্যের মাথায় উপস্থাপনী, কেন্দ্রের আগাম্যের মাথায়  
 উপস্থাপনী, আগাম্যের মাথায় উপস্থাপনী বহুবলু. এক, কি, আরেহ, কি, হু  
 কবচের বহুবলু. এক, কি, আরেহ, কি, হু. ১৯৯২ সালে বহুবলু কন্যা জননেত্রী  
 শেখ হামিদারকে জনৈক মহিলায় নাম উপস্থাপন করে বহুবলু, কেন্দ্রের  
 জনৈক জানতেন আরেহ।

বহুবলু কন্যা জননেত্রী শেখ হামিদার সন্তান সন্তান কবচের, কি, কেন্দ্র এই  
 কেন্দ্র? কবচের (কবচের) কবচের কেন্দ্রের কেন্দ্রের কেন্দ্রের কেন্দ্রের।

আগাম্যের মাথায় উপস্থাপনী আগাম্যের বহুবলু কন্যা শেখ হামিদার  
 শোনার পর তাই, কি বহুবলু 'ক' হয়ে যান। আরেহ একটি উপস্থাপন না  
 দিয়া কেন্দ্র।

## জিল্লুর রহমান জেনারেল সেক্রেটারী

দানমতি নজিশে বঙ্গবন্ধু জননের মাইলদেবী কাছে যেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, শেখ হাফিজুর রহমান টোকন, শেখ মাহমুদ এবং আরো কয়েকজন গল্প করছে। আওয়ামী লীগের আলম কাউন্সিলে কারে জেনারেল সেক্রেটারী করা যায় কথা উঠলে বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সারেকলা চৌধুরী মেয়ে মানুষ, কারে জেনারেল সেক্রেটারী হারা চলে না। তোমরা এখন একজন পুরুষের নাম বল, যে সবু নামেই পুরুষ। কিন্তু কারে কর্মে মেয়ে মানুষের চেয়েও নৈসনতিস। পুরুষ চরিত্রের কোন পুরুষকে জেনারেল সেক্রেটারী বানানো যাবে না। পুরুষ চরিত্রের কোন পুরুষকে মনের সেক্রেটারী করলে সে আমূল মাহমুদের মতো মন ভেঙ্গে ফেলবে। একজন পুরুষকেই মনের সাধারণ সম্পাদক করতে হবে, যে পুরুষ, নামে পুরুষ কাজে পুরুষ নয়। এমন একজন মেকনিকহীন পুরুষকেই মনের সাধারণ সম্পাদক করতে হবে। তোমরা খুঁজ। এমন একজনকে বের কর।

শেখ হাফিজুর রহমান টোকন বললো, কুখ জিল্লুর রহমানকে বানালে কেমন হয়?

কয়েক সপ্তে শেখ হাসিনা বললেন, উয়েস, তুমি ভো দিক বলেছে, ওই ভো সবচাইতে ফিটেই।

শেখ মাহমুদ কলসো, না, দুদু, (আপা) জিল্লুর রহমানকে বানানো যাবে না। জিল্লুর রহমান আর তার মই আই, ওি রহমান ১৫ই আগস্টের পর দুনি মাহমুদ ডালিমদের মাওয়াত করে বিরানী বান্না করে বাইরে ছিল। সুতরাং জিল্লুর রহমানকে তুমি জেনারেল সেক্রেটারী বানালে পর না।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, হ্যা, একেই আমান মনকার এই-ই সব দিক থেকে উপযুক্ত। জিল্লুর রহমানকেই মনের জেনারেল সেক্রেটারী করলে, ভেঙা বানিয়ে রাখা যাবে। এই ভেঙা থলার গুনি না থাকলেও উম্মানের কাঁচের যাবে না। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা থিকই আউসিল করে জিল্লুর রহমানকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক করলেন।

## টাকা আর লাশ

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার বাসভবনটিতে জীবনে দু'টি জিনিষ ছাড়া অন্য কোন কিছুই চিনেন নাই। জিনিষ দু'টির একটি হলো অর্থ, মানে টাকা। পরো আর অন্যটি হলো লাশ, মানে মাহমুদের লাশ। এই দু'টি জিনিষ ছাড়া তার কাছে নেত্রা, কর্মী, বক্তাব্যাপারী এবং অন্যান্য বান্না তার বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কাছে এসেছেন অনেক আছে কোনমিনই তিনি অন্য কোন কিছুই চান



নাই। এমন কি ২৮শে সেপ্টেম্বর তার অনুদিনে যারা টাকা ছাড়া অন্য কোন কিছু উপহার দিয়া অসন্তোষ, বদ্বৎস কন্যা শেখ হাসিনার ভবনভাৰ সাধে জ্বলন্ত কলতেন, এই গুলি আমি নেই না। আমি কানশ চাই। কানশ। কোন টাকা ছাড়া অন্য উপহার আমি গ্রহণ করি না।

১৬ নভেম্বর ২৮শে সেপ্টেম্বর গণভবনে বসেও তিনি একই কথা বলেছেন। জুজের দলী বদ্বৎস কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রধান দাবী। আপনি যেই হোন না হোন! যেখানে থেকেই টাকা দিয়া আসেন না কেন, বদ্বৎস কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার কথা হচ্ছে শুধুই টাকা দিতে হবে। যদি টাকা না দেন তাহলে তার (শেখ হাসিনার) কাছে মানুষ হিসেবেই গণ্য হবেন না। বদ্বৎস কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে তার হাতে টাকা দেবেন, তার হাতের টাকা বা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গ তিনি (শেখ হাসিনা) আপনাকে কথা বোঝান কুলে থেকে টাকার জন্য নতুন হকেলের দিকে ছাড় বাড়িয়ে দিবেন। এমনভাবে তিনি টাকা নেবেন, যেন তার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান আপনার কাছে টাকা চেয়েছিলেন, তিনি শেখ হাসিনা পিতার উত্তরাধিকার হিসেবে পিতার টাকাই আপনার কাছে থেকে নিচ্ছেন। টাকা চাই-ই চাই। টাকা দিতেই হবে। ছুরি করে টাকা এনেছেন, তাও দিতে হবে। কালো বাজারী বা পাচার করে টাকা এনেছেন, তাও দিতে হবে। মানুষ খুন করে টাকা এনেছেন তাও দিতে হবে। যুগ থেকে টাকা এনেছেন তাও দিতে হবে।

যুগ থেকে এবং যুগ দিতে বদ্বৎস কন্যা শেখ হাসিনার ছুরী থাকা তার। টাকা না দিলে আপনাকে যুগের মতো অপমান করে বের করে দিতে পারেন, আবার টাকা দিতেই আপনাকে সমালব্ধ করে স্বর্গের দিয়ার চেয়ারে বসাতে পারেন।

একমিনিট পানমতি দক্ষিণে বদ্বৎস ভবনের দায়িত্বী করে বসে আসেন বদ্বৎস কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং তার দায়িত্বী চাই শেখ হেলাল। এমন সময়ে বজ্রবুর রহমান (শেখ মুজিবের পি, এ, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিয়ারজো পাকিস্তান) জনৈক ব্যক্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে বঙ্গলো, মেট্রী ইনি একটা অনুষ্ঠান করতে চায়...। বঙ্গলো বদ্বৎসের কথা শেষ না হতেই বদ্বৎস কন্যা শেখ হাসিনা বেগে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে আপত্তক সোচ্চারিত বলছেন, এখানে কি উত্তরাধিকার করে এসেছেন? বাধাধিকার আর জাফা পান না? আপনাকে না বলে নিলামি, আমি খাব না। আরও এনেছেন বুঝি কাকতালী করতে? আপনি কোথাকার কোন আলতু-ফালতু লোক তার দিক নাই। আর আমি আলতু-ফালতু লোকের আলতু-ফালতু অনুষ্ঠানে যাব এটা

জানবেন কি করে? আমি জাতিত জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা, আমার কি কোন নাম নেই? যান বেড়িয়ে যান। এই লোককে বের করে দাও। এইমোক যেন আর চুকতে না পারে। শুভলোক প্রদর্শন ইত্যাকিমে গেলেও নিজেকে কোনমতে সামান্য নিয়ম দীর পায়ে বেড়িয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেক সন্ধ্যা পর্যন্ত গেলেই শেষ হেলায়কে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলছেন, ইহ চন্ডা মেয় না, আমার টিউপা-এর লোক। এই কথা শুনে শুভলোক ঘুরে বাঁকিয়ে এসেছি, যেন তার প্যাটের হুঁপধকটি থেকে দুটি একশত টাকার ব্যক্তিগত বের করে এক ঘায়ে শেখ হাসিনার চৌবলের সামনে এসে পড়াশুন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ভিলের মধ্যে ঠোঁ মেয়ে একশত টাকার ব্যক্তিগত দুটি নিজের হাতত নিয়া শুধু লোককে বলতে লাগলেন কনেন, কনেন। এই উলকে চা-মাত্রা অগুণ্ড।

শেখ হেলায় আমার টাকার ব্যক্তিগত দুটি মেতরার কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে শুভলোকের সামনেই কাড়াএছি শুরু করলে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এর বঙ্গবন্ধু শুভলোককে বঙ্গবন্ধু লাগলেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি যাব। অনুগ্রহটি একটি করো করে করেন। আপনি আসবেন। যময়ন আসবেন।

১৯৯২ সাল থেকে যমুনা সেতুর নির্মাণা প্রতিষ্ঠান কোরিয়ান হুন্ডাই কোম্পানী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়মিত চান দিত্ত আসত। আর সেই সময়ই যমুনা সেতু উদ্বোধনের কার্যক দিন আগে উক্ত বঙ্গবন্ধু কন্যা নিয়মিত যান হাইন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যমুনা নদীর পাড়ে গেলে হুন্ডাই কর্তৃপক্ষ যান হাইন নির্মাণে হুন্ডাই কোম্পানীর ক্রাউ, অনিষ্টম, ও নিয়মানের অভিযোগ জননেত্রী শেখ হাসিনার সর্বস্বত্ব বোঝাশুন নিরব থাকে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা অগুণী গীণের কোন নেতা কর্মীরকে কখনই নাতির কথা শোনান। অমর্শের কথা শোনাননি। তারপর কন্যা শোনান। সে-ই, তাঁর কাছে গিয়েছে তারকহ তিনি কারণে-অকারণে শুধু বলছেন, আমি নির্দেশ দিলাম মেয়ে লাশ হেঁদে লাও। জদি লাশ চাই।

অগুণী গীণের স্বর্ধমান হুন্ডাই অনেকই বলছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তো টাকা আর লুণ্ডে ছাড়া কিছুই বুঝে না। আর কত টাকা দিব, আর কত লাশ দিব? অবক্ষয়। অবক্ষয়।

শিল্পপতি জাহির হত্যার প্রধান কুনি আসামী ইউনিবিলিএক ব্যাংকের পরিচালক চেয়ারম্যান অজ্ঞানজ্ঞানম বাবু বলেন, আর কত টাকা দিব, নিতে নিতে তো নিরশের হয়ে গেলাম।

## স্বামীর সাথে না থাকা

বঙ্গবন্ধু কন্যা আশরাফী নীল সত্যেন্দ্রী শেখ হুসিনা ১৯৮১ সালের ১৭ই মে বাংলাদেশে আসার পর থেকে তার জামি তঃ ওয়ারেজ মিল্লাব সাথে কনসই একটি মিন বা একাটি হাত হামী-ত্বী হিসেবে কাটাগনি। অসমাই বলেছি, শেখ হুসিনা বাংলাদেশে আসার পর ওয়ারেজ তার জামিও মহাশক্তি নতকটি কোয়ার্টার উঠেন, পরে খানমতি নজিরে তার পিত্রনের বঙ্গবন্ধু কনস, তারপর ২৯ নম্বর খিদিয়া হোজ এবং তারও পরে খানমতি ও মাহারে জামি ও নির্দেশ থাকিবে এবং ত্রমস ওয়ারেজীও মঙ্গলীও হাঙ্গলবনে থাকেন। কিন্তু তার জামি ও ওয়ারেজ ওয়ার থেকে এখন পর্যন্ত তার (তঃ ওয়ারেজের) মহাশক্তি আনবিক শক্তি কহি-শনের কোয়ার্টারেই রয়েছেন। তিনি কনসোই খানমতি মাহিনা, ২৯ খিদিয়ারেজ, খানমতি ও এবং মঙ্গলবনে আসেননি এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হুসিনাও তাকে আসেননি। শুধু তাই-ই নয়, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হুসিনা যখন তার জামিও মহাশক্তি কোয়ার্টারে থাকতেন তখন তঃ ওয়ারেজ থাকতেন ঐ কোয়ার্টারের ভিতরেই বসেই হাঙ্গল। দু'জনার দু'জনের মধ্যে হাঙ্গল-মিনে দেখা লক্ষ্যই তো মনে, মহাশক্তিও হাঙ্গল না।

মহাশালি স্বামী'র তেজস্বীভাবে প্রাকৃতিক এবং পরবর্তীতে জনস্বার্থে প্রতিবেশে  
 শিক্কাপায় বহুবলু ভবনে থাকতে, ১৯৮৭ সালে মুন্সিগঞ্জ হরিশ্চন্দ্র কলকর প্রভৃতি  
 সংসদসদস্য ডি. বি. মুনাস প্রাঙ্গণে মান নায়েক ভবন যুবক আসাদ আল শর্মিত  
 বসনকৃত কন্যা শেখ হান্নিমা নিয়মিত, কঠিন অফিসজবের প্রতিদিন সম্ভার টিক  
 এক স্বামী দ্বায়ে পেশাগত কাজে গতিভার, শারীরিকভাবে হেবে গতা গমনের একটি স্বামী  
 করে, চকচকে নতুন শাড়ী দ্বায়ে পড়ে খুবই পরিপাটি হলে কাউকে নড়ে না  
 নিজে শুধু তার গাফিলি ভাবতে ক্রীড়ার প্রাঙ্গণে শুধু নিজে অস্বস্তি ভরান যেদিন  
 হেবেদন এবং স্বামী দ্বায়ে পড়ে চিত্তে অস্বস্তি, শুধু এই সময় এই ভাবতে হলে  
 গাওয়া হুজা বসনকৃত কন্যা শেখ হান্নিমা আর কখনই এগা শুধু স্বামী শাড়ী আর  
 হেবেদন নিজে বাইরে হেবেদন না। এই সময় এবং এই প্রকার স্থান হাজা হেবেদন  
 তিনি হেবেদন তার সাধের সকলকে অবশ্যই নড়ে বিয়ে হেবেদন

[illegible]







এ ছবি প্রথম দল প্রথম বর্ষের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম দল প্রথম বর্ষের ছাত্রদের।



এই চিত্রে ভক্তন কলক, মুম্বাইতে প্রবেশ করছেন এবং প্রবেশের পরে তিনি কলক কলক



## হিন্দুরা কেন আওয়ামী লীগ সমর্থন করে

এদেশের সকল হিন্দু এতদ্বারা কায়মনো হিন্দুত্বকে বিশ্বাস করে। হিন্দুরা এই দেশে থাকলেও হিন্দুত্ব বা হিন্দুত্বের ভারতকেই তাদের দেশ মনে করে। বাংলাদেশকে কখনোই হিন্দুত্ব তাদের দেশ মনে করে না। তবে তাদের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশ একদিন না একদিন হিন্দুদের রাজ্য ভারতের নথিতে থাকবে। আর এই বিষয়ে তারা আওয়ামী লীগকে নিকট বন্ধু মনে করে। এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় বড় বিদ্বান, একমাত্র আওয়ামী লীগই হচ্ছে বিশ্ব ও নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক দল, যে দলের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একদিন না একদিন হিন্দুত্বের অধীনে নেওয়া হবে। আর এই কারণেই এদেশের আগামের হিন্দু সম্প্রদায় আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে এবং আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়। হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি পরিবারের মহাসচিব প্রাক্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডাঃ নিমন্ত্রণ ভৌমিক এর মতে আওয়ামী লীগই হচ্ছে এদেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল, যে দল ভারত পাকিস্তান যাদু বা সংঘর্ষে ভারতকেই সমর্থন করেছে, শক্তি যোগাবে। এই জন্যই এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়, শক্তি যোগায়। বঙ্গ শিক্তি মিষ্টির জোকানদার রাম হরি মহামন্ত্রীর মতে একদিন দেখা আওয়ামী লীগে কোন মূল্যমানই থাকবে না। তখন এই আওয়ামী লীগই হিন্দু লীগ হইবে। আমরা ভয় হিন্দে বিশ্বাস করি। ভয় হিন্দু, ভয় বাংলা। প্রোবানে বিপত্তি নেইহনি? আসাত ভয় লুপা, ভয় মা কানী, ভয় বাংলা একই ফনি। তাইলে আওয়ামী লীগ করুনা, ভয় করুনা কি? আওয়ামী লীগ তো আধা হিন্দুই, এক সময় পুরাতন হিন্দু হইরা গাইবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মন বিজ্ঞানের উপপদস্থ হিন্দু কর্মকর্তার মতে আওয়ামী লীগ হচ্ছে বাঙালিদের বিশ্বাসী দল তাই, হিন্দু সম্প্রদায় আওয়ামী লীগে বিশ্বাসী সম্প্রদায়। এদেশের হিন্দুরা আওয়ামী লীগকে বন্ধু ভোট দেয় না। ভয় দেয়, বুদ্ধি দেয়। অন্য তারা শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এদেশের হিন্দু সাংবাদিকরা সাপাল পরিবেশনের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করে। সবচাইতে চতুর ও বিশ্বাস্য ব্যাপার হলো, হিন্দু বিচারপতিরাও বিচারে পক্ষপাতিত্ব করে। হিন্দু নিয়ন্ত্রণপতিত্ব, বিচারপতির আসনে বসে প্রথমেই গোপাল চেষ্টা করেন, ব্যক্তি বা বিপত্তি কোন রাজনৈতিক দলের লোক বা সমর্থক। যদি আওয়ামী লীগের লোক বা সমর্থক হয়, তাহলে তাকে মতটি সমর্থন বন্ধ দেওয়া হয়। আর যদি আওয়ামী লীগের লোক বা সমর্থক না হয়ে অন্যদলের লোক বা সমর্থক হয় তাহলে তাকে মতটি সমর্থন বন্ধ দেওয়া হয়।

প্রশাসনে ও ব্যবসায় প্রাক্তন হিন্দু সম্প্রদায় বৈধ বা অবৈধ ভাবে তাদের উপার্জিত অর্থের একটি অংশ অবলীলাক্রমে শেখ হাসিনাকে দেয় এবং রাতি সম্পূর্ণ অংশ ভারতে পাচার করে।



এই দেশের হিন্দু সম্প্রদায় চাকুরীজীবী হোক আর ব্যবসায়ী হোক, অবশীল্যক্রমে এই দেশের সকল ধন-সম্পদ ভারতে পাচার করে। চাকুরীজীবী বৈধ-অবৈধ যেভাবেই অর্থ উপার্জন করুক অথবা অসহ পথে ঘুর দুর্নীতির মাধ্যমেই অর্থ উপার্জন করুক কিংবা চাকুরীর সেতনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুক। সেইভাবেই উপার্জন করুক তাদের উপার্জিত সকল ধন-সম্পদই ভারতে পাচার করবে। হিন্দু ব্যবসায়ীদের কেউও একই কথা গ্রহণে না। হিন্দু সম্প্রদায় তখনোই এই দেশকে তাদের দেশ মনে করে না। আর তাই এই দেশ থেকে বৈধ-অবৈধভাবে উপার্জিত লমুদয় অর্থ ভারতে পাচার করে।

অনুরূপভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পরিবার-পরিজন সকলেই এই দেশকে নিজের দেশ মনে করে না। আর সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা বৈধ অবৈধ যেভাবেই অর্থকরী উপার্জন করুক না কেন বাংলাদেশে একটি ফুটাকড়িও রাখেন না। তাদের উপার্জিত সকল ধন-সম্পদ বিদেশে পাচার করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পরিবারের শোচনীয় প্রধানত ভারত, নিয়াদুয়, হংকং, লন্ডন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ধন-সম্পদ পাচার করে।

## ভাট প্রত্যাখ্যান

১৯৯২ সালে বেগম খালেদা জিয়ার বি, এন, পি সরকার বাংলাদেশে প্রথম ভাট প্রথা চালু করে। খালেদা জিয়া ভাট চালু করার সময় তখনকার বিজ্ঞানী দলীয়া নেত্রী শেখ হাসিনা এবং তার তল আওয়ামী লীগ ভাট প্রথা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে ভাট প্রথা বাতিলের দাবিতে মিছিল সমাবেশ করে বেগম জিয়া সরকারকে নির্দিষ্ট সময় সীমা দিয়ে নিরোত্তরীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলতেন, এর মধ্যে ভাট প্রথা বাতিল না করলে হরতাল করা হবে।

তখন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বলা হলো আপনি যে ভাট বাতিলের জন্য হরতাল আহ্বান করতে যাচ্ছেন, আপনি ক্ষমতারা গেলে কি করবেন? ভাট প্রথা বাতিল করবেন?

পরেরটা পরে হবে, এই কথা বলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ঠিকই ভাট বাতিলের দাবিতে হরতাল করতেন। আর তিনি (শেখ হাসিনা) যখন ক্ষমতায় আসেন তখন ভাট বাতিল তো দূরের কথা, উল্টো ভাটের আওতা আরো বাড়িয়ে দিলেন। অর্থাৎ বেগম খালেদা জিয়া সরকার যে সকল পণ্যের উপর ভাট বসিয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেই সকল পণ্যের উপর ভাট বহাল তো রাখলেনই বরং যে সমস্ত পণ্যের উপর ভাট ছিল না সেই সমস্ত পণ্যের উপরও ভাট ধার্য করলেন।

## খেলা

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা মিত্রকে একজন বড় খেলোয়াড় মনে করেন। তিনি মনে করেন, তিনি দুনিয়ার সবচেঁহি়ে বড় খেলোয়াড়। এবং তাঁর মতো খেলোয়াড়ের সত্তা বিধে কোন ছুটি নেই। তিনি খেলতে ভালবাসেন। বলতে গেলে খেলাই তাঁর একমাত্র কাজ। তিনি সকলের সাথেই খেলেন। জনতার সাথে খেলেন। রাজনৈতিক নেতাদের সাথে খেলেন। বিজ্ঞানের লোকের কর্মীদের সাথে খেলেন। স্বাক্ষর সাথে খেলেন। আর্থিকজ্ঞানের সাথেও খেলেন, তবে কম খেলেন। নিজের ছাত্রের সাথে খেলেন, গুরু শিষ্য উঠেন না, মরা পরে হেরে যান। হোসে-মেরের সাথে খেলতে বিধে হাজির মাত্র খেয়ে যান।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা মনে করেন তাঁর মতো একটা বড় খেলোয়াড় আর নেই। এবং তিনি যে খেলা খেলেন, তা খেলায় ধরতে যা বুঝার পড়ি কারো নেই। পৃথিবীতে কেউই তাঁর খেলা ধরতে পারবে না। বুঝতে পারবে না। এ খেলায় তিনি অকল্যা, অমিতীয়া।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যে খেলা খেলেন, সে খেলায় নাম হচ্ছে, প্রজাতন্ত্রের খেলা। তিনি সকলের সাথেই প্রজাতন্ত্রের খেলা করেন।

## প্রিয়-অপ্রিয়, পছন্দ-অপছন্দ

প্রিয় খাদ্য : গরুর ছুটি।

প্রিয় গান : জিৎকণি জিৎকণি।

প্রিয় ব্যক্তি : মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।

সবাইকে বেশি স্নেহ : টানবর গজ।

সব চাইতে অসহ্যের : লাবণী মানুষ।

সব চাইতে স্নিগ্ধ এবং কামন্দ : মানুষের পাখ।

সব চেয়ে বেশি পড়তে চিপো বলায়।

## প্রথম নির্দেশ

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রথম নির্দেশ মেয়ে ফেল। মেয়ে লাগ খেলতে লাগ। আরওমী বঁগের কোন তেজা, ফরী ফিরো সমর্থক কন্যা প্রথমেরও যদি বলে হশাগানের অঞ্চল অন্য রাজনৈতিক বলেই কম্বু আদ্যদের বিপক্ষে, তাহলে সঠিক বলে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রথমেই যে নির্দেশ বা আদেশ দেন তাহলে মেয়ে ফেল। মেয়ে ফেলে দাও। আমি হকুম লিখা পুন কর খেল।

যদি কোন কারণে উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা না যায়, তাহলে মদনমোহন চুপ  
চাপ। টাকা লাও। টাকা নিয়ে ওকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসো।

১৯৯৭ সালে নাওয়া যোভ নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় যাওয়ার সময় ফেরীতে ৩০/৪০  
বৎসর অল্প বেশ থেকে যুক্তরাজ্যে চলে যাওয়া, যুক্তরাজ্যে নাগরিক শেষ  
হাসিনা সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত শিল্প অর্থ সংস্থার পরিচালক প্রফেসর আব্দুল  
আসেম তার নিজ থানার নবাবগঞ্জ সম্পর্কে বললেন, নবাবগঞ্জে (ঢাকা জিলায়)  
আওয়ামী লীগের প্রার্থী দেওয়া না দেওয়া সমান কথা। নবাবগঞ্জের মানুষ  
আওয়ামী লীগকে পছন্দ করে না, ভোটও দেয় না।

এই কথা শুনে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, তাদের  
অজ্ঞানতার দরদ মতো আশ্রয় লাগিয়ে দেন। আশ্রয় লাগিয়ে শুদের প্রতিফল মেঝে  
ফেলেন।

## কোন নেতা ছিল না

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কখনোই কোন সিদ্ধান্তই কোন নেতা বা  
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অথবা উপদেষ্টা কিংবা আদর্শ-গুরুর কোন ব্যক্তির সাথে আলোচনা  
করে নিতেন না। মূলত তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন তার চাকপাশে থাকা  
ছেলে হোকবা এবং আত্মীয়দের কথার উপর ভর করে। এমন কি বঙ্গবন্ধু কন্যা  
কোন পদযাত্রা, মিছিলে ইত্যাদিতে যখন অংশ নেন তখন কোন নেতা বা  
নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি তার সাথে কখনোই থাকতেন না। কোন নেতা বা ঐ  
জাতীয় কোন ব্যক্তি কুল ক্রমে যদি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রীর পাশে এসে পড়তো  
তাহলে তার সাথে থাকা হতো হোকবা বা ঐ নেতা বা ব্যক্তিকে ভাগ্যচুড়ি ও  
জালর এমনকি গায়ে ওতা নিয়ে আড়িয়ে নিতো। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ  
হাসিনা এসব বুঝতেন না বা দেখতেন না তা নয়। তিনি এ সবই আড়ালে  
দেখতেন, মজা নিতেন, খার খিল খিল করে হাসতেন। মূলত বঙ্গবন্ধু কন্যা  
জননেত্রী শেখ হাসিনার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার ফলেই তার সাথে থাকা ছেলে  
হোকবা নেতাদের সাথে ঐ রকম চকম বেয়ানদী আচরণ-আচরণ করতে সাহস  
পেতো।



শেখ হাসিনার এই জীশ গাড়ি ছাড়া (শেখ হাসিনা) যেমন দূর হয়ে যানকারী রাস্তা মোহন নদ এর নদে ফেলিয়ে দিলে।



শেখ হাসিনার গাড়ি ছাড়া (শেখ হাসিনা) যেমন দূর হয়ে যানকারী রাস্তা মোহন নদ এর নদে ফেলিয়ে দিলে।

সংবাদ পত্রের ছবিতে দেখা যায় শেখ হাসিনার গাড়িপাশে ছোলাচোকাগাই খিটে আছে।





1940-41



1940-41



## চিন্তা জীবনা ছাড়াই বলা

যেমন কথা জারী বা ঘোষণা দেওয়ার ব্যাপারেও কারো মাথের কখনই কোন আলোচনা করা হতো নব্বের কথা নিয়েও কোন চিন্তা জীবনা না করেই বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা মুখে সাই আসেন, তাই বলে চেতন বা তাই ঘোষণা নিয়ে দেন। অপরদীর্ঘ শীঘ্রই নেতৃত্ব এবং অতানুযায়ীরা সব সময় টাইও খাটেন, এই কৃষ্ণি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বেধানে কিছু বলে চেতেন।

১৯৯৭ সালের ১০ই জানুয়ারী রমলা বটমুন্ডে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার মন্ত্রী সভার মন্ত্রী তোকারেল আহমেদকে হাত ধরে নেবিয়ে হঠক বলে উঠলেন, "এই যে, তোকারেল চাইয়েরা ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ক্যাবিনার সার্ভিসে অধ্যাপক শোকনের চাকরী নিয়ে ছিলো, তার এই কথাই দাড়াইলো তিনি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বলছেন বা ঘোষণা করছেন বর্তমানে তারই মন্ত্রী তোকারেল আহমেদ সাবেক প্রধানমন্ত্রী তারই শিষ্য শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম ক্যাবিনার (বিনিএস) সার্ভিসে অধ্যাপক শোকনের চাকরী বা নিয়োগ বিদ্রোহে। প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হিসেবে এই কথা প্রকাশ্যে বলায় পর (তার পরদিন সমস্ত গত্র পরিচয় এই কথার ছাপা হয়েছে) বাংলাদেশ ক্যাবিনার সার্ভিস (বি. সি. কন ৭৩) ১৯৭৩-এর সকালের অধ্যাপককে প্রতিযোগে চাকরী দাওয়া উঠিবে। এবং রাষ্ট্রের তৎকালীন প্রধান নির্বাহী বা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের অধ্যাপক শোককে চাকরী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বিদ্রোহ হওয়া উঠিবে। নইলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মান হাসিনা মহম্মা হওয়া উঠিবে।

## রাজা বাদশা রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের জুনিয়র সিনিয়র নেতারা একদিন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার পুত্র জায়ে বঙ্গবন্ধু, আমরা আছি আপনি যখন প্রধানমন্ত্রী হবেন তখন আপনার সঙ্গে আমরা আছি।

জয় বঙ্গবন্ধু, "প্রধানমন্ত্রী! রাষ্ট্রপতি! মানুষের কলমে ভোট চিত্রা করে? ভোট চিত্রা করে আমি কোন দিন রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হব না। আমি রাজা বালায় তাইলে আছি, নইলে নাই।"

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "বাবা আমরা তো রাজাই, আগামীতে তো কুমিই রাজা হব। কোনো নাম তো একেবারে রাজাই ছিলেন, তোমার নামই তো এই বেশ কুটি করেছে, এই দেশের মালিক ছিল। চাকর দাকতরা বঙ্গবন্ধু কন্যা তোমার নামকে ছেড়ে সিংহাসন নব্বল করেছে।

আলীদারী বা যেমন দাবার নব্বল ছিলেন, তদাপরে তাঁর গাতি মিরাকন্দোদা নব্বল হতেছিল। তোমার নাম শেখ মুজিবুর রহমানও বাংলাদেশের রাজা ছিল, আগামীতে কুমিই বাংলাদেশের রাজা হবে। রাজা বাদশাদের আধুনিক নামই রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী।

বহুবলু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনের আগে মূলত এবং প্রধানত তিনটি ওয়ার্ডা করেছিলেন। এই তিনটি তত্ত্বাবধায় ওয়ার্ডার প্রথমটি হচ্ছে রোহিও টেলিভিশন এর ব্যাবস্থাপনা।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ (যে আইনে বিনা বিচারে যে কাউকে কারাগারে আটক রাখা হয়ে) বাতিল করতে এবং তৃতীয় হচ্ছে বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে আলাদা বা পৃথক করবেন।

এই তিনটি ওয়ার্ডার প্রথমটি টেলিভিশন ও রেডিওর ব্যবস্থাপনা দাখল হবে। এটা করার বা সেবার কোনই প্রয়োজন পড়ে না। এরশাদ-এর আমলে বহুবলু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা লক্ষ লক্ষ বার টেলিভিশনকে বন্ধেছেন নাহেব, বিবি, গোলামের দ্বারা।

বেশম খালেদা জিয়ার আমলে বিরোধীদল ও লাগামহীনভাবে এমন কোন অনুষ্ঠান নাই যেখানে টেলিভিশনের কথা তিনি বিবি, গোলামের দ্বারা বলেননি।

এখন সেই বহুবলু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী হয়ে তার ওয়ার্ডা প্রথমভাবে পূরণ করেছেন যে মানুষ এমন বলে বাপ বেটির দ্বারা।

আর দ্বিতীয় ওয়ার্ডা বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪? প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিনা বিচারে মানুষকে কারাগারে রাখাও এই কালো আইনটি বাতিল করবেন কিভাবে? কোন মুক্তিতে? এ যে তার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান তৈরী করা কালো আইন। এই বিশেষ ক্ষমতা আইনেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা মাহবুব প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযোদ্ধাসহ এসেগের হাজার হাজার গির্জাঘর নিরপরাধ মানুষকে বিনা বিচারে কারাগারে আটকে রেখেছিল। পিতার সৃষ্টি করা মানুষকে নিপীড়িত করা ও অত্যাচার করা এই কালো আইন তিনি বাতিল করলে, পিতার যোগ্য কন্যা, যোগ্য উত্তরসূরী তিনি কিভাবে দাবি করবেন?

তাই তিনি ক্ষমতায় বেয়েই বলেন, বিশেষ ক্ষমতা আইন ৭৪ নে তো বাতিল করার প্রবুই আসল না। এই তো যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যা, যোগ্য উত্তরসূরী। বাপকা বেটা এই কালো আইনটি ও শু পুরোপুরী বহালই রাখলেন না। এর কার্যকারিতাও প্রয়োগ করতে লাগলেন। কালো আইনের এই প্রয়োগ করতে যোগে বিরোধী দলের চার নেতাকে বিনা কারণে, বিনা বিচারে কারাগারে আটকে রাখলে, মহারান্য আদালত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারকে শাস্তি দ্বারা অর্পণ দত্ত দেয়। এর পরও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওয়ার্ডার কথা তো মনে হয়ইনি, লজ্জাও হয়নি। হাজার হলেও শাসিত তৈরী করা এবং তেখে বাওয়া, তাই কালো আইনটি বহালই রেখেছেন। এবং তৃতীয় ওয়ার্ডা বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে আলাদা বা পৃথক করা এ নিয়ে তিনি ভুলেও টু শব্দ করেছেন না। বেমানম তেখে করেছেন।



## চাটি ভাতিজির কাণ্ড

এক স্বল্পবয়সে বিকেলে শেষ দুপুরের একমাত্র আপন ভাই শেষ নামেরের বিধবা স্ত্রী শেষ হেপালের বা প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনার জ্যেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন খণ্ডবনে এসে প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনাকে বললেন, "মা তোমাকে তো পাই-ই না। তুমি এতো ব্যস্ত থাকো। এই জন্য আমি আসি-ই না। খাটতে খাটতে তুমি একদম বাহিল হয়ে গেলে। এক কান কান মা, সন্ধ্যা দুইদিন ছুটি নিয়ে লাও। কর্মচাণীও বুশি হয়ে গে। আমরাত তোমাকে পানো।

আপনি ঠিকই তো কইছেন চাটি। এই কথা বলে প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনা তার পরের দিনই সন্ধ্যা দুইদিন ছুটি দোষণা করলেন। চারদিনকে এবং পত্রপত্রিকায় সন্ধ্যা দুইদিন ছুটি ঘোষণা নিয়ে আলোচনা সমালোচনার কড় উঠলো। পত্র পত্রিকায় আলোচনা-সমালোচনায় সবচেয়ে বেশি কলঙ্ক সবচেয়ে বিশ্বাসের সাথে যা কলা হলো, তা হলো, সরকারের নীতি নির্ধারণকায় সন্ধ্যা দুই দিন ছুটির ব্যাপারে কিছুই জানেন না। এমন কি মন্ত্রী সভার সদস্যরাও দুই দিন ছুটির ব্যাপারে কিছুই জ্ঞানেন না। এবং সন্ধ্যা দুই দিন ছুটির সারীও কেউ করেনি। তাহলে কার লাখে আলোচনা করে পরামর্শ করে সন্ধ্যা দুই দিন ছুটি দেওয়া হলো? এই নিয়ে পত্র পত্রিকায় অনেক দিন পর্যন্ত হইচই চললো। গ্রুপ গ্রুপি থেকে গেল। উত্তর মিললো না। কেউ জানতে পারলো না। বুঝতে পারলো না। অবিস্মার করতে পারলো না এ যে চাটি ভাতিজির কাণ্ড।

## ইয়েস ম্যাডাম, কারেন্ট ম্যাডাম

ইয়েস ম্যাডাম, কারেন্ট ম্যাডাম। প্রধাননের কাজ শুধু মন্ত্রী/প্রধানমন্ত্রীদের বুশি করা। বিশেষত প্রধানমন্ত্রীকে বা যদি এটিপতি প্রধান নির্বাহী হন তাহলে রাষ্ট্রপতিকে বুশি করা। বাড়ীর ভাঙন বা বাড়িটিকে যদি মনির কিছু হুম্ব করেন। তাহলে ভাঙন বা বাড়িও মনিরকে তার হুম্বের দ্বারা-হুম্ব কিছু করতে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ করলে অনেকের কর্মকর্তারা তখনই নির্দেশের জামানত সম্পূর্ণ প্রধানমন্ত্রীকে কিছুই করতে না।

মনির যদি বাড়িটিকে সকাল দশ/এগারোটায় বাইরের কাজের হুম্ব করেন, তাহলে বাড়ি মনিরকে বলবে, আমি এখন বাইরে গেলে রান্নার ফ্রি হবে, আপনার বাড়ির অসুবিধা হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সে আদেশ দেন সরকারী কর্মকর্তারা সে আদেশ মতোই কাজ করে যান।

প্রধানমন্ত্রীর মুকামটিং, সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রধানের কাজ হচ্ছে ভোরে ঘুম থেকে উঠে পকেটে কাপড় এবং কলম নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনার বাসভবনে হাজির হওয়া। এবং প্রধানমন্ত্রী ঘুম থেকে উঠে যখন যা কলমেন, তা

পকেটের কাগজে লেখা ও সেই মতো কাজ করে যাওয়া। এই কাজের ভাল-মন্দ সম্পর্কে জায়া কখনোই কোন অভিমত তেন না। শুধু বলেন ইয়েস ম্যাডাম, কারেকট ম্যাডাম, এইট ম্যাডাম। প্রধানমন্ত্রীর আদেশ নির্দেশের মধ্যে সরকারী কর্মকর্তারা ভাল ছড়া কখনোই মন্দ কিছুই লেখেন না।

একোটা কর্মকর্তাদের অভিমত হলো, ভাল-মন্দের নামভাষ ভো আমানত না। আমরা সরকারী কর্মচারী। সরকার যা বলবে তা যে নির্দেশ কল্পনেন আমরা তাই করবো। ভাল-মন্দের দায়-দায়িত্ব সরকারের। মার্শাল 'ল' সরকার আসুক, আর জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সরকারই আসুক, যখন যে সরকার আসবে, আমরা সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে সেই সরকারের হুকুম শুকাম পালন করবো। এই-ই আমাদের কাজ। ভাল-মন্দ কাজের হিলাফ দিলাফ করার দায়িত্ব সরকারের এবং খালি সরকার নির্বাচিত করেছে তাদের। সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী হিসেবে আমাদের একমাত্র কাজ সরকারকে বুশি করা। সরকারকে মানে প্রধানমন্ত্রীকে বড় বুশি করতে পারবে আমরাও তাইই সম্মত হতে পারব।

## কাকে প্রথম সব হতে হবে

কাকে প্রথম সব হতে হবে? আমাদের দেশের যে কতক সবুজ, এই অবস্থায় জায়া প্রশ্ন সব হওয়া এতোজন? না কাকে প্রথম সব করা সরকার? সারা দেশের নমস্ত প্রশাসনের কাছে রকে অনেক ব্যক্তিদের যে জনততা, এই অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে, দেশকে বাঁচাতে হলে, প্রশাসনের কোন ব্যক্তিকে প্রথম সব হতে হবে? এই রকম এটা চিন্তা, একটা ভাবনা এবং অনুসন্ধান গীর্ষ মিন ধরে মাথায় ঘুওপাক বাঁজিয়ে। কিন্তু এই চিন্তা, ভাবনা এবং অনুসন্ধানের খুব একটা ফল পাওয়া যায়নি না। আমার মাথা থেকে এটা ফেনে বেওয়াও ঘন্সিৎ না। দেশের এই অহিনক্স অবস্থায় প্রশাসনের কাকে প্রথম সব হওয়া উচিত, কে প্রথম সব হলে প্রশাসনের অসং ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে আসবে? এবং আছে, আছে, ধীরে, ধীরে প্রশাসন ও দেশ থেকে ঘুও ও মূর্খাতি নূর হবে? মাথার এই ভাবনাটা নূর না হতেই, ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ বন বিভাগের কল্পনাভাষ রেড হাউস-এ বন বিভাগের ডি, এক, ও (চিডিবিএলস কার্টে অফিসার)দের এক বৈঠক বসলো। প্রায় বিশ পঁচিশ জন ডি, এক ও বৈঠকে উপস্থিত হলেন। বৈঠকের আলোচ্য বিষয়: সরকার কর্তৃক মজুন সি, সি, এক (চিফ কন্স্ট্রাক্টর ভেটর অফ ফরেস্ট) বা প্রধান বন সংরক্ষক নিয়োগ দান প্রসঙ্গ। ডি, একও নেত বৈঠকে আলোচনা হলো, নূতন সি, সি, এক প্রার্থী পাঁচ জন। এই পাঁচ জনের মধ্যে কর্তবানে গিনি সি, সি, এক আছেন গিনি চাকরীর মেয়াদ লাড়িয়ে সি, সি, এক পদে আরো থাকতে চান। এবং ব্যক্তি চারজন সি, এক (কনজারভেটর অফ ফরেস্ট) সি, সি, এক হতে চান। এই পাঁচ জন সি, সি, এক প্রার্থীই আগায়া আগায়া ভাবে ডি, এক প্রসঙ্গ মাথার ঘুও বা টাঙ্গা হিসেবে নোট অফের টাঙ্গা

সম্মেলন । ডি. এক ও নের কাছে থেকে এই মেটী অধের টাকা নিয়ে সি, সি, এক প্রার্থীরা নিজস্ব ব্যবস্থাপনা বা নিজস্ব আদ্যনে সি, সি, এক ইত্যাদি অন্য বনমন্ত্রীকে খুব বিরম্ব । এবং সেই হেতু সি, সি, এক একটা তৎপূর্ণ নম্ব তাই এই পক্ষে কাজকে নিয়োগ দেওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর একটা সফতি বনমন্ত্রীকে নিতেই হবে । আর তাই সি, সি, এক প্রার্থীদের কাছে থেকে নেওয়া খুবের টাকা থেকে একটা বড় অংশ প্রধানমন্ত্রীকে বনমন্ত্রীর দিতে হবে । নইলে সি, সি, এক পক্ষ নিয়োগ দেওয়া হবে না । বনমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে খুব দেওয়ার এই প্রতিশোধীতাও যে প্রার্থী-সম্পর্কিত খুবের টাকা দেবেন তিনিই সি, সি, এক হবেন । এই জন্যই সি, সি, এক প্রার্থীরা ডি. এক ও নের কাছে জালি অধের টাকা দাবি করেছে । ডি. এক ও নের আশোচর্য বিবরণ হলো, আমরা যে সি, সি, এক প্রার্থীকে টাকা দিব তিনি সি, সি, এক না হবে, যে প্রার্থীকে টাকা দিব না সেই প্রার্থীই যদি সি, সি, এক হয়। যার তাহলে তো আমাদের বনমি করে হেড কোয়ার্টারে নিয়ে কর্মসূচি করতে বাধ্য হবে । ডি. এক, ও হিসেবে ফিল্ড থেকে দেখাচ্ছে যে টাকার দারো কানাম্ব, আ বক হয়ে দায়ে । তাই সর্বনমতি হ্রদে ডি. এক ও বন মন্ত্রীর নিক সি, সি, এক, প্রার্থীকে বনমি টাকা দেওয়া হবে । এবং দেওয়া হলোও তাই ।

যিনি কতন সি, সি, এক হয়েছেন (আব্দুল সাত্তার) । তিনি মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর টাকা একত্রে করে বনমন্ত্রীর কাছে না নিয়ে, আগানা করে তিন তিন করে দিয়েছেন । নুতন সি, সি, এক জনার আব্দুল সাত্তার প্রধানমন্ত্রীর অংশ বনমন্ত্রীর হাতে না দিয়ে মোজা মলে গেলেন ডাকার বেশী রোগের টানছিল মিষ্টি খবর কিং লাগে লাগে কিছুটা তুলীয় অন্য বিডিং, ১২নাম্বর সিটি বেলী রোডে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কার্ণিয়ার কান ছোট বোন শেখ রেহানা'র অধিকৃত্য স্বামী শফিক সিদ্দিকী চাক-চোক পিটিয়ে অনবিকারক চেম্বার বুলেছেন । সেখানে গিড়ে শফিক সিদ্দিকীকে না পেয়ে সি, সি, এক, প্রার্থী আব্দুল সাত্তার সেলেন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা'র হানিকারনাগীন বিব্রত মগরেব সুখার্হেন মালমিগ রেইংকেন । এই রেইংকেনের সানেকার ইসলামকে ওদনিয়ের নিম্ন খুলে ধরার পর সানেকার ইসলাম সি, সি, এক প্রার্থী আব্দুল সাত্তারকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেছেন বনমন্ত্রীর আবদন টাওয়ারের মিচ ওয়া'র অধিকৃত শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা'দের সালিকানাগীন অপর রেইংকেন ফাউকেন ফরহন রেইংকেন এড বার'-এ । সি, সি, এক প্রার্থী আব্দুল সাত্তার একানই শফিক সিদ্দিকীর হাতে প্রধানমন্ত্রী অংশটা দিলেন । এবং তিনি (জনাব আব্দুল সাত্তার) নুতন সি, সি, এক নিয়োগ পেলেন ।

আহলে কি গাঁড়াদো? এনেশ থেকে দুর্নীতি দূর করতে, খুব দূর করতে কাজে প্রথম সং হতে হবে?

বটুপতি বা প্রধানমন্ত্রী যিনি রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী আদ্যই প্রথম সং হতে হবে । প্রধানমন্ত্রীর সততা আর দক্ষতার মন্ত্রীরা সং হবে । তারপর সচিবরা । এই

ভাবনাই, আরো আরো দীর্ঘে দীর্ঘে গোলি নেশে লায় ও সতকার শানন কায়দে হতে পারে।

এই চিত্তাও সাথে বিমত পোষণ করে ছাঃ নাজরীন বেগম খানসী এম, বি, বি, এস, এম ও; জি ওপিডি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ঢাকা। এবং তার স্বামী ডাঃ প্রহলাদক বাবী শাবলু এম, বি, বি, এস, ই এম ও এম আই, সি, ডি, ডি শেখ-এ সাংলা নগর ঢাকা। অলোহন, সর্ব প্রথম জনগণকে সং হতে হবে। জনগণ কোন অবস্থাতেই যেন অসং ব্যক্তিরের নেত্র বা প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত না করে। নির্বাচিত করার আগে গণের মিকে না থাকিলে ব্যক্তির সতকার মিকে মজীর ভাবে লকা রেখে যেন ছোট দেয়। এবং জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে।

পেশার চিকিৎসক এই সম্পর্কে এই প্রসঙ্গে ধনমন্ডি মোহনপুর থেকে ১৯৯৯ সালের ১২ই জুনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ছাঃ কামাল হোসেন এর করা বললেন। চিকিৎসক সম্পর্কে অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বললেন, তারা ধনমন্ডি নির্বাচনী এলাকার ছোটসির। নির্বাচনের সময় তারা ঢাকার বাইরে ছিলেন। ছাঃ কামাল হোসেন-এর মতো একজন সং ও শিক্ষিত স্বেচ্ছা নির্বাচনে নির্ভিয়েছেন বলে তারা অত্যন্ত ভাবাছড়া ও কষ্ট করে ঢাকায় এসে ছাঃ কামাল হোসেনকে ছোট দেন। কিছু ছোট গননা দেখা গেল ছাঃ কামাল হোসেন শেখশীখরানে পরাজিত হয়েছেন। অপর ধনমন্ডি মোহনপুর এলাকার প্রায় সকল ছোটগরই শিক্ষিত। তাই এই সতকার স্বামী-স্ত্রীর অভিমত হলো, সর্বপ্রথম জনগণকে সং হতে হবে। ঠিক হতে হবে। সং ও শিক্ষিত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে হবে। অহনাই আমাদের নেশে সং ও নায়মের শানন প্রতিষ্ঠিত হবে।



জুনিয়র হুসেন আবদুল করীম শেখ-জাতিয়ার বাংলাদেশের কার্যনির্বাহী  
এবং ছোট কোন শেখ বেগমের স্বামী সক্তিও মিনিকী।



## সূরে সূরে কথা বলা

রাজনীতিতে সূরে সূরে কথা বলতে হয়। পার্টি বা সংগঠনের মূল নেতা বা নেত্রী যিনি, তার সূরে সূরে কথা বলতে হয়। আপনি যে পর্ষদের নেতা বা কর্মীই হন না কেন, পার্টি বা সংগঠনের অকথা বাস্তব মূল নেতা যিনি, যার হাতে মূল ক্ষমতা, তিনি যদি চেষ্টা করে তার সুপুত্রও বলেন এমন হাত, আপনাকেও তাই করতে হবে। যদিও তখন তার সুপুত্র, তবুও তুলসীও তা বলতে পারবেন না। যদি সূরে সূরে কথা না বলে, সত্য কথা বলেন, তাহলেই আপনি নেতার কাছে হারান অসহযোগ্য। একটি। নেতা বা নেত্রী যা বলবেন তা বতাই অসত্য বা ভুল হোক না কেন, তা আপনাকে তুলে তুলে সূরে সূরে টিক সব টিক বলে যেতে হবে। যদি তা না পারেন, তাহলে আর যা হোক অসত্য রাজনীতিতে সাইন করতে পারবেন না। যোগ্য হতে পারবেন না। আর রাজনীতিতে যিনি মূল নেতা/নেত্রী বা ক্ষমতার মূল মালিক, অর্থাৎ যিনি স্বতন্ত্র কেন্দ্রবিন্দু, তার কাজ হয়, যে তার সাথে তুলে তুলে মিলিয়ে সূরে সূরে কথা বলবে বা কাজ করবে, তাকেই সবচেয়ে যোগ্য ও আনুগত্যশীল বলে কথা। এর সাইরে তিনি আর কিছুই মনে করতে পারেন না। অর্থাৎ তুল করেই হোক, অথবা ইচ্ছে করেই হোক, তিনি মিলকে হাতে ধরেছেন, আর অধীনস্থ কোন নেতা বা কর্মী যদি তা শুধরে দেয় তাহলেই তিনি ধরে নেন অধীনস্থ এই লোক তার প্রতি আনুগত্যশীল নয়, যোগ্যও নয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে অওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে তিনি যা বলবেন বা করবেন তা বহুতক হোক, না হোক, অবশ্যই বলতে হবে ঠিক, সবটাই ঠিক। বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার রাজনীতিতে প্রথম কথা হল, তার (শেখ হাসিনার) কোন ভুল থাকতে পারে না। কেউ যদি মনে করে তার (শেখ হাসিনার) ভুল হয়েছে তাহলে তাকে রাজনীতির প্রথম কথা পুষিয়ে বতাব করতে হবে। ঠিক, ঠিক, নেত্রী আপনি যা বলছেন, যা যা করেছেন তা সব ঠিক। শেখ হাসিনার রাজনীতিতে যারা একান্তে চলেছে তাহাই উপরত উল্টোই এবং নকল হয়েছে।

## কোন শিক্ষা নেয়নি

রাষ্ট্রশাসক বা রাজনীতিক নেতাদের ইতিহাসে সবচেয়ে কম কমতাপ্রসূ ব্যক্তি, যার সূত্রের কথাই নকল। কোটি মানুষ উজ্জ্বল হতে, দার অসুখীর স্বাস্থ্যের সারি সারি মানুষ মুক্তির দিকে ছুটে যেতো, পথের কল্যাণের আলোয় নবদ্বারে হাত তুলে নিজেদের জন্য দোয়া করার কথা ভুলে গিয়ে যাত্রা জন্য মানুষ দোয়া করতো, তিনি শেখ মুজিবুর রহমান। কেউ কেউ তাকে জাতির পিতা বহুবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, কেউ কেউ বলেন না। বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ

জাতির শিক্ষা বহুবলু বলেন না, স্বীকার করেন না এবং মাজেন না। কিন্তু তিনি  
 যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি এটি সবসেই স্বীকার করেন।  
 ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জনমিলনে ফজলের আহান হুসে, আসসালামু খায়রুণ  
 মিয়ান নাইম, আসসালামু খায়রুণ মিয়ান নাইম। মুসল্লিগা শব্দা ফেড়ে নামাজে  
 যাবে—তিন সেই সময় বাংলাদেশের সবচেয়েইত কমজা হক হাজি, রাষ্ট্রপতি  
 শেখ মুজিবুর রহমান কাদের জন্য, ওয়ু রহমের জন্য, মীর্শা তিনদকী মাফে তিনদকী  
 তার চেই। তৎপরই না করেছেন। তার আগ বাঁচায় জায়া সেনাবাহিনী প্রধানের  
 কাছে ফোন করেছেন। সেনাবাহিনীর জায়া ত্রিগেড কমান্ডারের কাছে ফোন  
 করেছেন। তার নিয়ন্ত্রণের মাফিড়ে নিয়ন্ত্রিত সেনা ইউনিট প্রধানের কাছে ফোন  
 করেছেন। পুলিশের আই জায়ে কাছে ফোন করেছেন। পুলিশ কন্ট্রোল রুমের ফোন  
 করেছেন। গণভবনে ফোন করেছেন। কিন্তু কোন জায়া ফেড়েই একই সাজা  
 শব্দে এসে না। সর্বশক্তিমান পরর কমজাময় জায়া হকমুল আলামীন শেখ  
 মুজিবুর রহমান ও তার পরিবার পরিজনের স্বীকণ স্বপ্নের জন্য একটি মানুষকেও  
 পার্শ্বাঙ্গন না। যে ব্যক্তিরা এতো লোকজন, এতো চাপ তলোয়ারে, এতো  
 অনুগামী, এতো অমজা, তাতে সাহস্য করতে, তার আগ বাঁচাতে কেউ-ই  
 এগিয়ে এসে না।

মানুষের জন্য নির্ভরিত জাণ, দেশপ্রেমিককে বন্দি করে বিচার না করে  
 বন্দিগৃহ হাতে হানকান পরর অবস্থায় নামানে থেকে দুকে গুলি করে হত্যা করে  
 পবিত্র পার্শ্বাঙ্গনে দাফিয়ে নজর সাগর কোথায় নিয়াজ সিওদার বলে ওঁ কর  
 জায়, স্বাধীনতার ইত্তেহাদ পার্শ্বাঙ্গী এম, এ, রশিদ শেখ মুজিবুরের জায়ে শেখ  
 শহীদ বখশ হাজলীশের অভ্যঙ্গি করুন এম, এ, রশিদ হাজলীশের সাধারণ  
 দাম্পত্য। শেখ কমজামের সাগে স্বপ্নের কারণে এম-এ রশিদ লীর্থকিন শেখ  
 মুজিবুর রহমানের কাছে ফাননি।

এম, এ, রশিদ বলেন, বহুবলু যে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মাফা ফাননি এটি  
 মাফি দুকতে পেজাফাননি। শেখ মনি জাইফের অনুগেয়ে ৭৫-এর জুলাই আগটে  
 আহি যখন গণভবনে বহুবলুর সাগে মেগা করত মাই, আমাকে দেখেই বহুবলু  
 বলে উঠলেন, পৃথিবীতে এমন কেউ আছে, যে আমার সবচেয়ে হাজির হাব না।  
 বলে অটহাসি নিগেন। সেই কথা তার হাজিতে ছিল জাফানক অহংকার প্রভত  
 গড়িনা। ওখনই অহাও মন বলে উঠল, বহুবলু আর বেশি দিন পৃথিবীতে নেই।

১৫ই আগস্টের শিক্ষা হুসে, আফাফকে জা করা। সব সময় আফাফকে হাজরে  
 কথা। মানুষের প্রতি অমানুষের আচরণ না করা। মানুষকে সন্মান করা। নিজেকে  
 সর্বসর্বা মনে না করা। মানুষকে ভালবাসা।

আত্মঅহমিকা ও গরিমা বর্জন করা। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় শেখ  
 হানিমা, শেখ বেহানা এবং তাদের পরিবার পরিজন আত্মীয়রা ১৫ই আগস্ট থেকে  
 কিছুমাত্র শিক্ষা নেয়নি। বরং ১৫ই আগস্টের ঘটনা থেকে তারা আরো কৃপিকা  
 জর্জন করলো। তারা মানুষকে মূল পরিমানেও ভালবাসে না। মানুষকে অপমান  
 অপদত্ত করে প্রচণ্ড আনন্দ কোথ করে।

## আব কত টাকা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ছোট পোন শেখ রেহানার এখন একই ব্যালকনি। একই হিসেব। দুই পোনের মধ্যে অনেক কমড়া-কাটিং পর দু'জনে হিসেব একটি প্রকাজিনী হওয়ায় বিনিময়ে আপোষ করা হয়েছে। এই দুই পোনের বর্তমানে আমেরিকায় (মার্কিন দুকরাট্রি) তিনটি ডিপার্টমেন্টাল গৌরব হয়েছে। এক একটি চম্পায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে পুতুল ও তার স্বামী। অপরটি চম্পায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে জয়। এবং তৃতীয়টি চম্পায় প্রধানমন্ত্রীর ছোটপোন শেখ রেহানার ছেলে ববি। এছাড়া এই দুই পোনের বিভিন্ন দেশে প্রায় তিন থেকে চার হাজার কোটি টাকা নগদ আছে। প্রধানমন্ত্রীর চাচাতো ভাই শেখ হেলাল এম পি প্রায় হাজার কোটি টাকার উপরে মালিক। প্রধানমন্ত্রীর চাচাতো পোন লুনা এবং মিনা শত শত কোটি টাকার মালিক। প্রধানমন্ত্রীর অপর চাচাতো ভাই কামরুজ ও তার অন্যান্য ভাইয়েরা শত কোটি টাকার মালিক হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গাজাতো চাচা শেখ হাজিজুর রহমান টোকন প্রায় পাঁচ শত কোটি টাকার মালিক। প্রধানমন্ত্রী বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে প্রধানমন্ত্রী এ. পি. এস. হাফিজুর নাসিম এবং তার চাচাতো ভাই প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসিক ডিকিউজিটি নজিব আহমেদ নজিব ও তার ভাইয়েরা মিলে বর্তমানে কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব এবং দুই সম্পর্কের মাঝামাঝিদের এমন কেউ নেই, যিনি বর্তমানে শত কোটি টাকার মালিক হননি।

## স্বাধীনতা ঘোষণা, দিবস, জাতীয় পতাকা, সর্বাঙ্গ বিতর্ক

একটা প্রচলিত বক্তব্যটি সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করলাম। নিরস্ত্র অস্ত্রাধি সশস্ত্র হওয়া, প্রকৃতপক্ষে জীবন বিলিয়ে দিল। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বা মুক্তিযুদ্ধে পৃথিবীর অন্যান্য দেশও প্রভাব এবং পরোক্ষভাবে কাজিয়ে পড়লো। ভারত মুক্তিবাহিনীর সাথে এক হয়ে যুদ্ধ করলো। মার্কিন দুকরাট্রি আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য সতর্ক নৌবহর পাঠালো। সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের পক্ষে মার্কিন সতর্ক নৌবহর-এর মোকাবেলা করার জন্য সশিষ্ট নৌবহর পাঠালো। বিশ্বের অন্যান্য দেশও পরোক্ষভাবে পক্ষে-বিপক্ষে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কাজিয়ে পড়লো। সারা দুনিয়া ঝোপপাড় করে প্রায় এক শত পাকিস্তানি হানাদার সৈনিককে গ্রেপ্তার করে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ নাব আমরা বিজয়ী হলাম। স্বাধীন হলাম। কিন্তু এরপরও আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা দিচ্ছে, স্বাধীনতা দিবস নিয়ে, জাতীয় পতাকা নিয়ে, জাতীয় সর্বাঙ্গ নিয়ে বিতর্ক প্রচেষ্টা বেশ। অনেকই অবশ্যে পাইলন এসব ছোটখাটো ভুলে ব্যাপার নিয়ে বিতর্ক করে

কোন দাত নেই। আমরা অনেকেই জানতে পারেন, যা এসব আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বিষয়। এর স্বীকারোক্তি বা সমাধান হওয়া বরফার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা আশরাফী মুক্তিযোদ্ধা ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকার এক প্রবন্ধ লিখে শেখ হাসিনা সরকারের কাছে দাবী করেছেন, ২৬শে মার্চের পরিবর্তে এই মার্চকে আমাদের স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করতে হবে। ডঃ নীলিমা ইব্রাহীমের এই দাবি করার মুক্তি হচ্ছে, তার (ডঃ নীলিমা) ভাষায়, আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই মার্চের মোহনগুপ্তাদী (ব্রেনকোর্স মরদান) উদ্যানের ভাষণে বলেছেন “এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম” অতএব এই মার্চই আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা দিবস।

এক মুক্তিযোদ্ধা দাবী করেছেন বর্তমানে আমরা জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে যে তবীজ সঙ্গীতটি (আমরা বোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি) গাই এটি আমাদের প্রকৃত জাতীয় সঙ্গীত নয়। দেশ স্বাধীনতার পরে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে মহল নিশায়েয় চাপিয়ে দেওয়া এটি একটি বদীভ সঙ্গীত মাত্র। যা এদেশের কোন কবি সাহিত্যিক দ্বারা রচিত হয়নি। এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে এ গান গাওয়া হয়নি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে যে গানটি গেয়েছিল, যে গান গেয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র খোলা হতো এবং বন্ধ হতো, আমরা মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেনিং এর সময় জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে যে গান গেয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতাম, সেই “জয় বাংলা বাংলার জয়” গানটিই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। অতএব এই গানকেই পুনরায় জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হোক। অপর এক মুক্তিযোদ্ধা পত্রিকায় দাবী করেছেন বর্তমানে যে পতাকাকে জাতীয় পতাকা হিসেবে উত্তোলন করা হয়, এ পতাকা প্রকৃত জাতীয় পতাকা নয়। বর্তমান পতাকা হচ্ছে প্রকৃত জাতীয় পতাকার পরিস্ফীক রূপ। যা স্বাধীনতার পরে চাপিয়ে দেওয়া হয়। পোটা বাসালি জাতি বৈষ্ময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে শূন্যে, এবং, যত্নে প্রত্যেক ঘরে ঘরে জাতীয় পতাকা হিসেবে, যে পতাকা উড়িয়ে স্বাধীনতা দাবী করেছে, এবং যে পতাকার তলে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নিয়েছে, এবং আমরা মুক্তিযোদ্ধারা যে পতাকার তলে দাঁড়িয়ে জীবন দিয়ে পতাকার সর্ঘনা রক্ষার শপথ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ নিশিষ্টে নিয়েছে, সেই সবুজ পতাকার গালদুও হৃদয় সংযেব বাংলাদেশের মানচিত্র ইচিত পতাকাই আমাদের প্রকৃত জাতীয় পতাকা। আমরা সেই পতাকাকেই জাতীয় পতাকা হিসেবে দেখতে চাই। বর্তমানে যে পতাকা রয়েছে এ হচ্ছে প্রকৃত



জাতীয় পতাকার বিকৃত রূপ। যা স্বাধীনতার পরে জাতির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।

এছাড়া স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে বিতর্ক তো তত থেকে এখন পর্যন্ত চলেছেই। অর্থাৎ কে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, তা নিয়ে বাংলাদেশের জন্য কোন কোন অন্যান্যি অবিস্মৃত বিতর্ক চলছে। কিন্তু সত্যি বলতে কি কে স্বাধীনতার ঘোষক? এই বিতর্কের অহমান তা সর্বজন সম্মত নয়। হয়নি। কেউ বলছেন শেখ মুজিবুর রহমানই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। কেউ বলছেন জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। যখন যিনি ক্ষমতায় আসছেন বা এই দুইজনের মধ্যে যখন দার সমর্থকরা আটটা ক্ষমতায় আসছেন তেইটা টেলিভিশনে তাকেই স্বাধীনতার ঘোষক বলে ঘোষণা চালিয়ে আসছেন। কিন্তু আসলে কে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন? খড়ীও ভাবে একমুখিত্রে এর অনুমান ও গবেষণা এবং বিচার বিশ্লেষণ করা একান্ত জরুরী নয়। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করলাম, আর আমাদের স্বাধীনতার প্রকৃত ঘোষক বুকে বের করতে পারছি না। এটা হতে পারে না। আমরা যদি আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক বুকে না পাই, তাহলে তো অগত্যা প্রথম একমুখি আমরা যে দেশ স্বাধীন করেছে, সেটাও বুকে পাবে না। আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক আমাদের বুকে গেতে হবে। গবেষণা, অনুমান ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনে আমাদের অতীতে ফিরে যেতে হবে।

১৯৭০ সালে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক কাঠামোতে যে নির্বাচন হয়, সেই নির্বাচনে গোটা (সাতের সাত কোটি) বাঙালি জাতি শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রকৃত ও অস্থিতীয় নেতা হিসেবে নির্বাচিত করে। দুই শত বছর পর স্বাধীন বাংলা বাঙালি জাতি স্বাধীনতার জন্য মুক্তি পাগল হয়ে শত করা পঁচানব্বই লাখ ভোট দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে তাদের নেতা নির্বাচন করে। বাঙালি জাতি তার ক্ষমত্ব আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন এবং পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার সকল দায়দায়িত্ব শেখ মুজিবুর রহমানের উপরে একমুখভাবে ন্যস্ত করে। গ্রামে গায়ে শহরে বন্ধের সর্বত্র স্বাধীনতা পাগল কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতার মুখে একটাই প্রোগান, একটাই দাবি, পাকিস্তানের মুখে লাগি মার বাংলাদেশ স্বাধীন করো। মুক্তি পাগল বাঙালি রাষ্ট্রের লায়ি নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে।

২রা মার্চ মাঠে, ঘাটে, বাজারে, গ্রামে গায়ে শহরে, বাড়ী-ঘরে সাতা-ঘাটে দেশের সর্বত্র বাঙালি জাতি তার প্রিয় পতাকা, স্বাধীন বাংলাদেশ পতাকা টানিয়ে মিল। সবুজ পতাকার লাল বৃত্তে হসুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশ পতাকা সারা বাংলাদেশ আকাশে পতপত করে উড়তে লাগলো। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অনেক জায়গায় ক্যাম্পের চুইকেন দিবে অত্র চাপিন্দার (প্রশিক্ষণের) মহড়া চলতে লাগলো।

এরনি পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ বেনকোর্স ময়দানে (বর্তমানে মোহরাওয়ানী উদ্যান) জনসভা ডাকলেন। ৭ই মার্চের বেনকোর্সের এই জনসভায় কক কক লোক কাদের লাঠি নিয়ে সমবেত হলো। এই জনসভায় ভাষণ দেওয়ার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান তাজুদ্দিন আহমেদের এবং ডঃ কামাল হোসেনকে একটি বক্তৃতা নিয়ে দেওয়ার জন্য নাস্তিহু নিলেন। তিনি (শেখ মুজিবুর রহমান) তাজুদ্দিন আহমেদ (বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী) এবং ডঃ কামাল হোসেনকে বললেন, তোমরা আমার ৭ই মার্চের বক্তৃতার পরেই তৈরি করে দিবে এবং আমি ঐ পরোক্ষ এর উপরে নিজের আশ্রয় বক্তৃতা করবো। তিনি আরো বললেন, তোমরা বক্তৃতার পরোক্ষগুলো এমনভাবে করবে যাতে আমি ঐ পরোক্ষগুলো বক্তৃতায় বসলে পাকিস্তান ক্যাম্পের কোন কতি না হয় এবং লাঠিয়ান আইনে তা বেন বেলাইনি না হয়।

তাজুদ্দিন আহমেদ ও ডঃ কামাল হোসেন দুজনে মিলে শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পরোক্ষ তৈরী করে বেন। এবং ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান যখন বক্তৃতা দিতে থাকেন, তাজুদ্দিন আহমেদ যখন বক্তৃতার ভাষণে মিলে বসে বক্তৃতার পরোক্ষগুলো মিলিয়ে দেখতে থাকেন। শেখ মুজিবুর রহমান তাজুদ্দিন আহমেদ, ডঃ কামাল হোসেন এবং অন্যান্য নেতাদের বলেন, এবার আমাকে পাকিস্তানের ক্ষমতা দিতে হবে। যদি আমাকে ক্ষমতা না দেয়, তাহলে তোমাদের যা করার তোমরা তা করবে।

এই কথাগুলো ৩১শে অক্টোবর শনিবার ১৯৭৮ সন্থা মার্চটির ১২৩/১২৪ মতিঝিল মেট্রোপলিটন চেম্বার বিডিং-এর তৃতীয় তলায় তাঁর নিজের চেম্বারে বসে ডঃ কামাল হোসেন নিজের মুখে ধালছেন। ডঃ কামাল হোসেন আরো বলেছেন এবং দুরত্বের সহায় বলেছেন তিনি এবং কারিগর আফিকুল ইসলামই শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে (প্রাতঃ বসন্তী প্রায়ঃসীমা) দানমন্ডি বড়িশ নাম্বারে বসবস্তুঃ দান্য থেকে দ্বন্দ্ববস্তুঃ সাথে কথা বলে নেতিয়ে এসে সোজা তাজুদ্দিন আহমেদের বাসায় যান। কিন্তু তখন পর্যন্ত বসবস্তুঃ শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়ে কিছুই বলেননি।

ডঃ কামাল হোসেন তাজুদ্দিন আহমেদের বাসায় থাকতেই প্রাতঃ সাতঃ দ্বাদশটি একটার কুমিল্লা থেকে নির্ধারিত এম, এম, এ (মেম্বার অব ন্যাশনাল গ্র্যানেডলী) দুজাফক সাহেব এসে স্বদর দেন যে, পাকিস্তান আর্মি গিলদান (বর্তমান বি.ডি.আর হেড কোয়ার্টার) রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার এবং

নিবীহ সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ করেছিল। এই লোকের শোনার পর  
আজুদিন আহমেদের সহকর্মী যাক যাক নিরাপত্তা স্থানে পালিয়ে যান।

পঁচিশে মার্চ বা তার পরে, তার কোথায় কারে কোনও এবং কিভাবে বন্দক  
শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন জিজ্ঞাস করা হলে তার কামাল  
হোসেন বলেন এটা আমার জানা নেই। অনেকদিন কিনা জিজ্ঞাস করা হলে তার  
কামাল বলেন, না আমি জড়ান। আমাকে কেউ বলেনি।

কবে কোন সময়ে বন্দকদের প্রেরণ করা হয়? জানতে চাইলে তার কামাল  
বলেন এসব বিষয়ে বলাইতো ভাল বলতে পারবেন কর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ  
হাসিনা, কেননা তিনি তখন বন্দকদের কন্যা ছিলেন। এই ব্যক্তিওই ছিলেন।  
একমাত্র বন্দক পরিবারের সদস্য ছাড়া এমনকি অধিক উচ্চ অন্য কেউ নিতে  
পারেন না। তার কামাল হোসেনকে এপ্রিল মাসের ৪ তারিখ প্রেরণ করা হয়।  
৪ঠা এপ্রিল '৭১ মাস তার কামাল রেজার ইওয়ান পার্বত শেখ মুজিবুর রহমান,  
আজুদীন আহমেদসহ কারো মাঝেই কোন প্রকার ঘোষণাও তাঁর হয়নি। ৪ঠা  
এপ্রিল মেজার করে তার কামাল হোসেনকে প্রথমে ঢাকা জাতীয়সেবাই নিয়োগ  
প্রাপ্ত হয়। এবং এই এপ্রিল '৭১ মাস পাকিস্তানের রাজধানী রাওয়ালপিন্ডির  
হরিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

পাকিস্তানের হরিপুর জেলে এই এপ্রিল থেকে ২৬শে জিসের পর্যন্ত তার  
কামাল হোসেনকে রাখা হয়। এই জেলে তার কামালকে মানসিক নির্ধাতন করা  
হয়। মোটা মোটা লোহার খাঁচা নিয়ে খেঁচা ছোট একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে  
নাইরে কখনোই তার কামাল হোসেনকে পের হতে দেওয়া হতনি। তার কামালকে  
কখনোই কোন গরম কাপড়পত্র বা রেডিও সেওয়া হতো না। '৭১ মাসের  
জিসের মাসের সাধারণিক সময়ের পর ২৪শে করে পাকিস্তান জেনারেলপত্র তার  
কামাল হোসেনের দাঁতে সন্ধানজনক আচরণ করতে শুরু করলে তিনি একটা  
খিচাটী পরিবর্তন করতে ভাল মনে মনে খবরা করেন। ২৮শে জিসের  
পাকিস্তানের প্রাচ্য জেলার অধিন্য নিয়োগ দেই হাউসে তার কামাল হোসেন এবং  
বন্দক শেখ মুজিবুর রহমান এক সঙ্গে মিলিত হয়।

কেউ কেউ বলেছেন এবং দাবি করেছেন যে, '৭১ মাসের ২৫শে মার্চের  
নিরাপত্তা হাত ১২টার পর অর্থাৎ দড়ির সময় অনুযায়ী ২৬ শে মার্চ হাতে শেখ  
মুজিবুর রহমান টেলিগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।  
যদিও শেখ মুজিবুর রহমান নিজে কখনই বলেননি যে, ২৬শে মার্চ তিনি  
স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। তারপরও বন্দক ও নিজের নিপ্রেবদের প্রয়োজন  
এই দাবী মেনে নিলে কি লেখা থাকে? টেলিগ্রাম হচ্ছে এমন একটি বিনা যে এর  
একজন প্রেরক এবং একজন প্রাপক থাকতে হবে। শেখ মুজিবুর রহমান যদি

শ্রেয়ক হিসেবে টেলিগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই একজন প্রাপক হিসেবে টেলিগ্রামটি পেয়েছেন। সেই প্রাপকটি কে? শেখ মুজিবুর রহমান টেলিগ্রামটি কায় কান্ধে পাঠিয়ে ছিলেন? অর্থাৎ টেলিগ্রামের প্রাপক কে ছিলেন? আজ পর্যন্ত সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তির কথা মিললো না, পরিচয় মিললো না, কল্য হলে টেলিগ্রামের মাধ্যমে ঘোষণা পাঠান হয়েছে, অথচ যার কাছে পাঠানো হয়েছে অনুসন্ধান করেও তার হুদিস মিলবে না, ঐতিহাসিক গ্রন্থাকলনেও প্রাপকের সন্ধান মিলবে না, এটা দৃষ্টিক নয়। টেলিগ্রামের শ্রেয়ক থাকলে অতি অবশ্যই প্রাপক থাকতে হবে। প্রাপক ছাড়া টেলিগ্রাম প্রেরণ করা যায় না। এবং প্রাপক ছাড়া শ্রেয়কও থাকে না। যেহেতু প্রাপক নেই, সেহেতু শ্রেয়কও ছিল না বলে টেলিগ্রামে স্বাধীনতা ঘোষণার বিবৃতির সমাপ্তি টানা যেক পড়বে। অর্থাৎ ২৬শে মার্চ রাতে টেলিগ্রামের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে কোন দৃষ্টি নেই এবং অনুসন্ধান ব্যবস্থা, ও বিশ্লেষণ করে এর সঙ্গে কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সকল নেতৃস্থানীয় এবং বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, অন্তর্গামী গুপ্তপতি ইন্ডান নজরুল ইসলাম, মুন্সুর আলী, ডঃ কামাল হোসেন এবং অন্যরা নেতৃবৃন্দ থাকতে তাদের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণা না দিয়ে টেলিগ্রামের মাধ্যমে ঘোষণার কোন কারণ থাকতে পারে না।

৩: নীলিমা ইব্রাহীমের দাবি অনুযায়ী ৭ই মার্চের জামনেই (নীলিমাদি ভাসায়) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ৭ই মার্চই আমাদের স্বাধীনতা দিবস। যদি তাই হবে, তবে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ১০ই জানুয়ারী স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ফিরে এসে ছো বসলেন না যে, আমি ৭ই মার্চে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি এবং ৭ই মার্চই আমাদের স্বাধীনতা দিবস। উপরন্তু তিনিই (শেখ মুজিবুর রহমানই) স্বাধীন দেশের সরকার প্রধান হিসেবে ২৬শে মার্চকেই স্বাধীনতা দিবস হিসেবে প্রথম স্থান দেন।

শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের জামনের মধ্যবর্তী পর্যায়ের এক জাতিপাক ঠিকই বলেন "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" একথা বলেই তিনি পাকিস্তানী শাসকদের কাছে চাবটি শর্ত দিয়ে ছাত্র বক্তৃতা শেষ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান জামনের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশ্যে বলেন, আমার দাবি মানতে হবে প্রথম (১) সামরিক আইন মার্গাল 'ন' উইপুড করতে হবে। (২) সমস্ত সেনাবাহিনীর লোককে ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। (৩) যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। (৪) জন প্রতিনিধিদের কাছে (অর্থাৎ আর



নিজের কাছে) ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। এই চারটি নাবীর মধ্যে শেষ মুজিবর রহমান-এর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা, অর্থাৎ শেষ মুজিবর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করাই মুখ্য ও চরমত্বপূর্ণ দাবী। এখানে বিচার বিবেচনণ ও বিবেচনার বিষয় হলো যদি পাকিস্তানের সেনিটরী সেনারেল ইয়াহিয়া খান শেষ মুজিবের এই মার্চের দাবী, সেনে সিন্ধু তাহলে কি হলো? বাংলাদেশ কি স্বাধীন হলো? যদি নির্মলেন্দু গুপ্তের ভাষায়, তাহলে আর যদি হোক, এই দাবীও বাংলাদেশ স্বাধীন হলো না। শেষ মুজিবের এই মার্চের ভাবনের দাবী অনুযায়ী শেষ মুজিবকে যদি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হতো তাহলে নিশ্চয়ই বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। পাকিস্তানই থেকে যেতো। এই মার্চের ভাবনে শেষ মুজিবর রহমান পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে ইশিয়ার করে দিয়ে বললেন, ‘আমরা তোমাদের ভাতে মারব। পানিতে মারব। তোমরা আমার তাই, তোমরা ব্যাংকে গাড়, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।’

পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ রাত ১২টা পর্যন্ত ব্যাংকে বইল। কেউ বের হলো না। এখিকে পাকিস্তানীরা এই মার্চের পরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশে ঢাকা থেকে গ্যাংগা এয়ারপোর্ট (বিমান বন্দর) দিগন্ত কিমানে করে সিংহ-রাষ্ট্র ২৪ ঘণ্টা বৈমান আনতে লাগলো। এই মার্চের ভাষণে শেষ মুজিবর রহমান বললেন, ‘যে পর্যন্ত আমার দাবী আদায় না হবে রাজনা টেক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ নিবে না।’

জনগণ পাকিস্তান সরকারকে রাজনা টেক্স দেওয়া বন্ধ করে দিল। শেষ মুজিবর রহমান আরো বললেন, ‘এই পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পাচরা পাচরা হতে পারবে না। তিন ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে শুধু কর্মচারীদের মাটমাথায় দেওয়ায় জন্য।’ ত্রিকই ব্যাংকগুলো থেকে পাকিস্তানে এক পরসাত পাচরা হলো না। সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীরা শেষ মুজিবের নির্দেশই চলাতে লাগলো। সরকারী-বেসরকারী প্রশাসন সম্পূর্ণ রূপে শেষ মুজিবর রহমানের নিয়ন্ত্রনে চলে গেল।

এখানেই মাইল দূরে মাঝখানে ভারতের মতো সিংহ রাষ্ট্রের এখান থেকে পাকিস্তানের আর কিছুই করার থাকলো না। বাংলাদেশ কর্তৃক পাকিস্তান থেকে বিদ্রিষ্ট হতে আলাদা দেশে পরিণত হলো।

এই মার্চের জয়গে শেষ মুজিবর রহমান পাকিস্তান থেকে আর একটি সৈন্যও পূর্ব বাংলায় আসতে পারবে না, এই ভাবটি না বদায় বিমানে করে পাকিস্তান থেকে সৈন্য আসতেই লাগলো।

২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবস। এই পাকিস্তান দিবসে একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাক্ষরিত পাকি ছাত্র এই বাংলার সরকারী-বেসরকারী কোন অফিস আদালতে এবং কোথাও পাকিস্তানী পতাকার উত্তোলন দেখা যায়নি।

দেশের সর্বত্র উড়ছিলো স্বাধীন বাংলার পতাকা। কেবল মাত্র শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাক্ষিতে একমাত্র পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্র স্বাক্ষরিত ব্রিটিশ নাম্বারে শেখ মুজিবুর স্বাক্ষিতে শিয়ের জোরপূর্বক পাকিস্তানী পতাকা নাহিয়ে আত্ম আত্মন লাগিয়ে দেয়। ঐ সময় শেখ মুজিবুর রহমান জোর স্বাক্ষিতে থাকলেও ঘরের বাইরে আসেননি।

এক সাময়িক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে (আজকের বাংলাদেশে) যত পাকিস্তানী সৈন্য ছিল, তার শতাংশ ৬৫ শতাংশ ছিল বাঙালি, যারা ২৫শে মার্চের পর মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং ৩৫ শতাংশ ছিল মূল পাকিস্তানী (পাঞ্জাবী, বেহুচ, পার্শান)। এই ৩৫ শতাংশ পাকিস্তানী সৈন্যদের অধিকাংশ ছিল অফিসার যারা যুদ্ধ পরিচালনা করে। কিন্তু সরাসরি যুদ্ধ করে না।

আর ৬৫ শতাংশ বাঙালি পাকিস্তানী সৈনিকদের মধ্যে প্রায় সবই ছিল নন কমিশন জ্বর সিপাহী, যারা সরাসরি যুদ্ধ করে। '৭১-৬৪ ৭ই মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অবশিষ্ট ৩৫ শতাংশ সৈন্য, পাকিস্তানী বাঙালি ৬৫ শতাংশ সৈন্যের কাছে এক মস্তনের জিপি মশারই ছিল।

৭ই মার্চের পর থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানীরা, বাঙালি সৈন্যদের চাইতে ২০/৩০ জন বেশি অবশিষ্ট (পাঞ্জাবী, বেহুচ ইত্যাদি) সৈন্য তাকা আনে। এবং তারপরই পঁচিশে মার্চ রাত ১২টার পর বাঙালিদের উপর আক্রমণ করা করে।

শেখ মুজিবুর রহমান যদি সত্যিকার অর্থেই কখনো বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাইতেন তাহলে ৭ই মার্চের জায়ে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কর্মচার যাওয়ার দাবীর আড়ালে স্বাধীনতা প্রশ্নটি ছাপা না গিয়ে, পরিকার করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। গোটা বাঙালি জাতির দেওয়া স্বাধীনতা ঘোষণার ন্যাটকটি শেখ মুজিবুর রহমান যদি পালন করে হতো, আমি আজ থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন রুট্রি হিসেবে ঘোষণা করলাম, এখন থেকে পাকিস্তানের ব্যাধ আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই, আমরা স্বাধীন সার্বভৌম রুট্রি, আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। পাকিস্তান থেকে একটি সৈন্যও আর আসতে পারবে না। বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানী সৈন্যদের বন্ধী করা হলো। তাহলে দিনা রক্তপাত, দিনা যুদ্ধে, আমরা স্বাধীন রুট্রি এবং জাতি হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পেলাম।

হাতিবানে ভরতের মতো বিশাল শত্রু হাত্যা পাতি দিয়ে, এগারো শত নাইন দুই থেকে পাকিস্তানের ক্ষয় কিছুই করার থাকতো না। যেমন '৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী সৈন্যদের মশী করার পর পাকিস্তানীদের কিছুই করার ছিল না।

যুব বক্তৃতা ঘোর হলে পাকিস্তানী ৩৫ শতাবলি অব্যাহতি সৈন্যরা মাথো পইষটি ৩৫ শতাবলি সৈন্যদের একটি বুইই ছোটকাটো। এবং মীমিত মুক্ত বা লড়াই হতো বা কেবল মাত্র কাশ্মিরমেটেই সীমাবদ্ধ থাকতো। পরিবেশ পরিস্থিতি এবং সম্পূর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শেষ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করার দায়িত্ব পালন না করার, আমাদের স্বাধীনতা পেতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অব্যাহতি প্রাপ দিতে হয়েছে। লক্ষ লক্ষ না গোনের ইচ্ছা নিকে হয়েছে।

## ৭ই মার্চের ভাষণঃ ট্রেনেডাস কন্টিশনাল শিচ

আমলে শেষ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্লেষণ করতে দেখা যাবে পাকিস্তানের কর্মভার হাওয়ার জন্য, এটি একটি চমকপ্রদ অসাধারণ শর্তযুক্ত ভাষণ। ইচ্ছাভিত্তিক মতে বলা হবে ট্রেনেডাস কন্টিশনাল শিচ। এই ভাষণকে কোন বিচার বিশ্লেষণেই স্বাধীনতা ঘোষণা বলা যাবে না। ইতিহাসের বিচারে বিশ্লেষণে শেষ মুজিবর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণকে বলা যায় ট্রেনেডাস কন্টিশনাল শিচ বা চমকপ্রদ অসাধারণ শর্তযুক্ত ভাষণ। শেষ মুজিবর রহমান যদি ৭ই মার্চের ভাষণে প্রকৃত অর্থেই চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেই থাকতেন, তাহলে,

(১) ঐ ভাষণেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া আহে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দাবী করেছিলেন কেন? ঐ ভাষণের মুখা ও চরমদুর্পূর্ণ বিষয়ই ছিল শেষ মুজিবর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা।

(২) ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে শেষ মুজিবের দানমন্ডির বাড়িতে স্বাধীন বাংলাদেশ পতাকার পরিকল্পে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন কেন?

শেষ হাসিনার উক্তমাত্যের সরকারের মন্ত্রী আ, স, ম, রর দাবী করেছেন, কাষ্টিকভাবে ২৩ মার্চকে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন দিলা পালন করত হবে। ২৩ মার্চকে যদি স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন দিবস হিসেবে পালন করা হয়, তাহলে শেষ মুজিবর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের ককত্ব কতটুকু থাকে?

(৩) যেখানে ৭ই মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অব্যাহতি (পাঞ্জাবী, বেগুচ, সিদ্দি) দুর্বল হাজার পাঁচেক সৈন্যকে বন্দি করে প্রায় দিনা মুছে, দিনা চকুপাতে বাংলাদেশ স্বাধীন করা সম্ভব ছিল, তা না করে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশে) অধিক পাকিস্তানী (পাঞ্জাবী, বেগুচ, সিদ্দি) সৈন্য সমাবেশ করার

পূর্ণ সুযোগ নিয়ে ২৫শে বা ২৬শে মার্চ আমাদের উপর আক্রমণ করা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় নেওয়া হয়েছিল কেন?

(৪) ২৫শে মার্চ রাত্রে ঘরে ডঃ কামাল হোসেন থাকতে এবং হাফেজ কাদের জাজ্জিন আহাশ্বেদ (মুজিববাদের দফতর নেতৃবৃন্দানকারী অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী) সহ অন্যান্য আত্মীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকতেও শেষ মুজিবর রহমান কোন আশঙ্কা করেই বাতীলতা ঘোষণা দিচ্ছেন না?

(৫) ২৫শে মার্চের কাগজো রাত্রে, মির্জাহ নিরস্ত্র বাঙালিরা উপর পাকিস্তানী বাহিনী বাহিনী যখন পৈচাশিক আক্রমণ করলো এবং নির্বিচারে বাঙালি হত্যা করতে লাগলো; এবং বাঙালি সৈনিক, ই. পি. আর (ইউ পাকিস্তান আইফেল বর্তমানে সি. ডি. আর) পুলিশ অন্যান্য পাকিস্তানী হানাদকারী মেজাবেন্দার যুদ্ধ করতে লাগলো ওরন শেখ মুজিবর রহমান দিশেহারা বাঙালির নেতৃত্ব না দিয়ে কেন পাকিস্তানীদের কাছে দগ্না দিলেন?

(৬) তাহলে কি শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনা যে বলেন ২৬শে মার্চ দুপুর 'আড়াইটা তিনটায় পাকিস্তানের জেনারেল টিকা খান আমাদের বাসায় এসে আমাদের (শেখ মুজিবকে) সেলুট দিল, মাকে (বেগম মুজিব) সেলুট দিল, মিয়া আমাকে বললো মায়, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আপনার সাথে আলোচনা করার জন্য আমাকে একটি স্পেশাল বিমানসহ পাঠিয়েছে, আপনাকে রওয়ালপিন্ডি (পাকিস্তানের তৎকালীন রাজধানী) নিয়ে যাওয়ার জন্য। আপনি ব্যাডামকে (বেগম মুজিব) সাথে নিয়ে পারেন। আইলে অন্য কাউকেও নিতে পারেন।

আমাকে সবখানে জেনারেল টিকা খান নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় মাকে জেনারেল টিকা খান সেলুট নিয়ে গেল। তাহলে কি এটাই সত্য?

(৭) শেখ মুজিবর রহমান কি যখন করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তারক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বালানোর জন্য রওয়ালপিন্ডি নিয়ে যাবেন? আর তাই কি পাকিস্তান হানাদকার বাহিনীর আক্রমণের মুখে গোটা বাঙালি জাতিতে অসহায় আকিস্ত রেখে তিনি (শেখ মুজিবর রহমান) জেনারেল টিকা খানের সঙ্গে পাকিস্তান চলে গেলেন?

(৮) পাকিস্তানী নরপিতাশ হানাদকার আক্রমণের মুখে, অরণ্যকামী নেতারা অপায়ের ফলে, দিশেহারা নাথিকের মধ্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বাঙালি জাতি। ঠিক সেই সময়, পাকিস্তানী বেনাবাহিনীর কঠোর শৃংখলার মধ্যে থাকা মাদকতি সৈনিক, পাকিস্তানী সেনা আইনে জায়ারিং জোয়ার্ডে যুদ্ধানন্দের সম্পূর্ণ কৃতি নিয়ে, নেতৃবৃন্দ দিশেহারা বাহাশিক নেতৃত্ব ও পথের দিশা নিতে এগিয়ে গেলেন এক তরুণ বাঙালি সৈনিক।



মুক্তি পাশল স্বাধীনতাকামী মানুষকে তিনি শোষণলেন স্বাধীনতার অমরতায়। চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি ঘোষণা করলেন, "আমি মেজর জিয়া কলি, আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম।"

২৭শে মার্চ প্রত্যুষে ইথারে ভেসে এল এই অমর স্বাধীনতার বাণী। সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় মুক্তি পাশল দানাল হেলেগা ঘর থেকে রেগিত পড়লো মুক্তিযুদ্ধে অগ্নিগো পড়ায় জন। কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান প্রথমে ঘোষণা করলে, "আই এ্যাম মেজর জিয়া, প্রেসিডেন্ট অফ পিপুলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, আই ডিক্লারাই ইনডিপেন্ডেন্ট অফ বাংলাদেশ।" পরে কৌশলগত কারণে তিনি বললেন, "আই এ্যাম মেজর জিয়া, আই ডিক্লারাই ইনডিপেন্ডেন্ট অফ বাংলাদেশ অন দি ইস মফ অওয়ার প্রেট লিটার শেব মুজিবর রহমান।"

মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণাই কি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে আপোষের ভিত্তিতে শেখ মুজিবর রহমানের গব্বা গ্রহণ পদে অন্তরায় হলো?

(৯) এর পর পরই ১৭ই এপ্রিল ভাঙ্গুদিন আহাঙ্গদের নেতৃত্বে ঘটে গেল আর এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ তদারকানে আন্তর্জাতিক বিবেচক বহু দেশের সাংবাদিকদের সামনে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদলখতলার আশ্রয়স্থানে ১৭ই এপ্রিল ভাঙ্গুদিন আহাঙ্গদের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকার শপথ গ্রহণ করলো। ভাঙ্গুদিন আহাঙ্গদ হলেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভাঙ্গুদিন আহাঙ্গদ তাঁর খস্টী সভা গঠন করলেন। শেখ মুজিবর রহমানের অনুপস্থিতিতেই শেখ মুজিবর রহমানকে করা হলো রাষ্ট্রপতি। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে করা হলো অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। যদি শেখ মুজিবর রহমান আপোষের ভিত্তিতে পাকিস্তানের কলমতা গ্রহণ প্রকিষ্টায় বেয়েও থাকেন, তাহলে ভাঙ্গুদিন আহাঙ্গদের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ, শেখ মুজিব ইয়াহিয়া আপোষ করলো কি তকুল করে নেতনি?

(১০) আর এই জন্যই কি সকল নেতৃত্ব দিয়ে, সরকার পরিচালনা করে, দেশ স্বাধীন করে, স্বাধীনবেশে শেখ মুজিবর রহমানকে কিত্তিরে আনয় পথ, প্রধানমন্ত্রী ভাঙ্গুদিন আহাঙ্গদকেই শেখ মুজিবর রহমান তাঁর খস্টী সভা থেকে নিপুহীত করে বের করে দিগেছিলেন?

(১১) হয়তো এব জন্যই স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর সর্গজোয় (নিমিত্যর) হত্যা নড়েও শেখ মুজিবর রহমান জিয়াউর রহমানকে

সেনাবাহিনী প্রধান না করে জনরীতি অনুযায়ী সফিউল্লাহকে সেনাবাহিনী প্রধান করেছিলেন?

(১২) তথু তাই নয়, যে মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন করলো। যুদ্ধে বিজয়ী হলো। দেশে ফিরে এসে কোন আত্মকাতনের কারণে শেখ মুজিবুর রহমান বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধাদের হুগে ফেলে দিলেন? এবং যে প্রশাসন মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানীসহ তাৎসলীক করেছে। বাঙালিদের হত্যা করেছে, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, সেই পরাজিত প্রশাসনকে কি-কারণে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করলেন?

মুক্তিযোদ্ধাদের অবজ্ঞা করে, অবহেলা করে, অত্যাচার করে, তথু যাত্রা দলিদ্ধব অভ্যন্তর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত আশিলা না করে অমুক্তিযোদ্ধাদের এমন কি আত্মকাতনেরও মুক্তিযোদ্ধা নমন বিতরন করে শেখ মুজিবুর রহমান এক কলঙ্কের সৃষ্টি করলেন। কিন্তু কেন?

## ১৩. বিতর্ক শেখ মুজিব বিতর্ক

৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানী সৈন্যরা বৈধিক ইত্তেফাক পত্রিকা জ্বলিয়ে দিলে, তৎক্ষণাতিতে পাকিস্তানের প্রেনিভেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ইত্তেফাকের মালিক ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেনদের ক্ষতিপূরণ বাকদ নগদ দশ লক্ষ টাকা দেয়। এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় মঈনুল হোসেনরা নতুন জার্মানী ঘুরে অত্যাধুনিক অফিসেট মেশিন কিনে আনলেন, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেন না। পাকিস্তান হানাদার কবচিত্র শোটা বনর, অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের শোটা নয় হাস মঈনুল হোসেনরা পাকিস্তান প্রেন থেকে বিনা পায়দার (পাকিস্তান সরকারের খরচে) ইত্তেফাক পত্রিকা বের করলেন। বলা সাহসী, ঐ সময় ইত্তেফাকে পাকিস্তানী জেনারেল ইয়াহিয়া খান, টিকা খান, হুমায়ুন খান, মির্জাফি ও পাকিস্তানী অন্যান্য প্রেনাভেন্ট ও সৈন্যদের এবং যাত্রক গোষ্ঠার অনন্বসহ অন্যান্য অসাবদর রাজকরদের প্রশংসা করে খবর ছাপা হতো। আর মুক্তিযোদ্ধাদের বলা হতো দেশত্রেয়ী ভরকীয় চর। অর্থাৎ ইত্তেফাক তখন মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অধস্থান নিয়ে পাকিস্তানী তাৎসলীক ও দালালীতে লিপ্ত ছিল। এবং দালালী ও তাৎসলীক পুরুষার ছিলবে পাকিস্তান সরকারের সমস্ত বিজ্ঞাপন ইত্তেফাক পেতো। অপ্রত্যাশিতভাবে ইয়াং ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হতে দায়িত্ব ইত্তেফাকের মালিক আনোয়ার হোসেন মন্তব্য পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে দালালী ও তাৎসলীক পুরুষার স্বরূপ পাওয়া বিজ্ঞাপনের বিপক্ষে টাকা নিয়ে পারেনি। লক্ষ প্রানের বিনিময়ে দেশ স্বাধীনতার পরে পূর্বের পরিচয়ের সূত্র ধরে স্বাধীন দেশেও কর্ণদার শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে পাকিস্তানী দালালী ও তাৎসলীক

সেই বিশেষ টাকা নেয়। কোন বিবেকবান মানুষ কি এই বিশেষ টাকা দিতে পারে?

এই জানাই কি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন আর মা বোনের স্বাধীনতার বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করা হয়েছে? দিক শেষ মুজিব, দিক।

এদেশের মুক্তি পাশাপাশি মনোহা ছেলেরা গায়েব মায়া ছিন্তা করে দেশদ্রোহকার মুক্তির জন্য প্রণয়ন করাই করেছে। হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে মুন্সাবুরি যুদ্ধ করেছে। ঠিক তখন পাকিস্তান সরকার মুক্তিযুদ্ধ মঙ্গ্যাক করার জন্য কুমিল্লায় ই পি সি এম (ইউ পাকিস্তান ক্যান্ডিডেটস) এর পরীক্ষা নিল। নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে পাকিস্তানী হানাদকারীদের কবল থেকে দেশ ও দেশের মানুষকে বাঁচানোর সেই অগ্নি পরীক্ষার দিনে, কামোদ নামের ছেলেরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তত্ত্ব করলো। আর কার্যার্থেই চরম সুবিধাবাদী কতিপয় ব্যক্তি পাকিস্তান সরকারের নেতারা সেই ই পি সি এম পরীক্ষায় অংশ নিল। এমং দেশপ্রেম বিমুক্তিত এই ব্যক্তিত্ব ই পি সি এম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইউ পাকিস্তান ক্যান্ডিডেটস নামের চাকরীতে যোগ দিল। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে দেশ স্বাধীনতা পূর্ব মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পর্কহীন শেখ মুজিবুর রহমান এই বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদের স্বাধীন বাংলাদেশ ক্যান্ডিডেটস চাকরীতে পূর্ণ বহাল করলেন। কিন্তু কেন? ন্যায়ের বিবেক থাকলে কি এটা সম্ভব? দিক শেষ মুজিব, দিক।

মানুষের জন্য নিরবদিত আশ দেশপ্রেমিক সর্বমাতা মঙ্গল দেশ। কনক্রেড সিঁদুর নিকলারকে বিনা বিচারে বন্দিদশায় ফেলে হ্যাচকাপ পরা অবস্থায় লম্বা থেকে গুলি করে হত্যা করে, মহান জাতিগো সংসদে দাঁড়িয়ে মাতা কোথায় দিয়ার নিকলার বলে আত্মসম্মান করে শেখ মুজিব হয়েই বিবেকহীন এক ব্যক্তিত্ব।

## ভাইরীর পাতা

ভূমি যা চেয়েছিলে তাই হয়েছে। ভূমি চেয়েছিলে সেন সেন প্রকারে একলাফ যত্ন কর্মতায় যাওয়া। তাই হয়েছে। দেশের জন্য, জাতির জন্য কিছু করতে হলে যা ভাণ ঝাঁকুর করা প্রয়োজন তা ভূমি করতে কখনই প্রস্তুত ছিলে না। প্রথম থেকেই যত্ন কর্মতায় যাওয়ার জন্য ভূমি সর্বদা ব্যাধ ছিলে। এমং তাই হয়েছে।

১৫/৬/৮৬

না, ভূমি দেশের জন্য কিছুই করতে পারেন না। দেশের দেশের জন্য কিছু করতে মন তোমার নেই। মানুষের জন্য কিছু করার মন নেই করছি, তোমার ইচ্ছেও নেই। আর ইচ্ছে নেই বলেই তোমার উপায়ও নেই। যদি তোমার ইচ্ছে থাকতো, তাহলে কিছু একটা উপায় হতো। কিন্তু জাতির জন্য কিছু করতে ইচ্ছে তোমার নেই। কাজেই উপায়ও নেই।

১৫/১২/৮৬ইং

আমরা তোমাকে ক্ষমা করতে চাই। কিন্তু কোন বিচারেই ক্ষমা করতে পারি না। তুমি ক্ষমার অযোগ্য। তুমি দাবীনা কর আদালত রকুল আলমীন ঘেন তোমাকে ক্ষমা করার সামর্থ্য আমাদের দেন। ২৭/০২/৯৭ইং

১৯৮১ সালের ১২ই জুন যখন তুমি আমার পিতার ধানমন্ডি বাড়ির মাধ্যমে অফিসিট এবং অলসানসহ মালতীচ সিনিয়, ৭২ পৃষ্ঠার একটি ইনভেস্টিগেট সই করে বুকে নিশ্চিন্ত, তখনই মনে হচ্ছিল তুমি মানুষ নও। অন্য কিছু। তুমি যখন দুটিয়ে দুটিয়ে সব বুকে নিশ্চিন্ত, সবাই হতভাক হয়ে তোমার দিকে তাকিয়েছিল। কিরকম দীর স্বীর এবং অবলীলা ক্রমে তুমি বলছিলেন, আমার কানেও মূল তিনটা কই? আমার নাকের মূল দুইটা কই? আমার হাতের চরিত্রটা তুমি কই? ইত্যাদি ইত্যাদি তুমি বলছিলেন আর মরকটী কর্তৃপক্ষ একটি একটি করে সব বুকে নিশ্চিন্ত। সেই দিনটায় কথা আমার আগ্রহে মনে আছে। সেদিন তোমাকে দেখে মনেই হ্যানি যে, এই বাড়িতেই তোমার পিতৃহত্যার সব শেষ হয়ে গেছে। তুমি এখন ভাবব ক্রমে ক্রমে প্রায় সমস্ত লক্ষ টাকার গয়নাসহ অন্যান্য মালমোদ বুকে নিয়ে যে, তাতে মনে হলো, তুমি মানুষ নও। অন্য কোন কিছু।

কারো লেখা পড় না; কোন বই পড় না। ভাল কথা শেখ না। তোমার নাম শেষ হানি। তুমি পিতৃহত্যার স্বামী কর্তৃক পরিভাক এক রমনি। তোমার মেয়ের ভাষায় তুমি বহুতপী। তোমার প্রিয় পুত্রত্ব রমাকান্ত, যাকে তুমি ভালবাসতে, সেও তোমাকে ভালবাসতে। কিন্তু সেও তোমার কাছে বইল না। তুমি এখন এক শ্রাণী।

## শিক্ষা

এসবই তুমি আমাদের নিয়েছ।  
তোমার কাছ থেকেই এসব আমাদের পাওয়া।  
তুমি যা নিয়েছ, তার সবটুকুই আমরা পেয়েছি।  
নতুন বছর তোমার কাছ থেকে আমাদের আর পাওয়ার কিছুই নেই।  
তাই, তুমি যা নিয়েছ, যা আমরা সকলের কাছে বাস করে নিতে চাই।  
তাতে তুমি পূর্য পোলে, আমাদের কিছু করার নেই।  
এশিক্ষা তুমিই আমাদের নিয়েছ। তোমার কাছ থেকেই আমরা এ শিক্ষা পেয়েছি।

সেদিন হয়তো তুমি ভাব নাই, তোমার শিক্ষাই তোমার বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে দিব।

এই হয়। আসলে এই হয়। তোমার মতো যারা এশিক্ষা দেয় তারা কেউই ভাবেনা, এই শিক্ষা যে এরদিন তাদের বিরুদ্ধেই কাজে লেগে যাবে।

তাই হয়তো তুমিও ভাবনি।



তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, একেবারে খালি হাতে বিনামূলী না নিয়ে অল্পতর শিকারী দিচ্ছে দিচ্ছেছিলে।

নইলে তো মাঠে মারা যেতে হতো। (অবশ্য তুমি তাই চেয়েছিলে।)

তোমার দেয়া শিকারী বেঁচে বিনে, অল্পতর মীচাক চেঁচা করি।

শেষবারের মতো বলি, তুমি দুঃখ করে না। বিশ্বাস কর, তোমার জিনিস  
এ ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিল না।

জানি বিশ্বাস করবে না। কারণ, তোমার মাঝে বিশ্বাস বলে কিছু নেই।

## মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে মানুষের মনন জগতের এক ধরনের অনুভূতি। যে অনুভূতির কারণে একটা জাতির মন-মানসিকতার আবহ পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তনের কারণে গোটা জাতি মন থেকে পুরনো ধ্যানধারণা ব্যক্তি স্বার্থপরতা, প্রভৃতি কেবল নতুন মন ও ভালবাসা নিয়ে থাকে উঠে। এই মনও ভালবাসাকে বলা হয় চেতনা।

আর এই থাকে উঠা নতুন মন ও ভালবাসা বা চেতনা হচ্ছে, নিজের চাইতে অন্যকে (অপরকে) বেশি বড় করে দেখা। বেশি ভালবাসা। নিজের স্বার্থে চাইতে দেশ এবং জাতির স্বার্থকে বেশি বড় করে দেখা। নিজের সুখ-দুঃখ ভুলে গিয়ে অন্যের সুখ-দুঃখকে গ্রহণ করা দেওয়া।

একটা জাতির জীবনে এই চেতনা বহু বহু আসে না। একটা বিশেষ মুহূর্তে একটি বিশেষ প্রয়োজনে হাজার হাজার বছর পর একটা জাতির জীবনে এই স্বপ্ন একটি চেতনার জন্ম বা সৃষ্টি হয়। আর একটা জাতির জীবনে যখনই এই চেতনার সৃষ্টি হয়, তখনই সেই জাতি ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে একে অপরকে নিজের মতো ভালবাসে। তখনই তখনো নিজের চাইতে অন্যকে বেশি ভালবাসে।

নিজের চাইতে অন্যকে বেশি ভালবাসা বা অন্যকে নিজের মতো করে ভালবাসার চেতনাকেই বলা হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

জাতির জীবনে যখনই এই চেতনার জন্ম হয় তখনই সেই জাতি মাথা খুলে দাঁড়ায়। পৃথিবীর কোন শক্তিই আর সেই জাতিকে দাবিয়ে রাখতে পারেনা।

অন্যকে নিজের চাইতে বেশি ভালবাসার চেতনা হাজার হাজার বছর পর বাংলাদেশি জাতির জীবনে এসেছিল '৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়।

৭১ সালে বাংলাদেশি জাতি নিজের সুখ-দুঃখের চাইতে অন্যের সুখ-দুঃখকে বড় করে দেখেছে, বেশি করে দেখেছে।

নিজের চাইতে অন্যকে বেশি ভালবাসার বা অন্যকে নিজের মতো ভালবাসার চেতনা বার বার আসে না। হাজার বছরে একটি জাতির জীবনে একবার এই চেতনা আসে।

জাতির জীবনে যখন এই চেতনা আসে, তখন গোটা জাতি সকল প্রকার অন্যায়, অমিচাৰ, স্বার্থপরতা, পরাধীনতা ইত্যাদি সকল কিছুর বিরুদ্ধে কণ্ঠ নীকায় এবং মুক্তির লড়াই শুরু করে।

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে একমাত্র '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়েই বাঙালি এই চেতনায় উদ্ভূত হয়েছিল এবং গোটা বাঙালি জাতি তখন সকল প্রকার স্বার্থ স্বার্থের উচ্ছেদ উচ্ছেদ দেশ ও জাতির স্বার্থকে রক্ত করে দেখেছে। অন্যকে নিজের চাইতে বেশি ভালবেসেছে। স্বয়ং বিদেশী পণ্য বর্জন করে দেশীয় পণ্য ব্যবহার করেছে।

এক কথায় "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে নিজের চাইতে অন্যকে বেশি ভালবাসা। নিজের স্বার্থ স্বার্থের চাইতে দেশ ও জাতির স্বার্থ বেশি দেখা।"

স্বাধীনতার পর দেশপ্রেম বিবর্তিত স্বাতন্ত্র্যবাদিক নেতৃত্ব বাত্রির কনকায় একে মুক্তিযুদ্ধের এই চেতনাকে ধ্বংস করে নিচ্ছে। আর এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংসকারী দেশপ্রেম বিবর্তিত স্বাতন্ত্র্যবাদিক নেতৃত্বের নেতৃত্ব দিতে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। সলা যার শেষ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস হয়েছে।

## আমার শেখ মুজিবের ও শেখ হাসিনার ফাঁসি চাই

ইতিহাস সাক্ষ্যদায়ী ইংল্যান্ডের জমিদারের রাজতন্ত্রের কনকতা ফেপ করে নিজেই কনকতার অপমানরূপ করে একজন ঐক্যজাতী হয়েছিলেন। কিন্তু ইংল্যান্ডের পঞ্চাঙ্গনিক কনকতা তাকে ক্ষমা করেনি। দেশের প্রচলিত আইনে তাকে বিচার হয়েছিল তার মৃত্যুর পর। এই বিচার ছিল কাউন্সিল পর্যন্ত পড়িয়েছিল এবং তার ফাঁসি হয়েছিল। কবর হতে তার হাড়সোত তুলে ফাঁসি করে কুলাদো হয়েছিল। এটাই হলো আইনের শাসন।

'৭৫-এর ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিব হত্যার প্রতিবাদে মুক্ত অঙ্গ দেশের যে কতি করেছি, সেই অপরাধে আমার ফাঁসি চাই।

স্বাধীনতার যোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা বট্টপতি জিয়াউর রহমান হত্যার কনকতার কথা জেনেও তা প্রকাশ না করার এবং হত্যা কারীদের সম্পূর্ণ থাকার অপরাধে আমার ফাঁসি চাই।

১৬-এর অধ্যক্ষ ফেল্ডমারী লস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজি জবানগ ও জামকর এবং  
১৮-এর ফেল্ডমারী নেলিক ও নেলোয়ার হত্যায় শেখ হাসিনার পরিকল্পনা ও  
যত্নবশত অংশ নিনে যে অপরাধ করেছে তার জন্য আমার মাপি হই।

१९७२-७३ मासको विवरणको माई चौथो महिनाको पछि कक्षाको काम तथा अभिप्रेत  
पत्रिकाको ३ महिनाको दिवस-मुलकमान-आपसी अभिप्रेत तथा अभिप्रेत कक्षाको पत्र  
आगत गर्ने छौं ।

১৯৯২ সালের পর থেকে ১৯৯৬ সালের মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের নামে ঢাকা শহরে শেখ হাসিনার নিলনজ্জা ও নির্দেশে যে ১০৩ (একশত তিন) জন লোক নিহত হয়, এই আন্দোলনকে ১০৩ জন মানুষ হত্যার নামে আবার ফাঁসি দেই।

১৯৭৭

(১) সম্পূর্ণ দুয়োদিক বাংলা সম্ভ্রান্ত-সংগঠিত সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা না করায়, আমাদের স্বাধীনতার জন্য তিরিশ লক্ষ মানুষকে নিহত (শহীদ) হতে হত এবং দুই লক্ষ মা, বোনকে ধর্ষিত হতে হত। এই তিরিশ লক্ষ মানুষ হত্যা এবং দুই লক্ষ নারী ধর্ষিত হওয়ার জন্য দায়ী শেখ মুজিবুর রহমানের মতামতের খসড়া চাই।

(২) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা গাঢ় করে অতিমোহে শেখ মুজিবুর রহমানের অকল্যাণের ঘটনা চাই, শান্তি চাই।

(୬) ଯେ ହାଜିରାମାଫାରା ଗୁରୁ କରୁ (ନେମ ବାଣୀନ କରନ୍ତେ) ଏବଂ ନେମ ବାଣୀନ କରୁ ନେମ ହାଜିରା ବହମାନଙ୍କ ବାଣୀନ ନେମ କିରିରେ ଗଢନ୍ତେ, ବାଣୀନକରଣ ପଠ କାତର ଦେଇ ମେଝି ଗୁରୁକ୍ତ ହାଜିରାମାଫାରା ଆମିକା ଆ ଶ୍ରୀମ, ଗାଲୀକାର ଆମନାବଦନେ ବୁଝା ବାଞ୍ଛାନେ ହାଜିରାମାଫାରା ଗଲନ (ବାଟିକିକଟ) ଦେଶ୍ରାବ ଅଞ୍ଜିମାମେ ଦେବ ବାଞ୍ଛାନେ ବହମାନେ ଗୁରୁକାର ଲିକାର ଗାଝି ଖାସି ଗାଝି ।

(৪) কন্যা বা তাইকেই স্বাধীনতা বিদ্রোহী প্রাচ্যবাসীর অঙ্গ নকরাসক লস্কর-  
ভাসে। কন্যা ঘোষণা কতাব অপব্যাপন শেষ মুম্বির প্রহসনের মরদেবতার শাউ  
খাই।

(৬) ন্যায় বিপ্রদী নেতা কমরেড সিরাজ সিকান্দারকে যদি অবশ্যই বিনা শ্রীচন্দ্র ওলিকরের হত্যা করার অপরাধে শেষ মুক্তিবারত বহমানের মতনোক্ত মর্নি  
লাই।

(১৬) নিম্নোক্ত নিকটবর্তী স্থান করে পবিত্র পার্শ্বাশ্রমকে গড়ে তুলে কোমল  
নিম্নোক্ত নিকটবর্তী স্থান করে পবিত্র পার্শ্বাশ্রমকে গড়ে তুলে কোমল  
শেখ মুজিবুর রহমানের মর্যাদার প্রতিষ্ঠা চাই।

(৭) জনগণের জেট দেওয়ার অধিকার, মিছিল করার অধিকার, মল করার অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণসহ সংবিধানের মৌলিক অধিকার হরণ করে আতির উপর একদলীয় (ককশাল) শাসন শোষণ চাপিয়ে দেওয়ার অপরাধে শেখ মুজিবুর রহমানের মরনোত্তর বিচার চাই, শাস্তি চাই।

(ক) ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান সিহত হওয়ার পর অনেক চেইা এবং কট্টর পর শিক্ষিত ছাত্র যুবকদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কিয়িবে আন্দার ধারায় সূচনা হয়েছিল। ঈহু যুবকরা ভারতে গুপ্ত করেছিল “রাজনীতি হচ্ছে মানুষকে দেওয়ার জন্য, পাওয়ার জন্য নয়।”

কিহু শেখ হাসিনা দেশে এসে সন্ত্রাসী, চোরাকারবারী, কালোবাজারী, যুবকেরদের রাজনীতিতে টেনে এনে কাপোড়াকাকেই রাজনীতির চালিকা শক্তিভে পরিণত করেছে এবং রাজনীতি থেকে সকল প্রকার নীতি আদর্শ কেটিয়ে বিদায় করে প্রতিষ্ঠিত করেছে নীতিহীন এক রাজনীতি। এই অপরাধে শেখ হাসিনার বিচার চাই, শাস্তি চাই।

(খ) ভারতে বসে স্বাধীনতার ঘোষক মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যার ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করে এবং ১৯৮১ সালের ৩০শে মে তা বাস্তবায়িত করার অপরাধে শেখ হাসিনার ফাঁসি চাই।

(গ) ১৯৮২ সালে, জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত বি এন পি সরকার উৎখাত করে সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করার ষড়যন্ত্রে শিল্প শাক্যর অপরাধে শেখ হাসিনার বিচার চাই, শাস্তি চাই।

(ঘ) সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল এরশাদকে হত্যার মূঠায় রাখার জন্য, ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করে, ছাত্র আন্দোলনের নামে, ৮৩-র মধ্যে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জাকার ও জহানাব এবং ৮৪-র ফেব্রুয়ারীতে শেলিম ও মোলোয়ার হত্যার অপরাধে শেখ হাসিনার ফাঁসি চাই।

(ঙ) ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন পত্ত করার জন্য, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়িক রাচট লাগিতে দেওয়ার অপরাধে শেখ হাসিনার বিচার চাই, শাস্তি চাই।

(চ) ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের মার্চ পর্যন্ত, আন্দোলনের ইস্যু তৈরী করার জন্য ঢাকা শহরে ১০৩ জন নিরীহ অজ্ঞাতনামা সাধারণ মানুষকে খুন করার অপরাধে শেখ হাসিনার ফাঁসি চাই।





এই বৌ, স্বাক্ষর করে (বাম দিকের দল), শেখ হাসিনা, মান্না চন্দন এবং অফিসের কাগজের সংগ্রহিকরণ।



এই বৌ, স্বাক্ষর করে (বাম দিকের দল), শেখ হাসিনা এবং মান্না চন্দন।





আমার ফাঁসি চাই

BANNED

মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান ট্রেডে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সরকারীভাবে সশ্রীক অস্বাক্ষিত ঘোষিত